প্রথম প্রকাশ : ১৩৬৫

প্রকাশিকা :
শ্রীমতি আলোরাণী পাত্র
প্রগতি প্রকাশনী
১৮, পঞ্চানন ঘোষ লেন,
কলিকাতা-৯

মুদ্রণে :
সোমা মুদ্রণ
২এ. কেদার দত্ত লেন
কলিকাতা-৬

প্রথম পরিচ্ছেদ

ট্রুম্যান বিল্ডিং প্যারাডাইস অ্যাভেনিউতে অবস্থিত। এরই উপর তলায় পার্নেল ডিটেকটিভ এজেন্সি।

পার্নেল ডিটেকটিভ এজেন্সির প্রতিষ্ঠাতা কর্নেল ভিক্টর পার্নেল। সে এখন এর পরিচালনা করে চলেছে।

ট্রুম্যান বিল্ডিং অ্যাটলান্টিক মহাসাগরের কাছেই অবস্থিত এবং এখানে যতগুলো ডিটেকটিভ এজেন্সি রয়েছে, তার মধ্যে পার্নেল ডিটেকটিভ এজেন্সির নাম যশ সব চেয়ে বেশী।

কর্নেল সেনাবাহিনীতে ছিল। সেখান থেকে অবসর নিয়ে সে এই ডিটেকটিভ এজেন্সি খুলেছে এবং এখানে এজেন্সি খুলে সে খুব বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছে। এ জায়গায় আগে বিলোনিয়ারদের রঙ্গভূমি ছিল।

এই এজেন্সি শুধু মাত্র ধনীদের জন্য। এখানে সাধারণ মানুষের স্থান হয় না। আর প্যারাডাইস সিটিতে ধনীদের সংখ্যা প্রচুর। বলা বাহুল্য আমেরিকার মধ্যে এখানেই সবচেয়ে ধনীরা বেশী বাস করে।

পার্নেল টেক্সাসের অধিবাসী। সে এখানে এমন একটি ডিটেকটিভ এজেন্সি খুলেছে, যা সাধারণত ধনী লোকেরা পছন্দ করে। আর এই এজেন্সি প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে তার প্রচুর টাকা পয়সা খরচ হয়েছে। অবশ্য এর জন্য তার কোন অসুবিধে হয়নি। কারণ তার বাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে সে বহু অর্থ পেয়েছে। তার বাবার বিরাট তেলের কারবার ছিল।

এবার পার্নেল ডিটেকটিভ এজেন্সির অফিসের দিকে তাকানো যাক। এই বিলাসবহুল অফিসে সব মিলিয়ে প্রায় বত্রিশ জন লোক কাজ করে, তাদের মধ্যে একজন অ্যাকাউন্টেন্ট। তার নাম চার্লস এডওয়ার্ড। চার্লস এডওয়ার্ডের একজন পার্সোনাল অ্যাসিস্টেন্ট আছে। সে একটি মেয়ে। সে গ্লেণ্ডা কেরী নামে পরিচিত।

তাছাড়া, এই এজেন্সিতে কুড়ি জন অপারেটার রয়েছে, তাদের সঙ্গে অপ্সরা সমানে পাল্লা দিতে না পারলেও অন্তত কিছুটা টাইপিস্টের দল। তারা সংখ্যায় দশ জন।

এবার প্রথমে এই কুড়ি জন অপারেটারের পরিচয় নেওয়া প্রয়োজন। এরা আগে মিলিটারি পুলিশে কাজ করতো। এবং এই এজেন্সি নিয়ম অনুযায়ী দুজন করে এক একটি দলে কাজ করে। অর্থাৎ এই রকম দশ জোড়া লোক এখানে কাজে নিযুক্ত রয়েছে।

এই দশ জোড়া একে অপরের থেকে ভিন্ন। এদের সবার আলাদা আলাদা অফিস।

এখানে কৌতূহলের ব্যাপারটা একেবারে গৌণ। নিতান্ত প্রয়োজন না পড়লে কেউ কারুর ব্যাপারে মাথা ঘামায় না। ঠিক সেইভাবে অফিসেও চলে। অর্থাৎ একে অপরের কাছে নিজের গোপনীয়তা বজায় রেখে চলতে চেষ্টা করে।

এর একটি প্রধান সুবিধে রয়েছে তা হলো, গোপনীয়তা যথাযথভাবে রক্ষা হচ্ছে, যা মক্কেলরা চায়। আর খবরের কাগজের লোকদের দৃষ্টি এড়িয়ে চলতেও সুবিধে হচ্ছে।

তবে খবর যে একেবারে ফাঁস হয় না, তা বললে মিথ্যে কথা বলা হবে। খবর মাত্র একবারই বেরিয়েছিল। আর তার বিষময় ফল স্বরূপ দু'জন অপারেটারের চাকরি চলে গেছে।

আমি আর চিক বার্নি এক সঙ্গে কাজ করি। আমরা দু'জনেই ভিয়েতনাম যুদ্ধে এক সঙ্গে লড়েছি। তখন আমরা দু'জনেই লেফটেনান্ট পদে ছিলাম। এবং সেখানেও আমাদের কর্নেল ছিল এই পার্নেল এজেন্সির মালিক পার্নেল।

এবার আমাদের বয়সটা আপনাদের জানাই। চল্লিশ না হলেও তার ধারে কাছে একটা বয়স হবে। হ্যাঁ মনে পড়েছে, আমাদের দুজনেরই বয়স আটত্রিশ এবং আমরা অবিবাহিত।

এই পার্নেল ডিটেকটিভ এজেন্সিতে গত তিন বছর ধরে এক সঙ্গে কাজ করে চলেছি। আর একথা বললে হয়তো বাড়িয়ে বলা হবে না—যে ক'জোড়া অপারেটার এখানে রয়েছে, তাদের মধ্যে আমাদের সুনাম সবচেয়ে বেশী।

পার্নেল এজেন্সি ছোট খাট ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামায় না। তারা শুধু খুনের ব্যাপারটা এড়িয়ে চলে। তবে তারা কোন ব্যাপারে মাথা ঘামায়? স্বভাবতঃ এ প্রশ্ন মনে আসে বই তো। এবং তারা যা করে তা বলতে গেলে একটা লম্বা ফিরিস্তি হয়ে যাবে। আর তা হল—বিবাহ বিচ্ছেদ, বাপ-মার সমস্যা, ব্ল্যাকমেল, অবৈধ জুলুম, হোটেল প্রতারণা, স্ত্রী বা স্বামীর চলাফেরার উপর নজর রাখা ইত্যাদি ব্যাপার।

এই এজেন্সির সঙ্গে প্যারাডাইস সিটি পুলিশের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ আছে। এখানে তার একটা ব্যাপার তুলে ধরি দৃষ্টান্ত হিসেবে। যেমন এজেন্সি দেখলো কোন পুলিশ কেসের ব্যাপার। সে তখন পুলিশের বড়কর্তা লেপেলকে জানিয়ে তখনই ব্যাপারটার ইতি টেনে দেয়। এইভাবে এজেন্সি অন্তের পথ এড়িয়ে চলে। তবে এজেন্সিতে মক্কেলদের রক্ষা করার অধিকার রয়েছে। তবুও একবারে পুলিশী কেস হলে এড়িয়ে চলে।

এখন সকাল। চারদিক যেন রোদে ভেসে যাচ্ছে।

এখন আমি আর চিক কি করবো ভাবছি। এ সময় আমরা অফিস ঘরে বসে আছি। হাতে কোন কাজ নেই।

ইতিমধ্যে আমরা একটা জরুরী কেস শেষ করেছি। সে লোকটার বহু টাকা-কড়ি আছে। তবু নিজের চুরি করার অভ্যাস ছাড়তে পারছিল না। এটা তার

একটা বাস্তিক। তাকে আমরা হাতেনাতেও ধরেছি। আর এখন আমরা পরের কাজের জন্য অপেক্ষা করছি।

আমি চিকের দিকে তাকাই। সে একটা চেয়ারে বসে আছে। থাকলেও তার পা সামনের টেবিলের উপর। আর মন দিয়ে মেয়েদের একটা ম্যাগাজিন পড়ছে।

এবার চিকের শরীরের বিবরণ দেওয়া যাক। ওর বেশ লম্বা ধরণের চেহারা। পেটানো স্বাস্থ্য। এক মাথা চুল। কালির মত রং। তবে নাকটা একটু চেপ্টা, কতকটা মুষ্টিযোদ্ধার নাকের মতন।

থেকে থেকে ঠিক শিস দিচ্ছে। অর্থাৎ সে এখন একটা খুশীর মেজাজে রয়েছে। অর্থাৎ পড়তে পড়তে এমন একটা জায়গায় এসেছে, যাতে তার মনে যথেষ্ট আনন্দ হচ্ছে।

এবার চিকের দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে একটা হিসেবে মন দিলাম। ওর চেয়ার থেকে আমার চেয়ারের দূরত্ব খুব সামান্য। যাক হিসাব করে বুঝলাম, মাস শেষ হবার আগেই আমার পকেট একবারে খালি হয়ে যাবে।

টাকা পয়সা আমি আর কিছুতেই রাখতে পারছি না। ওর সঙ্গে যেন আমার একটা শত্রুতা গড়ে উঠেছে। প্রতিবার মাইনে পাবার আগের সপ্তাহে আমার টাকা ধার করতে হয়। তারপর ধার শোধ করে মাস চালাবার জন্য আবার টাকার টান পড়ে যায়।

তবে মাইনে যে আমি খুব একটা খারাপ পাই তা নয়। আর পাঁচটা এজেন্সির চাইতে পার্সেল এজেন্সির মাইনে অনেক বেশী। আসলে টাকাই আমার সঙ্গে শত্রুতা বজায় রেখে দূরে দূরে চলেছে। হিসেবের দিকে আর মন দিতে পারছি না। ওদিকে তাকালেই মনটা বিতৃষ্ণায় ভরে উঠছে। ফলে হিসেবের কাগজটা সরিয়ে ফেললাম।

এবার আমি কাগজটার দিক থেকে দৃষ্টি সরিয়ে চিকের দিকে তাকাই। চাউনির মধ্যে একটা করুণ ভাব ফুটে উঠেছে। অর্থাৎ আমি একজন প্রার্থী, যার এ মুহূর্তে কিছু না হলেই চলবে না।

আমি বলি—চিক, তোমার পকেটের অবস্থা কেমন।

—পকেটের অবস্থা? চিক ম্যাগাজিনটা রেখে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে।

—হ্যাঁ। সবুজ কাগজ কী বলছে? (আমেরিকার ডলারের রং সবুজ)।

—সবুজ কাগজ?

—হুঁ।

—বটে, তোমার অভ্যাস পাল্টাবার সময় হয়ে এসেছে।

—অর্থাৎ?

—তোমার ব্যাপারটা কী?

—ব্যাপার আবার কী হবে!

—টাকাগুলো পেয়ে করো কী ?

—খুব ভালো একটা প্রশ্ন করেছো। তবে ......

—তবে কী ?

—এর উত্তরটা আমার জানা নেই।

—জানা নেই ?

—না।

—আমার আছে।

—বলে ফেলো ! যাক, আমার প্রশ্নের উত্তর আমিই দিই। টাকা আসে আর চলে যায়। ওদের যেন পাখা রয়েছে শত চেষ্টা করেও ওদের ধরে রাখতে পারছি না।

—কেন পারো না তা আমি জানি।

—জানো ?

—হ্যাঁ।

—কী করে ?

—ভুলে যেও না আমিও একজন ডিটেকটিভ।

—তা ডিটেকটিভ সাহেব, আমায় একটা বুদ্ধি দাও তো !

—বুদ্ধি ?

—হ্যাঁ।

—কী ব্যাপারে ?

—ধরো, কীভাবে আমি সবুজ নোটগুলো ধরে রাখতে পারি।

—এ খুব সোজা কথা।

—তবু বলো শুনি।

—এর দুটো করলেই তুমি বেশ কিছু ডলার অনায়াসে জমাতে পারবে, তা আমি হলফ করে বলতে পারি।

—দুটো ?

—হ্যাঁ।

—সে দুটো কী ?

—প্রথমটা বেশী ভাড়ার ঐ অ্যাপার্টমেন্টটা ছাড়া তোমার একান্ত দরকার। তাহলে তোমার বেশ কিছু ডলার প্রতি মাসে বেঁচে যাবে।

—কিন্তু বন্ধু, অভ্যেসটা কী করে পাল্টাই ?

—মানুষ ইচ্ছে করলে সব পারে।

—তবু মানুষ কিছু কিছু ক্ষেত্রে অসহায়।

—একবার চেষ্টা করে দেখোই না।

—তোমার কথা আমার মনে থাকবে, আর দ্বিতীয়টা ?

—আর ঐ মেয়েটার পিছনে যা খরচ করো, তা ভালো ছেলের মত কিছু কমাও দেখি।

—আর কিছু নেই ? আমি মিটি মিটি হাসি।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, আর একটা কথা মনে পড়েছে।

—বলে ফেলো।

—তোমার ঐ বেশী পেট্রল খাওয়া গাড়িটা ছাড়ো দেখি।

—আশা করি, এবার তোমার ফিরিস্তি শেষ ?

—আপাতত।

—আরো পরে মনে করে বলবে নাকি ?

—সেটা পরের কথা।

—যাক্, তাহলে শোন। ঐ বার্থার পিছনে খরচ কী করে কমাই।

—কেন ? সম্ভব নয় ?

—করলে যে ওর উষ্ণ সান্নিধ্য থেকে বঞ্চিত হবো।

—কিন্তু সব খরচেরই তো একটা মাত্রা আছে, আর তোমার এই হাল ফ্যাসানের জামাকাপড় পরা কমাও দেখি। যেন তুমি একজন ফিল্মস্টার! সেই ভাবে সব জামাকাপড় পরো। এ সব একটু কমালেই তুমি আমাদের কাছ থেকে ধার করা বন্ধ করতে পারবে।

—খুব ভালো কথা বলেছো। তা মাইনে না পাওয়া পর্যন্ত একশো ডলার ধারের ব্যাপারে কী বলছো।

—একশো ডলার ?

—হ্যাঁ।

—তোমার কথা শুনে লোকে মনে করবে আমি একটা ব্যাংকের মালিক।

—অন্তত আমার কাছে তাই।

—তোষামোদ কিন্তু বেশ জানো।

—তা কত হতে পারে ?

—কত ? চিক একটু ভাবে। তারপর একটু বাদে বলে, বড় জোর পঞ্চাশ ডলার হতে পারে।

—তাই দাও।

—পঞ্চাশ ডলারে চলবে তো ? বলে চিক ডলারের বিল আমার দিকে এগিয়ে দেয়।

—হ্যাঁ, কোন রকমে........, বলে আমি চেয়ার ছেড়ে এক লাফ দিয়ে উঠে বিলটা ছিনিয়ে নি।—ধন্যবাদ চিক। মাইনের দিন তোমায় শোধ করে দেবো।

—আচ্ছা, আচ্ছা। তবে কার্ট, এবার থেকে খরচের ব্যাপারে তুমি একটু সাবধান হও।

—আবার বলছি, তোমার উপদেশ আমার মনে থাকবে।

—থাকলে খুশী হবো।

—যদি না আবার ভুলে যাই।

—কিন্তু কর্নেল যদি জানতে পারে মাসের তৃতীয় সপ্তাহের পর থেকে তুমি ধার করতে শুরু করে দাও, তবে সে মোটেই খুশী হবে না।

—হবে না?

—না।

—আমার কিন্তু অন্য কথা মনে হচ্ছে।

—অন্য আবার কী কথা?

—সে আমার এই অবস্থার কথা জানতে পারলে হয়তো আমার মাইনে বাড়িয়ে দেবে।

—বাড়িয়ে দেবে?

—হ্যাঁ।

—তাতেও কী তোমার অভ্যেস বদলাবে?

—তা এখন কী করে বলি বলো তো? আগে বাড়াক।

—বদলাবে না। মাসের তৃতীয় সপ্তাহে তুমি ঠিক হাত পাতবেই।

—আজ সকালে দেখছি, তুমি খুব ভালো ভালো কথা বলছো!

—ঠাট্টা করছো?

—ঠাট্টা?

—হ্যাঁ।

—উহুঁ।

কথা শেষ করে আমি জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়াই। অদূরে সমুদ্র। জানালা থেকে স্পষ্ট সমুদ্র দেখা যায়। সূর্যের রোদ সমুদ্রের জলে পড়ে রূপোর মত চিক্ চিক্ করছে।

সমুদ্রের আগে বিরাট চড়া। সেখানে মাইলের পর মাইল বালির চড়া। আর সেই চড়াকে আরো যৌবনবতী করে তুলেছে পাম গাছ।

সমুদ্রের পারে অগণিত মানুষের ভিড়। বিরাট বিরাট রঙীন ছাতার নিচে তাদের দেহের অনাবৃত অংশ কিছুটা দেখা যাচ্ছে।

এবার আমি সমুদ্রের দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে চিকের দিকে তাকাই। বলি, ঐ সুন্দর সুন্দর পুতুলগুলোর সঙ্গে সময় কাটাতে যে কী ইচ্ছে করছে, তা আর তোমায় কী বলবো।

তারপর আমিই আবার বলি—এ কথাটা ভাবা কী অন্যায়। আমরা সবে একটা কাজ শেষ করেছি। কর্নেলের তো আমাদের প্রতি একটা কর্তব্য থাকা উচিত।

নিদেন পক্ষে আমাদের অন্তত একদিন ছুটি দিতে পারে। আর দেয় না কেন বলতে পারো ?

—পারি।

—বলো।

—দিলে একটু আগে যা বললে তাই করবে বলে ! আর কেন কর্নেল দেয় না, তাকে তা জিজ্ঞেস করলেই পারো !

আমি এর কোন জবাব দিই না। একটা সিগারেট ধরিয়ে আস্তে আস্তে চিকের পিছনে এসে দাঁড়াই এবং ওর হাতে ধরা ম্যাগাজিনের দিকে তাকাই।

তারপর চিক ম্যাগাজিনের পাতা ওল্টাতে যে জায়গাটা আমাদের চোখের সামনে এসে পড়ে, তা দেখে আমরা দুজনেই শিস দিয়ে উঠি। আর মন নেচে উঠবার মতই এটা একটা ছবি বটে।

এরপর চিক আমার দিকে ঘাড় ফিরিয়ে বলে, এটা দেখলে বিশপও ঠিক থাকতে পারে না।

—তা নয় বুঝলাম, কিন্তু তোমার নিজের কথাটা তো বললে না।

—আমার ?

—হ্যাঁ তোমার।

—একটা নির্জন দ্বীপে ওর সঙ্গে এক সপ্তাহ কাটাতে পারলে কিন্তু মন্দ হতো না।

—এরকম একটা মেয়ে সঙ্গে থাকলে দ্বীপ নির্জন হবার কোন দরকার নেই।

—ভুল বললে।

—ভুল বললাম ?

—হ্যাঁ।

—কেন ?

—দ্বীপ নির্জন হলে মেয়েটার জন্য আমার কিছুই খরচ করতে হতো না।

—তুমি বড্ড বেরসিক !

—হ্যাঁ, মেয়েদের ব্যাপারে তোমার মত এত উদার নই।

—আমরা যে ব্যাচিলার !

তারপর আরো কিছু বলতে যাচ্ছিলাম, ঠিক তখনই ইন্টার-কাম-টেলিফোনটা বেজে উঠল।

চিক সুইচ টিপলো। সঙ্গে সঙ্গে অপর দিক থেকে মেওা কেরীর গলা ভেসে আসে, কর্নেল বার্টের সঙ্গে দেখা করতে চাইছে।

এই কথা জানিয়েই অপর প্রান্তের আর কোন কথা শোনা গেল না। কেরী কোন ব্যাপারেই বেশী কথা বলে না এবং সময়ও নষ্ট করতে রাজি নয়।

ফোন নামিয়ে চিক আমার দিকে তাকিয়ে বলে, কর্নেল তোমায় তলব করেছে।

—আবার কোন কাজ।

—তা ঠিকই।

—কিন্তু এবার কী ধরণের কাজ?

—তা কে জানে!

তারপর ঢিক ম্যাগাজিনের পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে বলে, একটা বুড়ো তার তার কুকুরটা হারিয়ে ফেলেছে।

আমি এখান থেকে বেরিয়ে পার্নেলের অফিসে গিয়ে হাজির হই এবং তার কামরায় মৃদু করাঘাত করে ভেতরে প্রবেশ করি।

পার্নেলের বিরাট চেহারা, গায়ের রং তামাটে, চোখ দুটো ছোট ছোট, কিন্তু তীক্ষ্ণ। আর তার মুখটা দেখতে ইঁদুর ধরা কলের মত। তবে তার আপাদমস্তক দেখে তাকে একজন কঠোর প্রশাসক বলে মনে হবে। তাই তার কাছে গেলে আমি খুব সাবধানে কথা বলি।

মক্কেলের চেয়ারে একজন লোক বসে রয়েছে। আমি সেদিকে তাকাই। লোকটি বেঁটে। মাথায় টাক। গায়ের রং গোলাপী আর সাদা রঙে মেশানো। ভ্রুদ্বয় বেশ ঘন। আর তার চোখ সান গ্লাস দিয়ে ঢাকা।

আমাকে দেখিয়ে পার্নেল বলে, এর নাম বার্ট এণ্ডারসন, আর উনি মিঃ মেল পামার।

তারপর বেঁটে পামার চেয়ার ছেড়ে উঠে এসে আমার সঙ্গে করমর্দন করে। তার হাত আমার কাঁধ পর্যন্ত পৌঁছয় না, তার সবুজ চশমার আড়ালে তার ধারালো চোখ দুটো সম্বন্ধে বেশ সচেতন হয়ে উঠি এবং বুঝতে আমার কোন অসুবিধে হয় না যে, চোখ দুটো সমানে আমায় জরিপ করে চলেছে।

পার্নেল পামারকে জানায়, বার্ট আমার অপারেটারের একজন। এবং তার বিচারবুদ্ধির উপর যথেষ্ট নির্ভর করতে পারেন।

তারপর পার্নেল আমার দিকে তাকিয়ে একটা চেয়ারে বসতে ইঙ্গিত করে, বসো।

আমি বসার পর পার্নেল জানায়, মিস্টার পামার মিস্টার রাস হ্যামেলের একজন এজেন্ট এবং ম্যানেজার। আচ্ছা, মিস্টার রাস হ্যামেলের নাম শুনেছো তো।

—উপন্যাস আমি পড়ি না।

—পড়ো না?

—না। তবে মিস্টার রাস হ্যামেলের নাম আমি শুনেছি। তারপর আমার মনে পড়ে, গত সপ্তাহে বার্থাকে নিয়ে একটি ছবি দেখতে গিয়েছিলাম। সে গল্পটা ছিল হ্যামেলের লেখা। যদিও ছবিটা আমার তেমন ভালো লাগেনি।

ওদের কাছে বার্থার কথা বলা চলে না। শুধু বলি, তার পেপার ব্যাক বই

নিশ্চয় লাখ লাখ কপি বিক্রি হয়। আর গত সপ্তাহে ওর একটা ছবি দেখে এলাম।

একথা শুনে পামার খুশী হয় এবং জানায় মিস্টার হ্যামেল হ্যারল্ড রবিন্স এবং শেওয়েবের পর্যায়ের লেখক।

—তাই কী? আমি কথার মাঝে অবাক হবার ভান ফুটিয়ে তুলি।

কিন্তু পার্নেল আমার দিকে দৃষ্টি ফেরাতে সঙ্গে সঙ্গে মুখের ভাব স্বাভাবিক করে হাসতে চেষ্টা করি। যাতে না আবার মক্কেল বিগড়ে যায়।

তারপর পার্নেল বলে, আমি পরে কেসটার ব্যাপারে বার্টকে সব জানাচ্ছি কিন্তু মিস্টার পামার, আপনি মন ঠিক করে নিয়েছেন তো? আপনি অ্যাকশন চান?

—আমি চাই না।

—চান না?

—না।

—তবে এখানে এসেছেন কেন, তা তো……..।

—এসেছি মিঃ হ্যামেলের জন্য। উনি অ্যাকশন চান। তাই আপনারা এগিয়ে চলুন।

তারপর পার্নেল আমার দিকে তাকিয়ে বলে, মিঃ হ্যামেল তাঁর স্ত্রীর সম্বন্ধে কদর্য চিঠিপত্তর পাচ্ছেন।

—কদর্য? আমি একটু চোখ কুঁচকে পার্নেলের দিকে তাকাই।

—হ্যাঁ।

—তাঁর স্ত্রীর বয়স কত? আমি জানতে চাই।

—পঁচিশ।

—আর মিঃ হ্যামেলের?

—আটচল্লিশ।

—আটচল্লিশ?

—হ্যাঁ।

—প্রায় ডবল।

—হ্যাঁ, হিসেবে তাই দাঁড়াচ্ছে বই কী! আর সেই জন্যই তিনি ভাবতে শুরু করেছেন, এত কম বয়েসী মেয়েকে বিয়ে করে ভুল করেছেন।

একটু হেসে পার্নেল আবার বলে, মিঃ হ্যামেল যখন লেখেন তখন তাঁর একা থাকা দরকার।

—হ্যাঁ, লেখকের পক্ষে তা প্রয়োজন বই কি। আরো বিশেষ করে তিনি যখন একজন নামকরা লেখক।

তারপর আমি জিজ্ঞেস করি, মিঃ পার্নেল, তখন তাঁর স্ত্রী কী করেন?

—তা আমি জানি না। তবে সে সময় তিনি তাঁর স্ত্রীকে নিজের মত চলতে দেন।

—আচ্ছা, চিঠিগুলোর বক্তব্য কী ?

—তাঁর স্ত্রী একটা যুবকের সঙ্গে বিশ্রীভাবে জড়িয়ে পড়েছে, আর এসময় তিনি কী না একটা উপন্যাসের মাঝামাঝি জায়গায় এসে পড়েছেন।

এই পর্যন্ত বলে পার্নেল আমার দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে পামারের দিকে তাকিয়ে বলে, মিঃ পামার, ঠিক বলছি তো ?

—হ্যাঁ, ঠিকই বলছে।

—ধন্যবাদ !

—আর এই বইটা লেখার ব্যাপারে মিঃ হ্যামেল বিশেষভাবে চিন্তিত।

—চিন্তিত ?

—হ্যাঁ।

—কেন ?

—এই উপন্যাসটা সিনেমা হচ্ছে।

—অর্থাৎ কনট্রাক্ট হয়ে গেছে ?

—হ্যাঁ।

—কতাতে ?

—দশ মিলিয়ান ডলারে।

—আর প্রকাশকের সঙ্গে ?

—এক মিলিয়ান ডলার।

—বইটা কবের মধ্যে মিঃ হ্যামেলের দিতে হবে।

—চার মাসের মধ্যে।

টাকার কথা শুনে আমি অবাক হয়ে ভাবি, একটা উপন্যাস লেখার জন্য এগারো মিলিয়ান ডলার। ভাবা যায় না। অন্তত আমার মস্তিষ্কে আসছে না।

—এই চিঠিগুলো মিঃ হ্যামেলের মনযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে, পার্নেল জানায়।

—তিনি লেখা বন্ধ করে দিয়েছেন, পামার বলে। অথচ আমি তাঁকে বলেছি, চিঠি লেখার কথা একেবারে ভাববেন না। এগুলো সব মাথা খারাপ লোকের কাজ। এসব নিয়ে চিন্তা করা বাদ দিন। আর বইটা চার মাসের মধ্যে শেষ করতে না পারলে সিনেমার লোকেরা আপনাকে ছেড়ে কথা বলবে না। তারা ঠিক আপনার নামে মামলা ঠুকে দেবে। কিন্তু কে কার কথা শোনে!

পামার আরো বলে, মিঃ হ্যামেল যতক্ষণ পর্যন্ত নিশ্চিন্ত হতে না পারছেন যে এগুলোর মধ্যে কোন গুরুত্ব নেই, ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি লেখায় হাত দেবেন না। আর তিনি স্পষ্ট বলে দিয়েছেন, তাঁর স্ত্রীকে যেন চোখে চোখে রাখা হয়।

এই কথাটা শুনেই ভাবি, এই আর একটা হতাশার কেস। ঘন্টার পর ঘন্টা

গাড়িতে বসে থাক। অথচ বলতে গেলে অনেক সময়ই কিছুই পাওয়া যায় না। এ বড় একটা বাজে ব্যাপার। তারপর হয়তো হঠাৎ একদিন দেখা যাবে, ঘটনাস্থলে সহসা কেউ একজন হাজির হবে। আর সঠিকভাবে দৃষ্টি দিতে না পারলে সে লোকটাও হারিয়ে যাবে। তবে সত্যি কথা বলতে কী, কারুর স্ত্রীর প্রতি নজর রাখার ব্যাপারটা আমি ঠিক ভালো চোখে দেখি না।

হঠাৎ পার্নেল বলে ওঠে, ওটা কোন একটা সমস্যা নয়।

—সমস্যা নয়? পামারের চোখদুটো সহসা উজ্জ্বল হ'য়ে ওঠে।

—হ্যাঁ, পার্নেলের মুখে একটা আত্মপ্রসাদের হাসি ফুটে ওঠে। আমরা ঠিক এর সমাধান করে দেবো। আর আমরা রয়েছিই তো এসব করতে।

—ধন্যবাদ মিঃ পার্নেল। আর তাইতো এখানে এত এজেন্সি থাকতে আপনার কাছে এলাম।

—সে জন্য আপনাকেও ধন্যবাদ!

তারপর পামার বলে, তবে মিঃ হ্যামেলের উচিত ছিল, চিঠিগুলো তাঁর স্ত্রীকে দেখানো। কিন্তু তিনি তাতে নারাজ। তিনি এর সম্পূর্ণ বিরোধী।

—নারাজ কেন?

—এটা নাকি তাঁর স্ত্রীর পক্ষে একটা অপমানজনক ব্যাপার হবে।

—অপমানজনক?

—হ্যাঁ।

—কিন্তু···।

—কিন্তু কী?

—কিন্তু মিঃ হ্যামেল বলছেন, তাঁর স্ত্রীর প্রতি নজর রাখা, সেটা হলো··· ।

—কে জানে, আর মিঃ হ্যামেল চান প্রতি সপ্তাহে তাঁকে একটা করে রিপোর্ট পাঠানো হোক।

—তিনি তাঁর স্ত্রীকে বিশ্বাস করেন না? আমি পামারের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করি।

—এ ব্যাপারে মিঃ হ্যামেলের একটা দুর্ভাগ্যজনক আগের অভিজ্ঞতা রয়েছে।

—সেটা কি?

—মিসেস ফ্রান্সি হ্যামেল তার প্রথম স্ত্রী নন, পামার একটু ইতস্তত করে বলে।

—এর আগেও মিঃ হ্যামেল একটা বিয়ে করেছিলেন?

—হ্যাঁ।

—কবে?

—তিন বছর আগে।

—আচ্ছা, সে ডিভোর্সের কারণ?

—সে ভদ্রমহিলাও ফ্রান্সির মত একলা হয়ে পড়েছিলেন এবং তিনি ভাবতেন

তাঁকে অবহেলা করা হচ্ছে। এ কথাটা ভাবা মোটেই অন্যায় নয়। কারণ তখন মিঃ হ্যামেল রাতদিন লেখায় ডুবে থাকতেন।

—তাহলে এটাই কী তাঁদের বিবাহ বিচ্ছেদের কারণ ?

—না, এটাই সব নয়।

—তবে ?

—একটি যুবকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ মেলামেশা একেবারে হাতে নাতে মিঃ হ্যামেল একদিন ধরে ফেলেন।

—আর তারপরই বুঝি ডিভোর্সের দিকে মিঃ হ্যামেল ঝুঁকলেন ?

—হ্যাঁ।

ওদের কথার মাঝে পার্নেল বলে ওঠে, মিঃ হ্যামেল ঠিকই করেছেন।

পামার বলে, মিঃ হ্যামেল যখন লেখেন তিনি তখন একেবারে অসামাজিক জীব হয়ে ওঠেন। সবার সঙ্গে মেলামেশা একবারে বন্ধ করে দেন।

—তিনি কখন লেখেন ?

—সকাল ন'টা থেকে সন্ধ্যে সাতটা পর্যন্ত ?

—এতক্ষণ ? আমি বলে উঠি।

—হ্যাঁ।

—তখন কী তিনি কারুর সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করেন ?

—একেবারে না। লাঞ্চ পর্যন্ত ঐখানে বসে সারেন। একজন সন্ত বিবাহিত তরুণী স্ত্রীর পক্ষে ব্যাপারটা মেনে নেওয়া কষ্টকর বই কী ! এর ফলেই তাঁর স্ত্রী নিঃসঙ্গতার মাঝে ডুবে যেতে থাকেন। আর এর জন্যেই⋯ ⋯।

হঠাৎ একটা টেলিফোন বেজে উঠতে পার্নেল ডেস্কের উপর থেকে হাত বাড়িয়ে রিসিভারটা তুলে নিলো এবং ভ্রু কুঁচকে বললো, ঠিক আছে দশ মিনিটের মধ্যে আসছি।

তারপর রিসিভারটা নামিয়ে রেখে পার্নেল পামারের দিকে তাকিয়ে বলে, আপনি বার্টের সঙ্গে যান এবং মিসেস হ্যামেলের একটা বিবরণ ওকে জানান। আর তাঁর কে কে বন্ধু, তাঁর স্ত্রী সারাদিন কী করেন। অবশ্য এটা যদি আপনার জানা থাকে, তাহলে ওকে জানাবেন।

তারপর চেয়ার ছেড়ে উঠে যেতে যেতে পার্নেল বলে, মিঃ পামার, এর জন্য চিন্তা করার কিছু নেই। আর দয়া করে মিঃ হ্যামেলকে বলবেন, সাত দিনের মধ্যেই তিনি হাতে হাতে আমাদের রিপোর্ট পেয়ে যাবেন। এবং এওয়ারসনের কাছে কাজ হয়ে যাবার পর মিস্ কেরীর সঙ্গে একবার দেখা করে যাবেন।

—মিস কেরী ? পামার একটু অবাক হয়ে পার্নেলের দিকে তাকায়। সেই সঙ্গে তার মুখে কিছুটা বিস্ময়ের ভাব ফুটে উঠেছে।

—হ্যাঁ।

—কেন ?

—তিনি আপনাকে আমাদের ফিস এবং টাকা পয়সার ব্যাপারে বুঝিয়ে বলবেন।

—আশা করি খুব একটা বেশী হবে না।

—মিস্টার হ্যামেল তা দিতে পারবেন, পার্নেল হেসে বলে। এবং সে সম্বন্ধে আপনাকে নিশ্চিন্ত করতে পারি।

আমি পামারকে আমার অফিসের দিকে নিয়ে চললাম। আমরা একটা লম্বা করিডোরের মধ্য দিয়ে চলেছি।

আমাদের এদিকে আসতে দেখে চিক তাড়াতাড়ি ডেস্কের উপর থেকে পাটা নামিয়ে নেয়। সেই সঙ্গে সে আর একটা কাজও দ্রুত করে। ম্যাগাজিনটা তাড়াতাড়ি মেয়েদের ম্যাগাজিনের জায়গায় রেখে দেয়।

তারপর আমি চিকের সঙ্গে পামারের পরিচয় করিয়ে দিলাম। এরপর ওরা একে অপরের সঙ্গে করমর্দন করে।

এখন আমার মনে হলো পানীয় হলে ভালো হয়। তাই আমি পামারের দিকে তাকিয়ে বলি, একটু স্কচ হলে কেমন হয় ?

আমার কথা শুনে চিকের মধ্যে একটা প্রতিক্রিয়া হলো। সহসা তার মুখখানা উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। কিন্তু পামারের কথা শুনে সে মনক্ষুণ্ণ হলো।

পামার বললো, না ধন্যবাদ! স্কচটা দিনের বেলা ঠিক আমার সহ্য হয় না। একটা পিঙ্ক জিন হলেই চলবে।

—ঠিক আছে।

তারপর আমি পামারের দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে চিকের দিকে তাকিয়ে বলি, তাহলে কিছু পান করা যাক।

আমার কথা শেষ হবার পরই দুটো স্কচের বোতল, আর পিঙ্ক জিন এসে গেল। ইতিমধ্যে পামারকে আমি মক্কেলদের চেয়ারে বসিয়েছি। আর আমি আমার চেয়ারে।

গ্লাসে চুমুক দিয়ে আমি বলি, আমি আর চিক এক সঙ্গে কাজ করি।

—আচ্ছা, পামার মাথা নাড়ে।

ইতিমধ্যে চিক পামারের দিকে পিঙ্ক জিনের গ্লাসটা এগিয়ে দিয়েছে। পামার তাতে চুমুক দেবার আগে চিককে ধন্যবাদ জানায়।

আমাদের প্রত্যেক অফিসে একটা করে ককটেল কেবিনেট রয়েছে। তা থাকলেও মক্কেলদের সঙ্গে ছাড়া অপারেটারদের ড্রিঙ্ক করার নিয়ম নেই। তবে নিজেদের দরকার হলে ড্রয়ার থেকে বোতল বার করে খেতে পারে। তাতে কোন বাধা নিষেধ নেই।

তারপর পামার আমায় যা বলেছিল, তা আমি চিককে শোনাই। এরপর আমি বলি, এমন ভাবে মিসেস হায়েসের দিকে দৃষ্টি রাখতে হবে যাতে তিনি আদৌ জানতে না পারেন।

—হ্যাঁ, পামার আমার কথায় সমর্থন জানিয়ে আস্তে আস্তে গ্লাসে চুমুক দেয়।

কিন্তু চিকের মুখভঙ্গি দেখে বুঝলাম সেও আমার মত হতাশ হয়েছে। তবু সে মাথা দুলিয়ে বলে, আচ্ছা।

এবার আমি পামারের দিকে তাকিয়ে বলি, আপনি মিসেস্ হায়েসের একটা বর্ণনা দিন।

—আমি মিসেস হায়েসের একটা ছবি এনেছি।

—এনেছেন?

—হ্যাঁ।

—ভালোই করেছেন। ছবিটা দেখি।

—এই নিন, বলে পামার তার ব্রিফ কেস খুলে দশ ইঞ্চি বাই ছ'ইঞ্চি গ্লোসি কাগজের একটা ছবি আমার দিকে বাড়িয়ে দেয়।

আমি ছবিটা হাত বাড়িয়ে নিয়ে সেটার দিকে খানিকক্ষণ একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলাম এবং মনে মনে বলে উঠি, সত্যি, বারবার দেখার মত একটা ছবি বটে।

কালো চুল। নজর কাড়ার মত বড় বড় আকর্ষণীয় চোখ। পান পাতার মত পাতলা ঠোঁট, যা আদরে আদরে রাঙিয়ে তুলতে ইচ্ছে করে। চোখা নাক, যাতে দুষ্টুমি করার সময় মৃদু ঘুঁষি মারতে মন চায়।

ওর পরনে একটা সাদা সার্ট। সার্টটা ওর শরীরের সঙ্গে যেন লেপ্টে রয়েছে। তা থেকে ওর যৌবনবতী চেহারার পূর্ণ বিবরণ পেতে কোন অসুবিধে হয় না। আর এ পোষাক-আষাকে তাকে কেমন দেখাচ্ছে, তা নিশ্চয়ই সহজে বুঝতে পারছেন। যাকে বলে গায়ে সামান্য একটি কাপড় জড়িয়ে স্নান করার পর উপভোগ্য দৃশ্য।

ওদিকে আমি আমার বন্ধুর অবস্থা বুঝতে পারছি। ও নিশ্চয়ই চাইছে না, স্বার্থপরের মত এতক্ষণ ধরে এ লোভনীয় ছবিটা দেখি। বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে না যে, ক্রমশ ওর ধৈর্যে চিড় ধরছে। এখানে পামার না থাকলে অনেকক্ষণ আগেই ও আমার হাত থেকে এ ছবিটা কেড়ে নিত।

আমি ছবিটা চিকের দিকে এগিয়ে দিই এবং ওর প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করতে থাকি। ছবিটা দেখে ও সম্ভবত অনেক কষ্টে শিস দিতে বিরত থাকলো। কারণ এসব মুহূর্তে ও এ ধরণের কাজগুলো সাধারণত করে থাকে। আর তাতে যে আমি মজা পাই না, তা নয়। কারণ দু'জনেই তো এক গোয়ালের গরু।

—আচ্ছা মিঃ পামার, মিসেস হায়েস সারাদিন কি করেন? এবার দৃষ্টি আমার পামারের দিকে।

—উনি সকাল ন'টার সময় ঘুম থেকে উঠে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়েন, ও'র ঘনিষ্ঠ বন্ধু মিসেস পেনি হাইবির সঙ্গে টেনিস খেলতে। কান্ট্রি ক্লাবে। মিসেস পেনি হাইবি মিঃ মার্ক হাইবির স্ত্রী। উনি মিঃ হ্যামেলের অ্যাটর্নি।

—হুঁ। তারপর মিসেস হ্যামেল কি লাঞ্চ সারতে বাড়ি ফিরে আসেন। না অন্য কোথায় লাঞ্চ সারেন ?

—তিনি বাড়ি ফিরে আসেন না, ঐ কান্ট্রি ক্লাবেই লাঞ্চ সেরে নেন। তারপর তিনি হয় স্পীড বোটে করে ঘুরে বেড়ান, অথবা মাছ ধরতে যান। কিংবা কোন বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে বেরিয়ে পড়েন।

—আচ্ছা, এসব আপনি কি করে জানলেন ?

—মিসেস হ্যামেল মিঃ হ্যামেলকে এ কথা বলেছেন। আমি আবার তাঁর কাছ থেকে শুনেছি। গ্লাসে চুমুক দিয়ে পামার আবার বলে, তাঁর স্ত্রী দিনের বেলা কি করেন, এটা তাঁর জানা প্রয়োজন।

—আচ্ছা, মিঃ হাইবির স্ত্রীর সঙ্গে টেনিস খেলা কী মিঃ হ্যামেল পছন্দ করেন ?

—হ্যাঁ।

—আর মিসেস হ্যামেল সত্যি কান্ট্রি ক্লাবে টেনিস খেলতে যান আপনি তা দেখেছেন ?

—না। তবে সেটা মিথ্যে হলে মিসেস হ্যামেলের পক্ষে ক্ষতিকর হবে। তাহলে মিথ্যেটা খুব সহজে ধরা পড়ে যাবে। কারণ মিঃ হ্যামেলের সঙ্গে মিঃ হাইবির মাঝে মধ্যেই দেখা-সাক্ষাৎ হয়।

—আর সেই চিঠিগুলো ?

—এনেছি এই নিন, বলে পামার আগের মত ব্রিফ কেস খুলে দুটো হাল্কা নীল রঙের খাম আমার দিকে এগিয়ে দেয়। আর সেই সঙ্গে তার ব্যবসা-সংক্রান্ত আইভরি কার্ডটা বাড়িয়ে দিতেও ভুলে যান না।

তারপর পামার ব্রিফ কেসটা বন্ধ করতে করতে ঘড়ির দিকে তাকায়। সরি ! আমি আর বসতে পারছি না। আমার একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে। আর কোন খবরের দরকার পড়লে আপনি দয়া করে আমায় জানাবেন। তবে মিঃ হ্যামেলকে যেন বিরক্ত করবেন না।

এই বলে পামার চেয়ার ছেড়ে উঠে দরজার দিকে এগিয়ে যায় এবং সহসা ওখানে দাঁড়িয়ে বলে, আশা করি সম্পূর্ণ ব্যাপারটা গোপন থাকবে।

—নিশ্চয়ই ! আমি বয়েস স্কাউটের মত হেসে বলি। আর গোপনীয়তা রক্ষা করা তো যেমন আমাদের একটা পবিত্র কর্তব্য, তেমন এটা ব্যবসার প্রধান অঙ্গও বটে।

—ধন্যবাদ! তারপর পামার জানতে চায়, মিস কেরী কোথায় বসেন।

—প্রেস্তার অফিসে, বলে আমি পামারকে অফিসটা দেখিয়ে দিই। আপনি ওর সঙ্গে দেখা করলে ও আমাদের সব কিছু আপনাকে বুঝিয়ে বলে দেবে।

এরপর আর একটা কথা পামারের মনে পড়তে বলে, হ্যাঁ। একটা কথা বলতে একেবারে ভুলে গেছি।

হয়তো কিছুই পাবেন না। তবুও যদি খারাপ কিছু চোখে পড়ে তাহলে সঙ্গে সঙ্গে তা মিঃ হ্যামেলকে জানাবেন না। আমায় জানাবেন। কারণ এর সঙ্গে বহু টাকা জড়িত।

—আচ্ছা।

তারপর আমি ভাবি, পামার এগারো মিলিয়ান ডলারের শতকরা দশ ভাগ হ্যামেলের এজেণ্ট হিসেবে পাবে। অনেক টাকা। আর পামারের কথা শুনে আমার মনে হয়, পামার হ্যামেল এবং তার স্ত্রীর চেয়ে তার কমিশনের প্রতি বেশী আগ্রহী।

যাক, আমি পামারকে নিয়ে কেরীর কাছে যাই। কেরী বসে আছে। আমি তাকে ততটা পছন্দ করি না। ওর চোখ দুটো সব সময় যেন অস্থির। মনে হয়, ও একটা অস্থিরতায় ভুগছে।

কেরী সাধারণ মেয়েদের তুলনায় লম্বা।' নিজেকে সে সুন্দর করে সাজিয়ে রেখেছে। পরনে ওর ঘোর নীল রঙের ফ্রক, কলার এবং হাতা সাদা। তাকে এক নজর দেখলেই মনে হবে, সে এই কাজে বেশ দক্ষ।

তারপর পামার সঙ্গে কেরীর পরিচয় করিয়ে দিয়ে আমার অফিসে ফিরে এসে দেখি, চিক লোভ সামলাতে না পেরে সেই কদর্য চিঠিগুলোর একটা পড়ছে। আর তার পা দুটো আগের মত ডেস্কের উপর তোলা।

চিকের গ্লাস ভর্তি দেখে আমারও গ্লাসটা ভর্তি করে নিয়ে চেয়ারে বসি।

—শোন, পড়ি, বলে চিক একটা চিঠি পড়তে শুরু করে দেয়।

প্রিয় মিঃ হ্যামেল,

তুমি যখন তোমার বস্তা পচা উপন্যাস লিখছো তখন তোমার স্ত্রী ওয়ালডো কারমাইকেলের সঙ্গে ফুর্তি করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। রেসের ঘোড়া সাধারণ ঘোড়াকে সব সময় হারিয়ে দেয়। আর তুমি হলে গিয়ে একটা বুড়ো ঘোড়া!

বুঝেছো হে বুড়ো খোকা!

ইতি—

এটা পড়ে চিক চিঠিটা টেবিলের উপর রেখে আর একটা চিঠি তুলে নিয়ে পড়তে থাকে, এবার এইটা শোন।

প্রিয় মিঃ হ্যামেল,

কারমাইকেলে তোমার চেয়ে অনেক ভালোভাবে উপভোগ করতে জানে। আর তোমার সুন্দরী যুবতী স্ত্রী ন্যান্সিও তাই পছন্দ করে। এই যৌবন হলো যুবক যুবতীদের জন্য। তোমার মত বুড়োদের নয়।

ইতি—

তারপর চিঠিটা ডেস্কের উপর রেখে চিক গ্লাসে চুমুক দেয়।

আমি চিঠিগুলোর দিকে তাকাই। সেগুলো হাতে লেখা নয়। টাইপ করা। আর খামের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারি, সেগুলো প্যারাডাইস সিটি থেকে মেল বাক্সে ফেলা হয়েছে।

এরপর চিঠিগুলোর দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে ন্যান্সির ছবির দিকে তাকাই। সত্যি, বার বার দেখার মত ছবি।

আমি ছবির দিকে তাকিয়ে আছি দেখে চিক বলে, আমি জানি, এখন তোমার মনে কী হচ্ছে। তুমি যদি এমন একটা মেয়ে হতে, যার স্বামী সকাল ন'টা থেকে সন্ধ্যে সাতটা পর্যন্ত লেখে, তাহলে তুমি বাইরে কিছু একটা করে বেড়াতে।

—আর তুমি? আমি চিককে পাল্টা প্রশ্ন করি।

—তা করতাম বই কী!

—বন্ধু পথে এসো এবার।

তারপর আমি হাত ঘড়ির দিকে তাকাই। বারোটা বেজে পাঁচ মিনিট সবে হয়েছে। চিককে বলি, পামারের কথা মত এখন ন্যান্সির কান্ট্রি ক্লাবে থাকার কথা। আমি এখন ওখানে যাচ্ছি। এবং ও যতক্ষণ পর্যন্ত না বাড়ি ফিরছে ততক্ষণ আমি ওর পিছনে থাকছি। আর তুমি এ সময় ওয়ালডো কারমাইকে খুঁজে বেড়ালে কেমন হয়?

—ঠিক আছে।

আমি এলিভেটারের দিকে যেতে যেতে কেরীর দিকে তাকিয়ে বলি; কাজ শুরু করে দিলাম আজ থেকেই।

—ভালো কথা।

তা রফা কেমন হলো? ভালোই বলে মনে হচ্ছে।

—কর্নেলকে গিয়ে জিজ্ঞেস করো না! উনি নিজেই তোমায় বলে দেবেন, বলেই কেরী কাজে মন দেয়।

পার্নেল ডিটেকটিভ এজেন্সির সমস্ত অপারেটাররা কান্ট্রি ক্লাব, ইয়ার্ট ক্লাব, ক্যাসিনো এবং সমস্ত নাইট ক্লাবের মেম্বার। আর ধনী লোকেরা সাধারণত এসব জায়গায় বেশী যায়।

সমস্ত অপারেটারের কাছেই 'পার্নেল ক্রেডিট কার্ড' রয়েছে। এই কার্ড দেখালেই ফিল্ মিল এবং পানীয় পেতে কোন অসুবিধে হয় না। যদিও এতে পার্নেলের অনেক খরচ হয়, তবুও ব্যবসার খাতিরে এসব করতে হয়। তেমনি আবার অ্যাকাউনটেন্ট চার্লস এডওয়ার্ড প্রচুর খরচ হয়ে গেলে কঠোরভাবে তাকায়, কিন্তু কাজের খাতিরে কিছু বলে না।

কান্ট্রি ক্লাবের বিলাসবহুল লাউঞ্জে বসে আমি টাইম ম্যাগাজিনের পাতা ওল্টাচ্ছি। কিন্তু আমার দৃষ্টি দরজার দিকে। কখন ন্যান্সি এখানে আসে। তবে ছবির সঙ্গে আসল মানুষের অনেক সময় মিল থাকে না।

কিছুক্ষণ পরে আমি একজন তরুণীকে আসতে দেখলাম। সঙ্গে সঙ্গে আমি সজাগ হয়ে উঠি। আমার মনে হয়, ও ন্যান্সি হ্যামেল না হয়ে কিছুতেই যায় না। হ্যাঁ, আমার ধারণাই ঠিক হলো।

ন্যান্সি আমার একবারে কাছে এসে গেছে। ওকে এত কাছ থেকে দেখে দারুণ লাগছে। এবার ভাবি, ওর ছবিটা সত্যি খারাপ উঠেছে।

ন্যান্সির পরনে শাদা টিসার্ট এবং সাদা প্যান্ট, আর ওর শরীরের গঠন এত সুন্দর যে, ওর দিক থেকে কিছুতেই চোখ ফেরাতে পারছি না। ভাবি প্যারাডাইস সিটিতে কত সুন্দরী আছে। কিন্তু ন্যান্সি ন্যান্সিই। ওর সঙ্গে কারুর তুলনা করা চলে না। ও প্রতিদ্বন্দ্বী।

ন্যান্সের সঙ্গে একজন মহিলা রয়েছে। সে ওর চেয়ে কম করে দশ বছরের বড় হবে।

তার পা দুটো ছোট। কোমর কিছুটা সরুর দিকে।

আমার মনে হয়, ন্যান্সির সঙ্গে মহিলা পেনি হার্বি, ওরা নিজেদের মধ্যে কি যেন বলতে বলতে চলেছে।

আমার কাছ থেকে যাবার সময় পেনি বললো, এই বয়সে বিশ্বাসই করতে পারলাম না!

সে কী বিশ্বাস করতে পারছে না, তা আমার কাছে রহস্য রয়ে গেল।

এরপর তারা দরজার কাছে এগিয়ে যায়। সেখানে পৌঁছে পরস্পর পরস্পরকে বিদায় জানালো।

পেনি গেল 'কেডির' দিকে, আর ন্যান্সি গিয়ে উঠলো ধূসর রঙের 'কেরারীতে'।

কেরারী স্টার্ট দেবার আগে আমি আমার অফিস গাড়িতে গিয়ে উঠতে পারলাম এবং এই সমস্ত কাজে কখনো নিজের 'মেসারটা' ব্যবহার করি না।

বেরিয়ে গেছে। ট্রাফিকে ওটা আটকে না পড়লে কিছুতেই ধরতে পারতাম না।

ট্রাফিক কেরারীটা থেকে যেতে আমিও আমার গাড়িটা একটা 'লিনকন' গাড়ির কাছে দাঁড় করালাম। তারপর ট্রাফিক ছেড়ে দিতে কেরারীর পিছন পিছন এসে বন্দর পর্যন্ত হাজির হলাম।

এখানে এসে ন্যান্‌সি গাড়ি থেকে নামতে আমিও আমার গাড়ি থেকে নামলাম। তারপর সে ইয়াটগুলোর দিকে এগিয়ে যায়।

এদিকে আমিও বসে নেই। কিছুটা দূরত্ব বজায় রেখে আমি ন্যান্‌সিকে অনুসরণ করে চললাম।...

ন্যান্‌সি হাঁটতে হাঁটতে প্রায় সত্তর ফুট লম্বা একটা মটর চালিত ইয়াটের কাছে এসে দাঁড়ায়। তারপর সে ইয়াটে উঠে অদৃশ্য হয়ে গেল।

এরপর আমার আর কিছুই করার নেই। তবু আমি অপেক্ষা করতে থাকি।

হঠাৎ আমার একজনের দিকে দৃষ্টি গেল। সে একটি নিগ্রো ছেলে, পেশী বহুল স্বাস্থ্য। সে আস্তে আস্তে বন্দরের ভেতর ডেকে সমুদ্রের দিকে এগিয়ে চললো। এদিকে ইয়াটের ইঞ্জিনটা গর্জন করে সমুদ্রের ভেতরে চলতে লাগলো। এবং আমার দৃষ্টির সামনে ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল।

আমি এই নিগ্রো ছেলেটিকে চিনি। ওর নাম অ্যালবার্নি। ও জাহাজ বাঁধা পোস্টের উপর বসে বীয়ারে চুমুক দিচ্ছে।

অ্যালবার্নি বন্দরের যাবতীয় তথ্যের খবরা-খবর রাখে। জানি, ওকে বীয়ার খাওয়ালেই ও মুখ খুলবে। আবার বীয়ারের বোতল শেষ হয়ে এলে ওর কথাও বন্ধ হয়ে যাবে। অর্থাৎ বীয়ার শেষ, কথাও শেষ।

আমি হাঁটতে হাঁটতে অ্যালবার্নির কাছে এসে দাঁড়াই, তারপর ওর দিকে তাকিয়ে বলি, এই যে বার্নি, একটা ড্রিঙ্ক চলবে নাকি ?

অ্যালবার্নি আমার কথার কোন জবাব না দিয়ে বীয়ারের খালি বোতলটা সমুদ্রের দিকে ছুঁড়ে মারে : সে পরণের প্যান্টটা উপরের দিকে তুলে হাসে।

অ্যালবার্নিকে দেখে আমার মনে হলো, যেন ও বিরাট একটা তিমি মাছ। সামনে ভোজ আসতে দেখে যেন খুশী হলো।

তারপর অ্যালবার্নি বলে, বীয়ার হলে মন্দ কী ! এই বলে সে উঠে দাঁড়িয়ে 'নেপচুন ট্যাভানের' দিকে চলতে শুরু করে দিল।

আমি অ্যালবার্নির সঙ্গে চলতে চলতে ঐ অন্ধকারাচ্ছন্ন বারটার দিকে গেলাম। তারপর বারে ঢুকে দেখি, বারটা ফাঁকা। শুধু বারম্যান সাম সেখানে রয়েছে। সাম আমাকে আর অ্যালবার্নিকে বারে প্রবেশ করতে দেখে তার

[illegible] এবং অভ্যর্থনা জানিয়ে বলে, আসুন মিঃ এণ্ডারসন, কি দেবো ?

আমি অ্যালবার্নিকে নিয়ে বারের এক কোণে বসে সামনের দিকে তাকিয়ে বলি, বার্নি যা বীয়ার খেতে চায় দাও।

আমায় একটা কোক দাও।

সাম চলে যেতে অ্যালবার্নি একটা কাঠের বেঞ্চিতে বসতে বসতে বলে, মিঃ এণ্ডারসন, আপনার আওয়াজটা শুনতে কিন্তু বেশ লাগে।

—আপনার কিছু খবরের দরকার, তাই না ?

—তুমি কী করে বুঝলে ?

—আপনার যে সেটাই পেশা।

—বীয়ার আর কোক এলো। আমি কোকে চুমুক দিয়ে বলি, হ্যাঁ. কিছু খবর জানা দরকার বই কী! দেখলে তো যে ইয়াটটা বেরিয়ে গেল। ওটার সম্বন্ধে কিছু বলতে পারো ?

অ্যালবার্নি বীয়ারের বোতলটা শেষ করে কাঠের টেবিলে ঠক করে একটা শব্দ করতে সাম আর এক বোতল বীয়ার দিয়ে যায়।

অ্যালবার্নি বীয়ারের বোতলটা তুলে নিতে নিতে বলে, ঐ বোটটা রস হ্যামেলের। তিনি একজন লেখক। বাজারে বইয়ের তার দারুণ কাটতি।

তারপর অ্যালবার্নি বসে বই পড়া মানে সময় নষ্ট করা।

—ঠিক বলেছো। আচ্ছা যে মেয়েটি গেল সে কী হ্যামেলের স্ত্রী ? আমি অ্যালবার্নির দিকে তাকাই।

অ্যালবার্নি চট করে আমার কথার জবাব না দিয়ে ছোট ছোট চোখ দিয়ে কিছুক্ষণ আমায় দেখলো। তারপর বলে, হ্যাঁ স্ত্রী এবং মেয়েটি ভালো।

তারপর অ্যালবার্নি একটু থেমে বলে, মিঃ এণ্ডারসন, এবার আপনি আমার একটা কথার উত্তর দেবেন ? আপনি ওর ব্যাপারে জানতে চাইছেন কেন ?

—আমি সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে সামলে নিয়ে মিথ্যের আশ্রয় নিই। বলি, ওর ব্যাপারে আমার আদৌ আগ্রহ নেই। আমি ইয়াটের চালক সম্বন্ধে আগ্রহী। আচ্ছা, ও কী এখানে অনেকদিন ধরে কাজ করছে ? ওর নাম কী ?

—হ্যাঁ। ওর নাম ?

—জোস জোন্স। জোন্স একটা অপদার্থ নিগ্রো। জন্মগত জুয়াড়ী। ওর সব সময় টাকার প্রয়োজন। সে কয়েক ডলারের জন্যে মাকেও বেচে দিতে পারে, অবশ্য যদি কেউ কেনে।

—আচ্ছা। কতদিন ধরে এই বোটটা চালাচ্ছে ?

—গত দু' বছর ধরে।

—আর বোট কেমন চালায় ?

—তাজোই এবং সেটাই ওর একমাত্র গুণ !!

—আচ্ছা, মিসেস হ্যামেল কি বোটটা নিয়ে রোজ বের হয় ?

—রোজ না হলেও সপ্তাহে দিন চারেক বের হয়। কিছু একটা করতে হবে তো। আমি শুনেছি, মেয়েটা বড় নিঃসঙ্গ।

—আচ্ছা। হ্যামেল লোকটা কেমন ?

অ্যালবার্নি বীয়ারের বোতলটাতে চুমুক দিয়ে জানায়, এক অহংকারী ধনী। অন্তত ভাবটা সেই রকম। তবে তাকে আমি খুব কমই দেখেছি।

—আর যখন সে বোট নিয়ে যায় তখন মনে হয় সারা বন্দরটাই যেন ওর।

আমার মনে হলো অ্যালবার্নি'র কাছ থেকে যা জানার তা আমার সব জানা হয়ে গেছে। এ প্রসঙ্গে আর কিছু জিজ্ঞেস করলে ওর মনে সন্দেহ জাগতে পারে।

তবু আমি কাঠের বেঞ্চ ছেড়ে উঠতে উঠতে বলি, বার্নি, জোন্স কি স্থানীয় লোক ? কোথায় থাকে ?

হ্যাঁ ও বন্দরের পিছনে থাকে।

তারপর অ্যালবার্নি আমার দিকে সন্দেহজনক ভাবে তাকিয়ে বলে জোন্স কী কোন রকম বিপদে পড়েছে। আর পড়লেও আমি আদৌ আশ্চর্য হবো না। সে আগেও কয়েকবার পুলিশের ঝামেলায় পড়েছে।

—পুলিশ স্মাগলিং এর ব্যাপারে ওকে সন্দেহ করে।

—কিছু পেয়েছে ?

—না। তেমন কিছুই ওর কাছে পাওয়া যায়নি।

তারপর আমি এই ব্যাপারে তেমন আগ্রহ প্রকাশ না করে বলি, আচ্ছা, হ্যামেলের ইয়াটটা সাধারণত কখন ফিরে আসে ?

ঠিক ছ'টায়। তখন ইচ্ছে করলে আপনি আপনার ঘড়ি মিলিয়ে নিতে পারেন। বলে অ্যালবার্নি হাসে।

—আচ্ছা বার্নি, চলি। আবার পরে দেখা হবে। তারপর সামের কাছে গিয়ে তার বিল মিটিয়ে দিয়ে বাইরে এসে দাঁড়ালাম। কড়া রোদ। আমি হাতঘড়ি দিকে তাকাই। দুটো বাজে অর্থাৎ এখনো আমার চার ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হবে। সুতরাং আর বসে না থেকে অফিসের দিকে পা বাড়ালাম।

অফিসে প্রবেশ করে কেরীকে জিজ্ঞেস করি, কর্নেল কি খুব ব্যস্ত ?

—হলেও যেতে পারো। তবে……। কুড়ি মিনিটের জন্য দেখা করতে পারেন। তারপর ব্যস্ত থাকবেন।

পার্নেলের ঘরে ঢুকে দেখি, সে একটা মোটা ফাইল পড়ছে। তবু আমি

তার দিকে তাকিয়ে বলি, স্যার, একটা সমস্যা।

—সমস্যা? পার্নেল ফাইলের উপর থেকে চোখ তুলে আমার দিকে তাকায়। চোখটা তার একটু কুঁচকে গেছে।

—কিসের?

—ন্যানসি ইয়াটে করে চলে গেছে। ফিরবে সেই ছ'টায়। এখন আর তাকে অনুসরণ করার কোন উপায় নেই। এই চার ঘণ্টায় সে অনেক কিছু করতে পারে। আর ইয়াটের চালক একটা নিগ্রো। লোকটা জুয়াড়ী। এবং টাকার জন্য সব কিছু করতে পারে। ওর পেছনে টাকা ঢালতে পারলে হয়তো কিছু খবর বেরিয়ে আসতে পারে। তবে আমার মনে হয়, ও মিথ্যে কথাই বেশী বলবে। এবং তা পরে হাত গিয়ে ন্যানসিকে বলে দেবে।

—ওকে বাদ দাও। আর আমাদের বলা হয়েছে, এমনভাবে ন্যানসির উপর দৃষ্টি রাখতে হবে যাতে সে জানতে না পারে। এর পরের বার ও যখন ইয়াটে চড়বে তখন তুমি ওকে হেলিকপ্টারে করে ফলো করবে।

—খরচটা একটু বেশী হয়ে……।

—তা হবে বই কী! তাতে কোন চিন্তার কারণ নেই। দেবে হ্যামেল। ওর আছেও যথেষ্ট।

—ঠিক বলেছেন, আমি পার্নেলের কথায় সায় জানিয়ে আমার অফিসে ফিরে এসে দেখি, চিক নেই। তারপর আমি রিসিভার তুলে হেলিকপ্টার এজেন্সিতে ফোন করি। ওখানে আমার এক বন্ধু কাজ করে। ওর নাম নিক হার্ডি।

—হ্যালো!

—আমি একটু নিক হার্ডির সঙ্গে কথা বলতে চাই।

—হ্যালো। নিক হার্ডি কথা বলছি।

—আরে এন্ডারসন! বলো তোমার খবর কী! আর তোমার জন্য কি করতে পারি!

—আমার একটা হেলিকপ্টার চাই।

—তবে নির্দিষ্ট তারিখ এবং সময় বলতে পারছি না।

—তাতেও কোন অসুবিধা হবে না।

—শুধু তুমি আমায় কয়েকঘণ্টা আগে বললেই হবে।

—তখন তুমি ম্যানেজ করতে পারবে কি?

—তোমার জন্য করতে হবে বই কী! না করলে চলবেই না।

• • •

আমার হাতে এখন অনেক সময়। ভাবি, বার্থাকে একবার ফোন করি। তার আগে বার্থার পরিচয় দেওয়া দরকার। বার্থা এখন আমার শয্যাসঙ্গিনী। গত ২ মাস ধরে এটা আমাদের মধ্যে চলেছে। সে আমার ডলারকে খুব

ভালোবাসে। এবং সে আমার কাছে থাকতেও খুবে আগ্রহী। আমাদের এই অন্তরঙ্গতাটা তেমন কিছু নয়। অর্থাৎ আমরা বিয়ে করতে যাচ্ছি না। সাথে নিয়ে ঘোরা এবং স্ফূর্তি করায় এর জুড়ি মেলা ভার।

যতদূরে জানি, বার্থা একটা ফ্যাসান হাউসে কাজ করে অথবা অন্যত্র। সে থাকে একটা স্টুডিও অ্যাপার্টমেন্টে। সেটা একটা উঁচু তলার ফ্ল্যাট। আর সেই অ্যাপার্টমেন্টটা সমুদ্রমুখী।

আমি বর্থাকে ফোন করি। একটু পরে অপর প্রান্ত থেকে জবাব ভেসে এলো, বার্থা একটু ব্যস্ত আছে।

—ঠিক আছে।

ফোন নামিয়ে রেখে রাস্তায় এসে দাঁড়াই। তারপর একটা স্টল থেকে এক প্যাকেট সিগারেট এবং 'নিউজ উইক' কিনে বন্দরের দিকে গাড়ি চালিয়েছি আর এখানে এসে অধীর আগ্রহে ন্যান্সির জন্য অপেক্ষা করতে থাকি।

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর দেখি, ইয়াটটা দ্রুতবেগে বন্দরের দিক এগিয়ে আসছে। সঙ্গে সঙ্গে আমি হাত ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখি, ঠিক ছ'টা বাজে। মনে পড়ে অ্যালবানি'র কথা। তার সঙ্গে সময়টা ঠিক মিলে গেল।

বন্দরে ইয়াটটা ভেড়ার পর ন্যান্সি এক রকম দৌড়ে বন্দরে নেমে এলো এবং যাবার সময় জোস জোন্সকে বললো, কাল ঠিক এই সময়ে। তারপর সে তার 'ফেরারা'র' দিকে এগিয়ে গিয়ে স্টার্ট করে দেয়।

সঙ্গে সঙ্গে আমিও গাড়িতে স্টার্ট দিই। ফেরী আমায় বলেছিল, হ্যামেল প্যারাডাইস ল্যারগোতে থাকে। সেখানে খুব ধনী লোকেরাই থাকতে পারে। এসব আমি বেশ ভালো করেই জানি।

এই লারগোতে প্রবেশ করা এত সহজ নয়। ঢুকতে গেলে প্রথমে নিজের পরিচয় দিতে হবে সিকিউরিটি গার্ডের কাছে আর কেনই বা যেতে চায় তাও জানতে হবে। এবং অ্যাপয়েন্টমেন্ট করা না থাকলে প্রবেশ করতে বেশ বেগ পেতে হয়।

এখানকার নিরাপত্তার ব্যবস্থা দারুণ। সিকিউরিটি গার্ড তো আছেই। সেই সঙ্গে তারের বেড়া, যাতে সব সময় ইলেকট্রিক কারেন্ট চলছে।

এখানে প্রায় চল্লিশটা বিরাট বাড়ি এবং ভিলা রয়েছে। লারগোটা কুড়ি ফুট উঁচু গাছ দিয়ে ঘেরা। দরজা পুরু ওক কাঠের।

লারগোতে ঢোকার মুখে একটা সরু রাস্তা রয়েছে। সেখানে অস্ত্র নিয়ে সব সময় প্রহরীরা পাহারায় আছে। তাই এই সব বেড়া টপকে কারুর পক্ষে হুট করে প্রবেশ করা এক রকম অসম্ভবই বলা চলে।

আমি লক্ষ্য করি, ন্যান্সি গাড়ি করে ভেতরে চলে গেল। বুঝতে পারলাম,

[illegible]।

আমি অফিসে ফিরে আসি। এসে দেখতে পাই, চিক গ্লাসে স্কচ ঢালছে।

—আমাকেও এক গ্লাস দিও, আমি বলি।

—নিজের বোতল থেকে বার করে খাও, বলে চিক নিজের বোতলটা ড্রয়ারে ঢুকিয়ে রাখে।

—সারাদিনে কিছু হলো? চিক গ্লাসে চুমুক দেয়।

—না, আমি চেয়ারে বসতে বসতে বলি।

—একবারে কিছুই না? যা দেখেছো তাই বলো।

—ন্যানসি টেনিস খেললো। ওখানে লাঞ্চ সারলো। ওখান থেকে বেরিয়ে ইয়াটে চড়লো। তারপর বাড়ি ফিরলো।

—তাহলে ন্যানসির ব্যাপারে কী করবে?

—আমার সঙ্গে কর্নেলের কথা হয়েছে। কাল থেকে ওকে হ্যালিকপ্টারে করে ফলো করতে বলেছে।

—তুমি বলো, আজ তুমি কী করলে?

—দূর! বলে চিক মুখটা বিকৃত করে।

—দূরের আবার কী হলো!

—ওয়ালডো কারমাইকেল বলে কেউ নেই। হয়তো নামটা কাল্পনিক। তাছাড়া, ওর সম্বন্ধে কেউ কিছু বলতেও পারলো না।

তারপর ড্রয়ার থেকে বোতলটা বার করে দেখি সামান্যই রয়েছে। সেটুকু গ্লাসে ঢেলে বোতলটা ঝুড়িতে ফেলে দিই।

—হ্যাঁ, সব বড় হোটেলগুলো দেখেছি। আর ছোট ও মাঝারীগুলো কাল দেখবো।

—আচ্ছা এই ব্যাপারে এরিন এবং ওয়ালির সঙ্গে কথা বললে কেমন হয়?

—আমি তাদের সঙ্গে কথা বলেছি।

—তারা কিছু বলতে পারলো না?

—ওনামের কাউকে তারা চেনে না। তবে তারা বলেছে, খুঁজে দেখবে।

এরিন 'প্যারাডাইস সিটি হ্যারল্ড' পত্রিকার সোসাইটি কলমের জায়গাটার লেখে। ওয়ালিও ফেলনা লোক নয়। সে একজন উচ্চপদস্থ অফিসার—জনসংযোগ অধিকর্তা।

আর আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ওয়ালডো কারমাইকেলকে যদি কেউ চেনে তাহলে এরা সবার আগে চিনবে।

তারপর আমি বলি, হয়তো পামারের কথাই ঠিক। কোন বদ্ধ উন্মাদ এই

—হতে পারে, আর আমি চিঠিগুলো ল্যাবরেটরিতে পাঠিয়েছি। দেখা যাক্ ওরা কি বলে।

আমি টেলিফোন তুলে ডায়াল করি। এনগেজ। আবার ডায়াল করি। এবার লাইন পেয়ে যাই।

হ্যালো! একটি সুন্দরীর সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর ভেসে আসে।

হ্যালো! আমি নিক হার্ডির সঙ্গে কথা বলতে চাই।

—ধরুন।

—হ্যালো নিক? আমি বার্ট কথা বলছি।

—বলো কী ব্যাপার? নিশ্চয়ই কোন প্রয়োজন। তোমাকে তো বিনা দরকারে বড় একটা পাওয়া যায় না।

—এ অপবাদ তুমি দিতে পারো। শোন, আমার একটা হ্যালিকপ্টার চাই। কাল দুপুরের দিকে।

—ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

—থ্যাঙ্ক ইউ!

আমি রিসিভার নামিয়ে ঘড়ির দিকে তাকাই। ঘড়িতে এখন ছটা বেজে পঁয়তাল্লিশ।

ঘড়ির দিক থেকে ঘাড় ফিরিয়ে জানলার দিকে তাকাই; রূপসী সন্ধ্যা। তাপদগ্ধ দিনকে বিদায় দিয়ে প্যারাডাইস সিটি যেন এখন নতুন সাজে সেজে নিজেকে মোহিনী করে তুলেছে।

বড় নিসঙ্গ বোধ করি। বার্থার কথা মনে পড়ে। ভাবি, ও হয়তো এখন অফিস থেকে বাড়ি ফিরে এসেছে। একবার টেলিফোন করলে বেশ হয়।

ওদিক চিক টেবিল-পত্তর গোছাতে শুরু করে দিয়েছে। পালাবে। হয়তো কোন ডেট আছে। আর অবিবাহিতরা এই নিয়েই তো বেঁচে আছে।

আমি বার্থাকে ফোন করি। একেবারেই লাইন মিললো। অপর প্রান্ত থেকে বার্থার সুরেলা গলা ভেসে এলো, হ্যালো!

—হ্যালো সুন্দরী! হোটেলে 'হ্যামবুর্গা' এবং তার সাথে তোমার সঙ্গী হতে তৈরি আছি।

—বার্ট তুমি!

—হ্যাঁ। তুমি না এলে অন্য কেউ কিন্তু···।

—যাবোনা কী বলেছি! বার্থা কথার তোলে।

—তবে আমি কিন্তু 'হ্যামবুর্গ' খেতে পারবো না।

আমার খিদেও পেয়েছে।

—সীগ্যালে? না প্রিয়া আজ থাক।

—পকেটের অবস্থা খুবই শোচনীয়! বরং সামনের মাসে ওখানে তোমাতে আমাতে খাওয়া যাবে।

—সামনের মাসে কেন, আজই তো হতে পারে। তোমার বন্ধু চিকের কাছ থেকে কিছু ধার নাও না। আর বললাম আজ, কবে কী না ওখানের সামনের মাসে বলছো!

বার্থা বেশ ভালো করেই জানে, আমি মাঝে মধ্যে চিকের কাছে টাকা ধার করি। তারপর বার্থাকে জানাই, চিককে টাকার কথা বলেছি। ও হতভাগা মাত্র পঞ্চাশ পাউণ্ড দিয়েছে।

—তাহলে হোটেল 'লরস্টারে' চলো। সেখানে কম টাকায় ভালোই খাওয়া যাবে।

—তুমি আবার ঐ মেয়েটার পিছনে টাকা ওড়াচ্ছো! আমি রিসিভার নামিয়ে রাখার সঙ্গে সঙ্গে চিক একটু চড়া গলায় কথাগুলো আমার দিকে ছুঁড়ে মারে।

—আজ হোটেল 'সিগ্যালে' যাচ্ছো? তার আগে তোমার মাথাটা একবার পরীক্ষা করিয়ে নেওয়া একান্ত প্রয়োজন।

—আমরা তো একদিন মরবো। তবে আজ 'সিগ্যালে' গিয়ে মরছি না। কিন্তু তুমি আজ রাতে কী করছো?

—ওয়ালি আজ আমার ডিনারে নেমন্তন্ন করেছে, বলে চিক বেরিয়ে যায়।

চিক চলে যেতে আমি টাইপরাইটারের কাছে গিয়ে বসি এবং রিপোর্ট টাইপ করে নির্দিষ্ট ট্রেতে রেখে দিয়ে ডেস্কের কাগজপত্তর গুছিয়ে রেখে লিফটের দিকে এগিয়ে লিফটের বোতাম টিপতে যাবো তখন আমার সঙ্গে ক্যাশিয়ার চার্লস এডওয়ার্ডের সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। লোকটি বেঁটে। গায়ের রং একটু ময়লার দিকে। মাঝ বয়েসী। এবং শক্ত সামর্থ পুরুষ।

চার্লসকে দেখে বললাম, আমায় পঞ্চাশ ডলার ধার দিতে পারেন? আর এটা আমার মাইনে থেকে কেটে নেবেন। দারুণ জরুরী।

—তুমি সব সময়ই মাইনের আগে আমার কাছ থেকে এরকম অ্যাডভান্স নাও, চার্লস লিফটের দিকে যেতে যেতে বলে। কর্নেল এটা শুনলে কিন্তু মোটেই খুশী হবে না।

—কর্নেলকে কে আর বলতে যাচ্ছে! আমার বান্ধবীর জন্য কিছু ফুল কিনে নিয়ে যেতাম এই আর কী!

তারপর লিফট্ যখন নিচে নামছে তখন চালর্স তার ব্যাগ খুলে পঞ্চাশ ডলারের একটা বিল আমার দিকে এগিয়ে দেয়, পরের মাসে এটা কিন্তু কাটা যাবে। তা যেন মনে থাকে।

—সে তো নিশ্চয়ই! বলেই বিলটা আমি প্রায় ছোঁ মেরে তুলে নিলাম।

তারপর ব্যাগের মধ্যে পঞ্চাশ ডলারের বিলটা চালান করতে করতে চালর্সকে বলি, আপনার প্রয়োজনে আমিও একম সাহায্য করতে প্রস্তুত থাকবো।

চালর্স এ কথায় কোন জবাব না দিয়ে আমার দিকে এক নজর কটমট করে তাকিয়ে চলে যায়।

এরপর আমি গাড়িতে গিয়ে বসি এবং বার্থার উদ্দেশ্যে গাড়ি ছুটিয়ে দিই। আর পকেটের অবস্থা একটু ভালো হওয়ায় রূপসী সন্ধ্যে যেন আমার আরো কাছে টানতে চাইছে।

হোটেলে গিয়ে টেবিলে বসে বেয়ারাকে ইশারা করে ডেকে ড্রাই-মার্টিনির অর্ডার দিলাম। তারপর খাবার দেবো।'

এবার বার্থাকে দেখতে কেমন সে কথা বলি।

বার্থার চুলের রঙ জলন্ত শিখার মতন। বড় বড় সবুজ চোখ। আর বাদামী চেহারায় এমন একটা আকর্ষণীয় চেহারা, যা ট্রাফিক পর্যন্ত বন্ধ করে দিতে পারে। আমার কাছে ওর শরীরটা দারুণ লোভনীয় এবং উত্তেজক।

বার্থারের দিকে তাকালে তাকে এক কথায় কাছে টানা মেয়ে বলে মনে হয় এবং তার চেহারার মধ্যে একটা মাদকতা আছে। আর সে বুদ্ধিমতী।

বার্থা কাউকে বোকা বানাবার জন্য প্রথমে তাদের মুখ দিয়ে বড় বড় কথা শুনতে চায়। শেষে তার কথা শুনে ওরা চুপসে যায়। তাতে সে এক ধরণের আনন্দ অনুভব করে। কিন্তু আমার দৃঢ় ধারণা, সে আমায় বোকা বানাতে পারবে না। সে চেনে পাউন্ড আর নিজের স্বার্থ।

আমি বার্থাকে পছন্দ করি। কারণ ও বেশ হাসি খুশী এবং মিষ্টি। অন্য কোন মেয়ের পিছনে টাকা খরচ করার চেয়ে ওর পিছনে টাকা খরচ করতে আমার বেশী ইচ্ছে করে। এর সঙ্গত কারণ ও যেমন দুষ্টু তেমনি সোনামণি।

এক সময় বার্থা আমার দিকে তাকিয়ে বলে, অমন করে কি ভাবছো?

আমার দারুণ খিদে পেয়েছে, বলে বার্থা মেনু কার্ডের দিকে দৃষ্টি বোলাতে থাকে। আর ওর হাবভাব দেখে মনে হচ্ছে, ও যেন রিফিউজি ক্যাম্পের কোন মেয়ে।'

বার্থা মেনু কার্ডের দিকে দৃষ্টি বোলাতে বলে, গলদা চিংড়ি? হ্যাঁ, তাতো খেতেই হবে।

তারপর বার্থা একটা বেয়ারাকে আসতে দেখে। তাকে ইশারা করে কাছে ডেকে বলে, একজন ক্ষুধার্ত মহিলার জন্য তুমি কি কি খাবার খেতে বলছো ?

বার্থা কথা শেষ হবার পরই আমি বলি, ওর কথা শুনো না। আমরা খাবো, তাতে আমাদের মতামতই যথেষ্ট। আমরা গলদা চিংড়ি আর মাংস খাবো।

বার্থা খুব খুশী হয়ে বললো, হ্যাঁ, তাই নিয়ে এসো।

বার্থা খাবারের অর্ডার দেবার সঙ্গে সঙ্গে আমি জানাই, আমার পকেটে কিন্তু পঞ্চাশ ডলার রয়েছে। বেশী হলে তোমার কাছ থেকে কিন্তু ধার করতে হবে।

—মেয়েদের কাছ থেকে ধার করতে তোমার শিষ্টতায় বাধবে না! আর তোমার পকেটে তো পার্সোনাল এজেন্সীর 'ক্রেডিট কার্ড' রয়েছে। দরকার পড়লে তা বার করবে।

—এজেন্সীর কাজ ছাড়া ত কার্ড বার করার নিয়ম নেই।

—তাতে কী হয়েছে! ওরকম তো কত নিয়মই থাকে।

—আমরা তো কাজই করছি।

ইতিমধ্যে টেবিলে গলদা চিংড়ি এসে গেছে। খেতে খেতে আমি বার্থার দিকে তাকাই, দারুণ না ?

—হ্যাঁ।

—আচ্ছা, তুমি ওয়ালডো কারমাইকেল বলে কাউকে চেনো ?

—ওয়ালডো কারমাইকেল ?

—তাহলে দেখা যাচ্ছে তুমি এজেন্সীরই কাজ করছো!

—হতে পারে। তুমি ওর নাম শুনেছো ?

—মনে করে বলো।

—উঁহু, বার্থা মাথা নাড়ে। আর তোমার কাছেই ওর নাম আমি প্রথম শুনছি।

—আচ্ছা, রস হ্যামেল ? তার নাম শুনেছো ?

—আমার সঙ্গে ইয়ার্কি মারছো!

—এতে ইয়ার্কি মারার কী আছে? তুমি ওর নাম শুনেছো কি না বলো!

—ওর নাম কে না শুনেছে। ওর বই আমার দারুণ ভালো লাগে। তারপর বার্থা বলে, তুমি কী ওর হয়ে কাজ করছো ?

—তাহলে একথা আমায় জিজ্ঞেস করছো কেন ?

—শুধু আমার পয়সায় খেয়ে যাও আর উত্তর দাও। বই লেখা ছাড়া ওর সম্বন্ধে অন্য কিছু জানো কী ?

—সামান্যই। সবে বিয়ে করেছে। থাকে প্যারাডাইস সিটিতে আর এখন বলো, কেন আমার কাছে ওসব জানতে চাইছো ?

—তুমি সুন্দর মুখ দিয়ে খাওয়াটা চালিয়ে যাও। তার স্ত্রীর সম্বন্ধে কিছু জানো ?

বার্থা আমার কথা শুনে যেন কি ভাবতে থাকে। তাতে ভাবি, লক্ষণ ঠিক-সুবিধের নয়।

তারপর বার্থা জিজ্ঞেস করে, ওর স্ত্রীর সম্বন্ধে জানি।

—হ্যামেলের চেয়ে বয়সে অনেক ছোট। তার ধরন অনেকটা আমার ধরনের। আর তুমি তার প্রথমা স্ত্রীর সম্বন্ধে কিছু জানতে চাইছো না ?

—হ্যাঁ। জানতে চাইছি বই কী!

—তার নাম গ্লোরিয়া কোর্ট, আর হ্যামেল তাকে বিদায় করে দেবার পর সে এখন কুমারী নামেই পরিচিত।

—মেয়েরা দুই বছরের পরে আর কুমারী থাকে না।

তারপর আমি বলি, তার বর্তমান জীবন নিয়ে আলোচনা করা যাক্। কি জানো বলো ?

—সে অ্যালফানসো ডিয়াজ নামে একজন মেক্সিকানের সঙ্গে থাকে।

—লোকটা একটা বারের মালিক। নাম অ্যালেমেডা।

অ্যালেমেডা বার আমি চিনি। এটায় যত বাজে লোকের আড্ডা। শনিবার রাতে অন্য কোন বারের চাইতে এখানে সবচেয়ে বেশী মারামারি হয়।

—গ্লোরিয়া কোর্ট থাকে, ওই বারে। ভাবতে পারো, যে একদিন হ্যামেলের স্ত্রী ছিল আজ তার কী পরিণতি হয়েছে! ঐ ডিয়াজের সঙ্গে শুতে যাওয়ার চেয়ে একটা ছাগলের সঙ্গে শুতে যাওয়া অনেক শ্রেয়। ও আর লোক পেলো না। একটা বোকা মেয়ে কোথাকার।

ইতিমধ্যে অর্ডারের স্পেশাল খাবারটা চলে এলো। খাবারটা সত্যি লোভনীয় এবং এর দাম কত পড়বে সে সম্বন্ধে আর ভাবতে চাইলাম না।

খাবার খাওয়া হয়ে যেতে কফিতে চুমুক দিয়ে আজকের রাতের কথা বার্থাকে বললাম। কারণ রাত গভীর হতে আর বেশী দেরী নেই।

বার্থা সঙ্গে সঙ্গে আমার হাতের মধ্যে ওর হাত গুঁজে দিয়ে বলে, আমি রাজি। আজ বেশ মুডে আছি।

এরপর বিল চুকিয়ে এবং বেয়ারার বকশিস মিটিয়ে দেখি, আমার কাছে আর মাত্র ত্রিশ পাউন্ড রয়েছে। তারপর গাড়ি করে যখন বার্থার অ্যাপার্টমেন্টের দিকে চলেছি তখন বার্থা বললো, বার্ট, আমি তোমার সম্বন্ধে চিন্তা করছিলাম।

—যদি আমার তোমার সঙ্গে থাকতে হয় তাহলে তোমার এজেন্সী ছাড়তে

হবে।

—আমিও অনেকদিন ধরে এই কথা ভাবছি, কিন্তু আমার গোয়েন্দাগিরি করা ছাড়া দ্যাতে অন্য কিছু নেই।

—অপরাধ জগতে তো অনেক দিন ঘোরা-ঘুরি করলে। এবার অন্য কিছু চিন্তা করো।

—হ্যাঁ, তারপর বার্থা একটু ভেবে বলে। আচ্ছা, স্মাগলিং করলে কেমন হয়।

—স্মাগলিং? আমি অবাক হই।

—কারণ আছে।

—আমি একটা লোককে চিনি যে কিউবা থেকে সিগার এনে বেশ বড়লোক হয়ে গেছে।

—তুমি বড়লোক হতে চাও?

—আচ্ছা, তুমি কী আমাকে জেলে পাঠাবার প্ল্যান করছো?

—না, না, বার্থা চমকে বলে। তোমার জায়গায় থাকলে আমি কী করতাম সে আমি জানি।

—যাক্‌। ও কথা বাদ দাও, আমি গাড়ি বার্থার অ্যাপার্টমেন্টের নিচে পার্ক করতে করতে বলি। আচ্ছা, তা তুমি কী করতে বলতো?

—আমি হলে আমার ধনী মক্কেলদের দিকে নজর দিতাম, বার্থা গাড়ি থেকে নামতে নামতে বলে। আর ঠিক ওদের কাছ থেকে টাকা বার করে আনতাম।

—আচ্ছা, আমি কী তোমায় একবারও বলেছি। আমি রাস হ্যামেলের হয়ে কাজ করছি!

—ও কথা বলার দরকার নেই। আমি অনেক আগেই বুঝতে পেরেছি। কারণ তোমার সঙ্গে তো কম দিন মিশছি না! আসলে বার্ট, তুমি তোমার মাথা ঠিকভাবে খাটাচ্ছো না। এই সব ধনী মক্কেলদের সংস্পর্শে আমার সৌভাগ্য খুবই কম ঘটে। আর তুমি কী না তা পেয়েও হেলায় হারাচ্ছো।

আমি এ কথার কোন জবাব দিই না। তবে লিফ্‌টের দিকে যেতে যেতে বার্থার কথা চিন্তা করি। এরপর আমরা যখন দু'জনে শুতে গেলাম তখনো আমি বার্থার কথা ভাবছি।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

প্যারাডাইস সিটির দক্ষিণ পূর্ব উপসাগরের ত্রিশ মাইলের মধ্যে কতগুলো ছোট ছোট দ্বীপ রয়েছে। হ্যালিকপ্টারে নিক হার্ডির পাশে বসে আমি সে দিকে তাকিয়ে আছি।

হ্যামেলের ইয়াটটা খুঁজে বার করতে নিকের তেমন কোন অসুবিধা হলো না। ইয়াটটা যখন বন্দর ছেড়ে বেরুচ্ছিল তখন হ্যালিকপ্টারটা আকাশে চক্কর দিচ্ছিল। আশেপাশে আরো অনেক হ্যালিকপ্টার রয়েছে। ধনী লোকেরা প্রমোদ ভ্রমণে বেরিয়েছে। ফলে ন্যান্সির সন্দেহ করার কিছু থাকবে না।

আমি নিকের ফিল্ড গ্লাস দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে দেখতে পাই, ন্যান্সি ইয়াটের উপর ঘুরে বেড়াচ্ছে।

জ্যোন্স সম্ভবত চালকের ঘরে রয়েছে। তাকে আমি দেখতে পাচ্ছি না।

আমরা দ্বীপের দিকে এগিয়ে চলেছি। তারপর আমি নিককে বলি, আর গিয়ে দরকার নেই। বন্দরের কাছে চক্কর দিতে থাকো।

ও দিকে ইয়াটটা ছোট ছোট দ্বীপগুলোর দিকে চলতে শুরু করে দিয়েছে। তারপর আমি নিককে জিজ্ঞেস করি, এই দ্বীপগুলোতে কেউ থাকে?

—না। আগে জলদস্যুর আড্ডা ছিল। এখন আর কেউ থাকে না।

তারপর ইয়াটটা দুটো দ্বীপের মাঝে এসে থামে। এখান থেকে আমি ভালো করে ইয়াটটাকে দেখতে পাচ্ছি না। এর কিছুক্ষণ পরে ইয়াটটা গাছ পালার আড়ালে অদৃশ্য হলো। আমি অধীর আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করতে থাকি যাতে আবার ইয়াটটার দেখা পাই, কিন্তু আমার বেশীক্ষণ ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে সাহস হলো না। পাশে ওরা যদি আমাদের সন্দেহ করে। তাহলে এতদূর আসাই মাটি এবং ওরা সংযত হয়ে পড়বে। আর তাহলে ফর্নেলকেও জানাবার মত কিছু থাকবে না। তাই ওদের ভাববার কিছু সুযোগ দেবার আগেই মানে মানে সরে পড়াই বুদ্ধিমানের কাজ হবে।

তবে হ্যালিকপ্টার নিয়ে এসে রোমাঞ্চ অনুভব করছি। এভাবে রণে ভঙ্গ দিয়ে পালাতে আবার ঠিক সায় পাচ্ছি না। কিন্তু আমার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় সঙ্গে সঙ্গে সজাগ হয়ে উঠলো। ও আমাকে এখান থেকে সরে যেতে বললো।

তাই আমি নিককে বলি, চলো নিক, এবার ফিরে যাই।

ফিরে আসতে আসতে নিক বললো, বার্ট, মেয়েটা কিন্তু ভালো।

—ভালো ? সঙ্গে সঙ্গে আমি কৌতূহলী হয়ে উঠি।

—তুমি কী করে জানলে ? ওর সঙ্গে তোমার আলাপ আছে ?

—অবশ্যই।

গতমাসে আমি তাকে আর মিঃ হ্যামেলকে নিয়ে ভেটানো বীচে ঘুরিয়ে এনেছি, আর মেয়েটা সত্যি বুদ্ধিমতী।

আমি এ কথার কোন উত্তর দেবার আগ্রহ প্রকাশ না করে প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে জিজ্ঞেস করি, তার কাজ কর্ম কেমন চলছে। তার এ কাজ ভালো লাগছে কি না ইত্যাদি।

তারপর হ্যালিকপ্টার থেকে নেমে আমার গাড়ির দিকে যেতে যেতে বললাম, এসব ব্যাপার কিছু গোপন রেখো।

—নিশ্চয়ই বার্ট।

এরপর আমরা উভয়ে করমর্দন করে বিচ্ছিন্ন হোলাম।

অফিসে ফিরে কেরীর কাছে যাই। জিজ্ঞেস করি, এখন কী কর্নেল কি আছে ?

—না। দারুণ ব্যস্ত।

তারপর ন্যানসির ঐ দ্বীপে যাবার কথা কেরীকে বলতে যাচ্ছিলাম, ঠিক তখনই আমার বার্থার কথা মনে পড়লো। সে বলেছে, এই সমস্ত ধনী লোকদের কাছ থেকে অনেক কিছু আদায় করতে পারো যদি একটু চিন্তা করো।

বার্থার কথাটায় আগে তেমন গুরুত্ব না দিলেও এখন যেন একবারে উড়িয়ে দিতে পারলাম না। আমার দ্বিতীয় মনটা ওর সঙ্গে দোস্তী করতে চাইলো। আর ভাবি, ও আমার পরম সুহৃদ। ওর কথা আমার রাখা উচিত।

তাই সঙ্গে সঙ্গে মিথ্যের আশ্রয় নিয়ে বলি, হ্যালিকপ্টার করে ন্যানসিকে অনুসরণ করলাম।

—তা কী দেখলে ? কেরীর কৌতূহল বাড়লো।

—সারা বিকেলটা মাছ ধরে কাটালো, আর আমার সময়টাই নষ্ট হলো। কাজের কাজ তো কিছুই হলো না তার উপর হ্যালিকপ্টারের ভাড়া ··

—সে তো মিঃ হ্যামেল দেবে।

—ঠিক আছে, কর্নেলকে জানিয়ে দেবোখন, বলে কেরী কাজে মন দেয়।

অফিস ঘরে ঢুকে দেখি, চিক নেই, ড্রয়ার থেকে স্কচের বোতল বার করে গ্লাসে ঢেলে একটা সিগারেট ধরালাম।

ন্যানসির কথা ভাবছি। কিছুক্ষণ, চিন্তা করার পর ঠিক করলাম, আমি একা ঐ নির্জন দ্বীপগুলোতে ঘুরে দেখবো। তারপরই একটা কথা ভেবে বেশ উত্তেজনা বোধ করি।

ওখানে গিয়ে হয়তো দেখবো, ন্যান্সি বেআব্রু হয়ে রৌদ্রস্নান করছে। সে দৃশ্য বর্ণনা করে মনে মনে একটা তৃপ্তি বোধ করি।

তারপর ভাবি, আবার এমনও হতে পারে, ন্যান্সি হয়তো মাছ ধরছে। কিন্তু মাছ যদি তার একান্ত ধরতেই হয়, তাহলে এত নির্জন দ্বীপে আসার দরকার কী? নিছকই একটা সখ? না এর পিছনে অন্য উদ্দেশ্য লুকিয়ে আছে?

এরপর ভাবি, বার্থা এবং নিক দুজনেই বলেছে, ন্যানসি খুব ভালো মেয়ে। এমন মেয়ে নাকি হয় না। আরো যেখানে মেয়েরা মেয়েদের প্রশংসা করে সেখানে ভালো না হয়ে কিছুতেই যায় না। তাহলে কী সত্যি ন্যান্সি ভালো? এটা তার একটা খেয়াল মাত্র, যা বড়লোকদের ক্ষেত্রে সাধারণত হয়ে থাকে।

তাহলে হ্যামেলও চিঠিগুলো পেলো কেন? ন্যান্সিকে জড়িয়ে অঘন্য সব চিঠি।

ভাবি, তবে কী হ্যামেল মিথ্যে কথা বলেছে? না, না, তা কী করে সম্ভব!

হ্যামেলের সমাজে যতটা প্রতিপত্তি মান সম্মান সব আছে। সে কেন এমন একটা নোংরা কাজ করতে যাবে! আরো বিশেষ করে তার স্ত্রীর ব্যাপারে। তার সম্বন্ধে কিছু বাজে বলা মানে সমাজের সে আলোচনার বস্তু হয়ে উঠবে। সেটা কোন স্বামীর পক্ষেই কাম্য নয়। এমন কী তার স্ত্রী ব্যাভিচারী না হলেও নয়।

এসব ভাববার পরই হঠাৎ একটা নাম আমার মনের মাঝে উঁকি দেয়। সে নামটা হলো ওয়ালডো কারমাইকেলের। একে জড়িয়েই নানারকম কদর্য চিঠি হ্যামেল পেয়েছে।

ভাবি, নির্জন দ্বীপে হয়তো গিয়ে দেখবো, ন্যান্সি ওয়ালডোর সঙ্গে এক বিছানাই শুয়ে ফষ্টি নষ্টি করছে। তাকে সোহাগে সোহাগে ভরিয়ে তুলছে। আর করলেও কী কিছু অন্যায় হবে?

হ্যামেল ন্যান্সির চেয়ে তেইশ বছরের বড়। তার উপরে সে একজন ব্যস্ত লেখক। ন্যান্সি তার কাছে কতটা সঙ্গ পায়? আর তেইশ বছরের বড় একটা লোকের সঙ্গে মনের মিল হওয়া খুবই একটা দুরূহ ব্যাপার।

গ্লাসের পানীয় ফুরিয়ে গেছে। আবার গ্লাসে স্কচ ঢেলে ফের চিন্তা করতে থাকি।

এরপর ফোন তুলে টনি ল্যামবার্টকে ডায়াল করি।

হ্যালো! আমি টনি ল্যামবার্টের সঙ্গে কথা বলতে চাই।

—হ্যালো! টনি কথা বলছি।

—চীন ? আমি বার্ট। আমি একটা বোট ভাড়া করতে চাই।

—কালকের জন্য। ধরো বেলা চারটে পর্যন্ত।

—থ্যাঙ্ক ইউ। তা কত ভাড়া পড়বে ?

—বিশ ডলার।

—ঠিক আছে, তৈরি থাকবে।

রিসিভার নামিয়ে রাখতে না রাখতেই চিক এসে হাজির। তারপর সে চেয়ারে বসতে বসতে আমার দিকে তাকিয়ে বলে, আজ কিছু হলো ?

—না, কিছুই হলো না আমি মিথ্যে বলি। মেয়েটা সারাদিন মাছ ধরেই কাটালো।

—আর এদিকে আমার যা গেছে, আর তোমায় কী বলবো ! চিক মুখে একরাশ বিরক্তি ফুটিয়ে বলে, প্রায় জুতো ছিঁড়ে যাবার যোগাড়। সত্যি, বেশ ধকল গেছে।

—ছোট এবং মাঝারি হোটেলগুলো দেখার পর আমি হাসপাতালগুলোতে পর্যন্ত গেছি, কিন্তু ওয়ালডো কারমাইকেল বলে কেউ নেই।

—আর কী করবে বলো ! চলো। আমি উঠে দাঁড়াই।

—কর্নেলের কাছে গিয়ে সব জানাই। দুজনেই বেরিয়ে গেলাম।

আমরা কর্নেলের চেম্বারে প্রবেশ করি। সে আমাদের পদশব্দে আমাদের দিকে তাকায়। আমি আগের মত মিথ্যের আশ্রয় নিয়ে জানাই, না স্যার, কিছুই পেলাম না।

তাতে কর্নেল একটু চিন্তা করে বললো, তোমরা মাত্র দু'দিন কাজ করছো।

আমরা এত তাড়াতাড়ি অপারেশন শেষ করাত পারি না। কর্নেল আমার দিকে তাকিয়ে বলে, বার্ট, তুমি বরং এ সপ্তাহটা ভালো করে দেখো।

এরপর আমার দিক থেকে কর্নেল দৃষ্টি ফিরিয়ে চিকের দিকে তাকিয়ে বললো, তোমায় আমি অন্য কাজের ভার দেবো।

তারপর আমি কর্নেলের কাছ থেকে বিদায় নিই, কিন্তু চিক ওখানে বসে থাকে। সে তার নতুন কেসের বৃত্তান্ত শোনার জন্য।

পার্নেল এই কেস থেকে চিককে সরিয়ে দিতে আমি দারুণ খুশী। কারণ এই কেসের ব্যাপারে আমি এখন সম্পূর্ণ স্বাধীন। আমি যা রিপোর্ট দেবো তাই হবে। কেউ আমার ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করবে না।

আমি ভাবি, কাল সকালেই দ্বীপে যাবো। আর অফিসের সবাই জানবে আমি ন্যান্সির পিছনে ঘুরেছি। সারাটা সকাল আমি দ্বীপে গিয়ে নানারকম অনুসন্ধান চালিয়ে যাবো। কারণ তখন ন্যান্সি কানট্রি ক্লাবে গিয়ে টেনিস খেলবে। লাঞ্চ সারবে। তারপর যখন এখানে আসবে সে তখন তার পিছনে লাগবে।

[illegible] মাইনে পেতে এখনো পনের দিন বাকী আছে। ওদিকে পকেটে ত্রিশ ডলারও নেই, তার উপর বোর্টের ভাড়া দিতে হবে বিশ ডলার। তারপর আর মাত্র কয়েক ডলার পকেটে পড়ে থাকবে। এরজন্য আমি দারুন দুশ্চিন্তার মধ্যে পড়ে যাই। ভাবি, এই দিনগুলো কাটাবো কী করে। তার উপর আবার বার্থা রয়েছে। ওকে নিয়ে আবার না বেরুলেও চলে না।

আবার কার কাছে হাত পাতবো ভাবছি। ধার না নিলে খাওয়া দাওয়াই বন্ধ করে দিতে হবে। আবার বার্থাকে ফেরানো যাবে না। সত্যি, হোটেলের খরচ বড্ড বেশী হয়ে যাচ্ছে। হোটেলে না গিয়েও তো পারা যায় না।

তারপর ভাবি দুঃখ করে বা কি হবে। ওতে তো আর সুরাহা হবে না। বরং মনোকষ্ট বাড়বে বইট কমবে না।

ভাবি, একটা পথ আমার খুঁজে বার করতেই হবে। এভাবে হাত পা গুটিয়ে চুপ করে বসে থাকলে মোটেই চলবে না। এবং কাদের কাছে ধার পাওয়া যেতে পারে সেই সব লোকেদের কথা চিন্তা করতে থাকি।

না, আর কোন আশা নেই। এই সব বন্ধুরা এখন আমায় রাস্তার এপাশে দেখলে অপর পাশ দিয়ে দ্রুত হেঁটে চলে যায়। তাহলে উপায় ?

তারপর হঠাৎই আমার একটা কথা মনে পড়লো। ভাবি, বার্থাকে বধ করলে কেমন হয় ? আর এই চিন্তাটা এখন আমায় বেশ আনন্দ দিতে থাকে।

এর আগে আমি কোনদিন বার্থার কাছে হাত পাতিনি। শুধু মুখেই ধারের কথা বলেছি। যেমন আগের দিন। পাতালে এইবারই প্রথম হবে। আর সব কাজেই তো একটা প্রথমবার আছে ! নইলে শুরু হবে কেমন করে।

আমি হাত ঘড়ির দিকে তাকাই। ঘড়িতে এখন পাঁচটা চল্লিশ বাজে। ভাবি, বার্থা সাধারণত ফ্যাসান হাউস থেকে ছ'টার সময় বের হবে সুতরাং একটু তাড়াতাড়ি করলে ওর সঙ্গে আমার ওখানেই দেখা হয়ে যেতে পারে।

আমি অফিস থেকে বেরিয়ে তাড়াতাড়ি ফ্যাসান হাউসে গাড়ি চালিয়ে দিলাম। তারপর উর্দ্ধশ্বাসে গাড়ি চালিয়ে এসে দেখি, ফ্যাসান হাউসের পার্কিং জোনে বার্থার 'হ্যারল্ডটা' রয়েছে।

বার্থার গাড়ি আছে দেখে অনেকটা নিশ্চিত। তাই শান্ত মনে একটা সিগারেট ধরিয়ে ওর জন্য অপেক্ষা করতে থাকি। কিছুক্ষণ পরে বার্থা বেরিয়ে এলো।

—বার্ট ! তুমি এখানে।

—চলে এলাম ! বলে আমি বার্থার হাতটা ধরে বললাম কেমন অবাক করে দিলাম বলো তো !

বার্থার আমার কথায় কোন জবাব দেয় না। কেমন যেন সন্দেহজনক

ভাবে আমার দিকে তাকিয়ে আমায় জরিপ করতে থাকে। অন্তত ওর মুখের ভাব দেখে তাই মনে হচ্ছে।

আমি বার্থার দিকে তাকিয়ে কিছুটা আন্দাজ করতে পারি। কারণ ওর স্বভাব আমার অজানা নয়। আর মেলামেশাও করছি অনেক দিন। ওর স্বাভাবিক মুখের হাসি মিলিয়ে গেছে। তার বদলে ফুটে উঠেছে কিছুটা উৎকণ্ঠা।

বার্থা জানতে চাইলো, তুমি কাজ ছেড়ে এখানে চলে এসেছো কেন?

বার্থাকে খুশী করার জন্য বলি, কেউ কী তোমায় বলেছে, গত সন্ধ্যের চেয়ে আজকে তোমায় আরো ভাল দেখাচ্ছে!

—কে আবার বলবে। বার্থার আগের মতন করেই উত্তর দেয়। তার রেখাগুলো কঠিন। ভাল করে তাকালে দেখা যাবে, কপালে কয়েকটা বাড়তি ভাঁজের রেখা। ওসব ভনিতা রাখ। তুমি এখানে কী করতে এসেছো!

—আমার মনে হলো। তোমার সঙ্গে একবার দেখা করা দরকার। আমার গাড়িতে এসো। তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে।

—তোমার গাড়িতে বসতে চাই না। ওসব কথা ছেড়ে আমায় কোথায় ড্রিঙ্ক খাওয়াবে বলো।

আমার সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে যায়, বার্থার আবার স্যাম্পেন ককটেল ছাড়া কোন ড্রিঙ্ক খায় না। তাই ওকে একরকম জোর করে আমার গাড়িতে তুলে বললাম দেখো, আমি ওখানে কাজে এসেছি। আর গত রাতে তুমি যা বলেছো, আমি সে সম্বন্ধে ভেবে দেখেছি।

—কী আবার বলে ছিলাম? ওসব আমি এখন ভাবতে চাই না।

—বলছো কী। অথচ কাল...।

—ঠিকই বলছি। এসব কথা বাদ দাও আমার এখন ড্রিঙ্কের প্রয়োজন। গলাটা শুকিয়ে যেন কাঠ হয়ে গেছে।

বার্থাকে পাশে বসিয়ে আমি ড্রাইভারের সীটে বসি, তুমি একটা দারুণ কথা বলছো। নাও, একটা সিগারেট ধরাও।

বার্থা অসন্তোষের সঙ্গে আমার হাত থেকে সিগারেটটা নেয়। ওরটা ধরিয়ে দিয়ে নিজেরটায় অগ্নি সংযোগ করি।

তারপর বার্থা একগাল ধোঁয়া ছেড়ে বলে, আমি যা বলেছিলাম তা আমার মনে নেই।

—তুমি বলেছিলে, আমি যেসব মক্কেলদের হয়ে কাজ করি তাদের কাছ থেকে আমি অনেক কিছু আদায় করে নিতে পারি।

—হ্যাঁ, এবার মনে পড়েছে। তা বলেছিলাম বই কী! তাতে হয়েছে কী! বলে বার্থা ঘাড় ঘুরিয়ে আমার দিকে তাকায়।

—আমি চিন্তা করে দেখছিলাম, একটা পথ পাওয়া যেতে পারে। তাতে

—তোমার কথা যদিও আমার বিশ্বাস হচ্ছে না। তবুও শুনতে চাই।

—বিশ্বাস হচ্ছে না? তবে তোমার শুনে কাজ নেই।

—বিশ্বাস না হলেও আমি শুনতে চাই।

—আমি যে ব্যাপারটা করতে চাই তাতে আমার কিন্তু টাকার প্রয়োজন। আর তুমি হবে আমার পার্টনার।

—পার্টনার—তুমি কী আমার কাছে ধার চাও?

—তা তুমি বলতে পারো। সঙ্গে সঙ্গে আমি একটু লজ্জা পেয়ে যাই। কিন্তু তা মুহূর্তের জন্য। তারপর নিজেকে স্বাভাবিক করে নিয়ে ফের বলি। আর নেব মাত্র দশ দিনের জন্য। এবং যা নেবো তার জন্য তুমি শতকরা কুড়ি ভাগ স্বদ পাবে। আর আমি যে টাকা পাবো তা থেকে তুমি অবশ্যই ভাগ পেয়ে যাবে।

—ভাগ, স্বদ, অনেক কিছুই তো গড় গড় করে বলে গেলে, বার্থা সিগারেটের ছাই ঝেড়ে বলে। এবার দয়া করে আমার একটা প্রশ্নের জবাব দেবে? তুমি কীভাবে রোজগার করবে?

—সেটা গোপনীয় ব্যাপার। বলে আমি রহস্যময় হাসি হাসলাম। তবে তোমায় আমি হলপ করে বলতে পারি, দশ দিনের মধ্যেই আমি তোমার স্বদসহ ফেরৎ দিয়ে দেবো। তুমি নিশ্চয় জানো, আমি তোমায় ঠকাবো না।

বার্থা আমার দিকে তাকিয়ে বলে, তুমি রাসহ্যামেলের কাছ থেকে টাকা বাগাবার চেষ্টা করছো?

—সে কথা কী আমি একবারও তোমায় বলেছি!

—বলার দরকার পড়ে না।

—কারণ, গত রাতে তুমি কার কথা আমায় জিজ্ঞেস করছিলে? তখন আমি তোমার কাছে জানতে চেয়েছিলাম, তুমি কী বাস হ্যামেলের হয়ে কাজ করছো? তুমি তখন এড়িয়ে গেলে। আর তখনই আমার সন্দেহ হলো।

—দেখো, তোমার কাছে কোন কথা তো গোপন করি না। আমি সত্যি তার হয়ে কাজ করছি। আর এ ব্যাপারটা যেন কেউ জানতে না পারে। হ্যামেলের ধারণা, তার স্ত্রী তার সঙ্গে প্রতারণা করছে। এবং সেই জন্য ন্যান্সির উপর নজর রাখছি। আর ভগবানের দোহাই, এ কথা গোপন রেখো। তাহলে আমি খুশী হবো।

—মানে ঐ পাতলা মেয়েটা। বার্থা ঘৃণাভরে বলে। মেয়েটা টেনিস আর মাছ ধরা ছাড়া কিছুই জানে না। আর সেই মেয়েটার জন্য...। না, হ্যামেলের মাথা খারাপ হয়েছে দেখতে পাচ্ছি। এই মাথা নিয়ে এত ভালো ভালো বই লেখে কী করে, তা আমি ভেবে পাই না।

বুদ্ধিমান।

আমি কেন্ন বলি, তার কোন ধনী লোকের সঙ্গে অবৈধ সম্পর্ক থাকতে পারে। তার উপর মেয়েটা একেবারে নিঃসঙ্গ। ওকে ভোলানো কোন বুদ্ধিমান লোকের পক্ষে মোটেই কষ্টকর ব্যাপার নয়। এ রকম ঘটনা অতীতে বহু দেখেছি ভবিষ্যতেও অনেক ঘটবে।

—তা হয়তো পারে, বার্থা একটু নড়েচড়ে বসে। তাতে তোমার কী?

—আরে আমি সেটার উপরেই তো কাজ করছি।

—পরে তোমার আমি সব বুঝিয়ে বলবো, আর সেইজন্যই তো এখন কিছু অর্থের প্রয়োজন।

আমি বুঝতে পারছি, বার্থা বেশ উৎসাহিত হয়ে পড়েছে। ভেবেছিলাম, ওর কাছে পঞ্চাশ ডলার চাইবো। এখন ওর আগ্রহ দেখে ভাবছি, এত কম চেয়ে নিজেকে ছোট করার কোন মানে হয় না।

তাই বললাম, তিনশো ডলারের কমে হবে না।

—তিনশো ডলার? বার্থা প্রায় চিৎকার করে ওঠে।

—তুমি যদি না দিতে পারো থাক। দশ দিনে তিনশো ডলার কুড়ি ভাগ সুদে ধার দিতে বহু লোক পাওয়া যাবে।

—মোটেই না। আমি ছাড়া তোমার কেউ পাঁচ ডলারও ধার দিবে না।

—তুমি না……।

—আমি ঠিকই বলছি। তারপর একটু ভেবে বার্থা আবার বলে, ঠিক আছে, দেড়শো ডলার দিচ্ছি। তবে একটা শর্ত আছে। তুমি যদি মোটা টাকা বাগাতে পারো, তাতে কিন্তু আমারও ভাগ থেকে যাবে।

- সে কথাতো আমিই তোমায় আগে বলেছি। এতে আবার শর্তের কী ছিল! বরং তুমিই আমার কথাটা পুনরাবৃত্তি করলে। তা যা দেবে বলেছিলে দাও!

—তর সইছে না যেন! এই নাও, বলে বার্থা দেড়শো ডলারের একটা বিল আমার দিকে এগিয়ে দেয়। এখন চলো, আমার ড্রিঙ্ক খাওয়াবে।

—রাজি, এখন আমার মেজাজটা বেশ শরীফ। তাই ওর দিকে তাকিয়ে বলি কোথায় যেতে চাও?

—'সিজাসে' চলো।

ভাবি, ওখানকার বারের একটা স্যাম্পেন ককটেলের দাম দশ ডলার। কিন্তু দু'এক সেকেন্ডের মধ্যে আমার দ্বিধাগ্রস্ত ভাবটা কেটে যায়। পকেটে দেড়শো ডলার রয়েছে। এখন তো আমি রীতিমত ধনী। গাড়ি 'সিজাসে'র দিকে ঘুরিয়ে দিলাম।

সকাল সাড়ে ছ'টার পর আমি নৌকা করে দ্বীপে হাজির হলাম। তবে ভোর সাড়ে চারটের উঠতে বেশ কষ্ট হয়েছে। আলার্ম ঘড়িটা খুব সাহায্য করেছে। তারপর এক কাপ কড়া কফি খেয়ে বেরিয়ে পড়েছি। আর ওখানে গিয়ে কী করবো। তার একটা পরিকল্পনা গত রাতে শুয়ে শুয়ে করে রেখেছিলাম।

সঙ্গে এনেছি ভিয়েতনাম জঙ্গল যুদ্ধের পোশাক-আশাক। সাথে একটা ছুরিও এনেছি। এসব আমার হোল্ডঅলের মধ্যে রয়েছে।

মাথায় একটা টুপী আছে। সেটার মাথায় পোকা মাকড় তাড়ানোর জন্য এক ধরণের রাসায়নিক দ্রব্য মাখিয়ে রেখেছি।

সঙ্গে একটা ফ্লাস্ক তাতে ঠান্ডাজল মেশানো স্কচ রয়েছে। ওখানে কী পাবো তার তো কিছু ঠিক নেই, আর তাই বোটে ওঠার আগে এক প্যাকেট স্যান্ড উইচও কিনে নিয়েছি।

ইতিমধ্যে বোট প্রায় দ্বীপের কাছে এলে দ্বীপে নামার আগে আমার যুদ্ধের পোশাকটা পরে নিলাম। এই পোশাক পরতে আমার সেই যুদ্ধের কথা মনে পড়লো। আর ভাবি, আমিও তো এখন যুদ্ধ করতে চলেছি—জীবন যুদ্ধ। এটা তার চেয়ে কোন অংশে কম নয়।

দ্বীপের চারদিকে ঘন বন জঙ্গল। এখানে বিষাক্ত পোকা মাকড় থাকার দারুণ সম্ভাবনা। তাই এ ধরণের পোশাক-আশাক পরা ছাড়া অন্য কোন উপায় নেই। পোকা মাকড়ের হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য মুখে ক্রিম মেখে নিলাম। বিষাক্ত পোকার কামড়ে মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে।

ন্যান্সির ইয়াটটা আগের দিন দু'দ্বীপের মাঝে যেখানে অদৃশ্য হয়েছিল সেখানে যাবার চেষ্টা করে যতটা সম্ভব ঠেলে ঠুলে ওদিকে এগোতে থাকি।

দ্বীপে পা দিতে যা ভয় পেয়েছিলাম তাই হলো। সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁকে ঝাঁকে মশা আমায় আক্রমণ করতে থাকে। কিন্তু ক্রিম মাখানো থাকায় সেগুলো আমার গায়ে লাগে না।

তারপর বিস্ময়। এই বন জঙ্গলের মাঝে যে এমন একটা কিছু আবিষ্কার করতে পারবো তা আমি ঠিক ভাবিনি। ফলে বিস্ময়ের সঙ্গে দারুণভাবে উত্তেজনা বোধ করছি।

হঠাৎ একটা পথ দেখতে পেলাম, হোল্ডঅলটা কাঁধে ফেলে আমি অত্যন্ত চুপি সারে সেই পথ ধরে সামনের দিকে এগিয়ে চলতে থাকি।

চোখের দৃষ্টি দারুণভাবে সজাগ করে রেখেছি। তার কারণ হলো সাপের জন্য। আর সেই জন্য হাতে ছুরিটাও নিয়েছি।

প্রায় সিকি মাইল এইভাবে যাবার পর পথের মাঝে থমকে দাঁড়াই। পথটা

বাঁক নিয়েছে। আমি সেদিকে তাকাতেই দেখি সেখানকার গাছপালা কাটা এবং জায়গাটাও কিছুটা পরিষ্কার। কিন্তু বনের মধ্যে এমন থাকার তো কথা নয়। আর এই পথই বা এলো কি করে। ফলে আমি দিশেহারা।

ভিয়েতনাম যুদ্ধের উত্তেজনা আমার শিরা উপশিরায় প্রবাহিত হতে থাকে। সঙ্গে সঙ্গে একটা চিন্তা আমার মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। ভাবি, এখানে নিশ্চয়ই কেউ থাকে। নইলে ভূতে এসে কখনো পথ ব্যবহার করে না। তার উপর জায়গটাও পরিষ্কার করা। নিশ্চয় এখানে লোক থাকে কিংবা প্রায়ই আসে।

আমায় যাতে কেউ দেখতে না পায় তাই আমি আর হেঁটে না গিয়ে এখন আমি বুকে ভর দিয়ে সাপের মত চলেছি। এবং আরো খানিকটা এগিয়ে একটা বড় গাছের আড়ালে নিজেকে আত্মগোপন করলাম। বুকে ভর দিয়ে এসে যেন ক্লান্ত বোধ করছি। কয়েক জায়গা ছিঁড়ে গেছে। জ্বালা করছে। এখন সেদিকে আমার আদৌ নজর নেই।

তারপর বড় গাছের আড়াল থেকে সামনের দিকে তাকাই। সঙ্গে সঙ্গে আমার চক্ষুস্থির। এ আমি কী দেখছি! স্বপ্ন নয়তো! নিজেই নিজেকে চিমটি কাটতে লাগলাম।

এখানের জায়গাটা আরো পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। তার সামনে একটা তাঁবু—ক্যানভাসের। তার রং সবুজ।

এই তাঁবুটা দেখে আমার আবার ভিয়েতনাম যুদ্ধের কথা মনে পড়ে। ওখানে আমরা এই ধরণের তাঁবু ব্যবহার করতাম। ভাবি, এ তাঁবু এখানে এলো কী করে।

তাঁবুটা বিরাট। বেশ কয়েকজন লোক থাকতে পারে কম করে চারজন।

আমি এবার বড় গাছটার আড়ালে নিজেকে আরো ভালো করে গোপন করি, যাতে কেউ না আমায় দেখতে পায়। সেইসঙ্গে পিছনের ফেলে আসা পথটার দিকেও একবার দৃষ্টি বুলিয়ে নিই। কারণ এ দিকটা কিছুটা উন্মুক্ত। ও দিক দিয়ে কেউ এলে সে আমায় দেখে ফেলবে।

এই চিন্তাটা আমায় ভাবিয়ে তুললো। নিশ্চিত না হতে পারলে ঠিক স্বস্তি বোধ করছি না। তাই সাবধানে একবার ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে তাকাতে গিয়ে একটা শব্দ হলো। ফলে আমি চমকে উঠি। তবে তারপর কিছুটা নিশ্চিন্ত বোধ করি। এ আওয়াজ পাতার। পায়ের কাছের শুকনো পাতার মড়মড় শব্দ।

না, এ পথ ধরে কেউ আসছে না দেখে বেশ স্বস্তি বোধ করলাম, আর অনেক দূরে দৃষ্টি চালিয়ে দেখলাম, ধারে কাছেও কেউ নেই। ফলে পিছন দিকটা সম্বন্ধে বেশ নিশ্চিন্ত হওয়া গেল।

এবার উদ্বেগজড়িত কৌতূহলী দৃষ্টি সামনের দিকে ফেরাই। অথচ আমি

দৌড়াইনি, তবু আমার বুকে উত্তেজনার যেন হাঁপরের মত উঠা নামা করছে। আর নিঃশ্বাসের শব্দ যেন ঘড়ির বেল পড়ার মত হতে থাকে, যা আমায় অতি মাত্রায় সজাগ রাখে।

আমি তাঁবুটার দিকে তাকাই। তাঁবুর ভেতরে ঢোকার মুখটা বাইরে থেকে বাঁধা। কোন লোকজন আমার সন্ধানী দৃষ্টির সামনে ফুটে উঠলো না। কিন্তু আর একটা দৃশ্য আমায় বেশ ভাবিয়ে তোলে।

তাঁবুর ঠিক সামনে, কিছুটা বাঁ দিক ঘেঁষে একটা ফোল্ডিং টেবিল এবং দুটো চেয়ার। এত কাছ থেকে ভুল হবার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে।

দুটো চেয়ার মানে এখানে দু'জন লোক থাকে। একজনে নিশ্চয়ই দুটো চেয়ার ব্যবহার করবে না। কিন্তু সেই দু'জন লোক কারা? আর কেনই বা এখানে তারা তাঁবু বেঁধে রয়েছে? এই তাঁবু আবিষ্কার হতে আমি দারুণভাবে চমকে উঠেছি। এটা নিশ্চয় প্রেমালাপ করার মত নিভৃত স্থান নয়। তাইতো ওয়ালডো কারমাইকেলকে সন্দেহের বাইরে রাখলাম। আর ওয়ালডো যদি ব্যাভিচারে লিপ্ত হয় তাহলে এই নির্জন স্থানে এসে নিশ্চয়ই গোপনে তাঁবু বেঁধে থাকবে না। তেমন কেস হলেও এক আধ দিনের জন্য হতে পারে। বরাবরের জন্য নিশ্চয়ই নয়। আর ঐ ঘাস উঠে যাওয়া পথটা কয়েক দিনের চলাফেরায় তৈরি হয়নি। ও পথ বহুদিন ব্যবহার হয়েছে।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, কে বা কারা ঐ পথ ব্যবহার করছে? কেন করছে? আর তারা রয়েছেই কী উদ্দেশ্যে? আর তাদের উদ্দেশ্য যে মহৎ নয় তা স্পষ্ট।

ভাবি, ওরা জলদস্যু হতে পারে? না, না, সঙ্গে সংগে মন থেকে এ চিন্তা ছেঁটে দিলাম। একটা অবাস্তব চিন্তা।

আবার ন্যান্সির চিন্তা মনের মাঝে উদয় হয়। ন্যান্সি তরুণী। তার জীবনের স্বাদ অপূর্ণ। সে নিঃসঙ্গ। সেই নিঃসঙ্গতা এবং লোকলজ্জার ভয় এড়াবার জন্য ওয়ালডোর সংগে এখানে গোপন অভিসারে এসে মিলিত হয়। তারপর আবার দু'টা বাজতে না বাজতেই এখান থেকে বেরিয়ে পড়ে। ফলে সে ধরা ছোঁয়ার বাইরে থাকে আর অ্যালবার্নি বলেছিল, ন্যান্সির ইয়াট কাঁটায় কাঁটায় ২'টার সময় এই বন্দরে এসে ভেড়ে। তখনই ইচ্ছে করলে আপনি আপনার ঘড়ি মিলিয়ে নিতে পারেন।

আমি তাঁবুর দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে ভাবি, এই তাঁবুতে একা কারুর পক্ষে থাকা সম্ভব নয়। আর এখানে নিশ্চয়ই কেউ থাকে। নইলে তাঁবু এখানে শক্ত ভাবে খুঁটিতে বাঁধা থাকতো না।

আর একবার চার পাশটা দেখে নিয়ে এই বড় গাছটার আড়াল থেকে বেরিয়ে একটা ঝোপের আড়ালে গিয়ে হামা দিয়ে এসে বসে থাকি। জঙ্গলে আর কোন শব্দ নেই, রোদের তাপ ক্রমশঃ বাড়ছে। অদূরে তাকালে যেন চোখ

বলসে যাচ্ছে। ফলে সংগে সংগে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিলাম।

বড় ক্লান্ত বোধ করছি, ফ্লাস্ক বার করে গলায় বেশ কিছুটা পানীয় ঢেলে দিলাম। আঃ, কী শান্তি! একটা তৃপ্তির পরিপূর্ণতা আমায় আনন্দ দেয়।

ভাবি, এখন একটা সিগারেট ধরাতে পারলে বেশ হতো। কিন্তু উপায় নেই। ওর উগ্র গন্ধে ধরা পড়ে যেতে পারি। সুতরাং শুধু অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই।

অনেকক্ষণ অপেক্ষা করার পর ঘড়ির কাঁটা যখন আটটা পঁয়তাল্লিশে হয়েছে তখন একটা শব্দে সজাগ হয়ে উঠলাম। ভাবলাম, ভুল শুনছি নাতো। কানটা খাড়া করে রাখি। না, শব্দটা একটা পাতা মাড়ানোর শব্দ সামনের দিক থেকে ভেসে আসছে। তারপর আর এক চমক। একটা স্পষ্ট শিসের শব্দ শুনতে পেলাম।

আমি বুঝতে পারছি, যে লোকটা এখানে আসছে সে বেশ নিশ্চিন্ত। নইলে এভাবে কখনো শিস দিতে দিতে আসতে পারতো না। আর তার চলাফেরার মধ্যেও কোন সাবধানতার চিহ্ন নেই। আমি শিসের শব্দ লক্ষ্য করে লোকটাকে আঁতিপাতি করে খুঁজতে থাকি। এ যেন অনেকটা পাতার ফাঁকে কোকিলকে খুঁজে বেড়াবার মতন।

লোকটাকে এখন আমি দেখতে পাই। একটা ঝোঁপের আড়াল থেকে লোকটা বেরিয়ে আসছে।

লোকটার মাঝারী উচ্চতা। চওড়া কাঁধ। পেশীবহুল স্বাস্থ্য।

দেখে মনে হলো, লোকটার বয়স পঁচিশ ছাব্বিশের বেশী হবে না। এক মাথা কালো চুল। চুলগুলো এলোমেলো এবং উসকো খুসকো। মুখে ঘন দাড়ি। সম্ভবত সাত-আট মাস দাড়ি কামায়নি।

পরণে সবুজ প্যান্ট। প্যান্টের রং কালো। নীল জামার হাত লম্বা। পায়ে মেক্সিকান বুট।

লোকটা মাছ ধরে এসেছে। তার বাঁ হাতে বঁড়শি এবং ডান হাতে সুতো দিয়ে ঝোলানো দুটো বড় মাছ। লোকটা তাঁবুতে প্রবেশ করে মাছ দুটোকে টেবিলের উপর রেখে, সে উনুন ধরাবার চেষ্টা করে।

আমি ভাবি, এই হিপিটা কী ওয়ালডো কারমাইকেল? কে জানে! আর হলেও হতে পারে, এবং ওর পেশীবহুল চেহারা দেখে ন্যান্সির আকৃষ্ট হওয়া আশ্চর্য কিছু নয়।

খানিকক্ষণ চেষ্টার পর লোকটা উনুন ধরিয়ে মাছ দুটো একটা শিকে গেঁথে উনুনের উপর ঝলসাতে লেগে গেল এবং তাঁবুর মুখটা খুলে সে ভেতরে প্রবেশ করল।

একটু পরে লোকটা ছুরি এবং কাটা চামচ নিয়ে বেরিয়ে এলো। তারপর সে খাওয়া শুরু করলো।

খাওয়া শেষ হতে যখন সে অবশিষ্টগুলো মাটিতে পুঁতেছিল তখন ভাবি, এবার আমার কিছু করা দরকার। নিঃশব্দে আমি পথ পর্যন্ত এগিয়ে গেলাম। তারপর ইচ্ছে করে শব্দ করে তাঁবুর দিকে এগিয়ে যেতে চাই।

যেতে যেতে আমি ওর মত শিস দিতে থাকি। মুখে একটা তাচ্ছিল্যের ভাব ফুটিয়ে তুলেছি। আর আমি যে ওর কাছে যাচ্ছি, তা এই শিসের মাধ্যমে ওকে জানতে চাইছি। যদিও তার মধ্যে কিছুটা বিপদ রয়েছে। ও কিছু একটা করে বসতে পারে, যেটা আমার পক্ষে ক্ষতিকর হয়ে উঠতে পারে।

পরিষ্কার জায়গার কাছে আসতে লক্ষ্য করলাম, সে ইতিমধ্যে দাঁড়িয়ে পড়েছে। তার হাতে ২২-এর একটা রাইফেল এবং শিসটা যেদিক দিয়ে আসছে, সে রাইফেলটা সেদিকে তাক করে রেখেছে।

ওকে দেখে আমি সঙ্গে সঙ্গে শিস বন্ধ করলাম। মুখে একটা সহজ ভাব ফুটিয়ে তুলে ওর দিকে বন্ধুত্বপূর্ণভাবে হাসলাম।

আমি বললাম, ক্ষমা করবেন। আমি আপনাকে চমকে দিতে চাইনি। ভেবেছিলাম, এ দ্বীপে কেউ নেই। আর এখানে আমি একাই এসেছি।

লোকটা আমার কথা শুনে রাইফেলটা নিচু করলো, কিন্তু বুঝতে পারছি, স্নায়ু টান টান করে আমার দিকে এক দৃষ্টিতে চেয়ে আছে।

লোকটা নিচু স্বরে আমার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলো, আপনি কে?

আমি ওর মুখের হাবভাব দেখে বুঝতে পারছি, আমার হঠাৎ আগমনে ও বেশ ভয় পেয়ে গেছে। তাই ও আমার সঙ্গে এ ধরণের ব্যবহার করছে। আমার নাম বার্ট এণ্ডারসন।

—বার্ট এণ্ডারসন?

—হ্যাঁ। এগোতে পারি? রাইফেলটা আমার মোটেই ভালো লাগছে না। আমি আবার আগের মত হেসে বলি, হয়তো গুলি বেরিয়ে আসতে পারে।

লোকটা সতর্কভাবে আমার দিকে তাকিয়ে একটু কর্কশ গলায় বললো, যেখানে দাঁড়িয়ে আছেন, সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকুন। এখানে কী করতে এসেছেন।

—দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলাটা ঠিক···। তারপর আমি চেয়ার দু-টোর দিকে তাকিয়ে বলি। আরো যেখানে দু'টো চেয়ার রয়েছে। তাই একটু বসে কথাবার্তা বললে······।

—আমার প্রশ্নের জবাব কিন্তু এখনো পাইনি। লোকটা কঠোরভাবে কথাগুলো আমার দিকে ছুঁড়ে দিল।

—হ্যাঁ, কী যেন আমার কাছে জানতে চাইছিলেন? আমি খুব সহজভাবে

কথা বলি। অর্থাৎ ওকে বুঝিয়ে দিতে চাইছিলাম, তোমার হাতে রাইফেল থাকলেও তোমাকে আমি মোটেই ভয় পাচ্ছি না, থোড়াই কেয়ার।

—এখানে কী করতে এসেছেন ?

—আপনি বলতে পারবেন ব্লাক বার্ড সম্বন্ধে ?

—কিসের ব্ল্যাক বার্ড ?

—আমি এখানে ব্ল্যাক বার্ডের গুহা খুঁজতে এসেছি।

—এ দ্বীপে কোন গুহা নেই। এবং খোঁজার প্রয়োজন নেই।

—আপনি ঠিক বলছেন তো ?

—নেপচুন বারের রবার্ট বলেছিল, ব্ল্যাক বার্ডের গুহা এই দ্বীপে অনেক রয়েছে।

আবার বলছি, খোঁজার কোন দরকার নেই। সে ভুল বলেছে।

—তা হয়তো হবে। এবার আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করবো ?

আপনি কী সাধু সন্ন্যাসী বা ঐ ধরণের কিছু ? বলে আমি একটু হেসে এগোবার চেষ্টা করি।

আমি পা বাড়াবার সঙ্গে সঙ্গে সে রাইফেলটা আমার দিকে তাক করে, যা একটু আগে নামিয়ে রেখেছিল, এখান থেকে আপনি চলে যান। দ্বিতীয়বার এ কথা আমি আপনাকে বলবো না। ও কথার মধ্যে দিয়ে আমায় ভয় দেখাতে চাইলো।

—আরে ওসব বলছেন কেন ! আপনি কী চান না চান···।

কথাটা শেষ করতে পারলাম না। মুহূর্তের মধ্যে ওর রাইফেল থেকে—একটা গুলি বেরিয়ে এসে আমার পায়ের কাছের শুকনো পাতাগুলো উড়িয়ে দিল।

ওর হাতে যে রাইফেলটা রয়েছে, তা থেকে একবারই গুলি ছোড়া যায়। দ্বিতীয়বার গুলি ছুড়তে হলে ফের গুলি ভরতে হয়। এটা আমার ভালভাবে জানা ছিল। তাই আর কাল বিলম্ব না করে আমি ওর উপর ঝাঁপিয়ে পড়লাম।

কিন্তু আমি ঝাঁপিয়ে পড়ার আগে ও সাপের ক্ষিপ্রতায় সরে গিয়ে আমার তল পেট লক্ষ্য করে লাথি চালায়। এদিকে আমার জঙ্গল যুদ্ধের অভিজ্ঞতা রয়েছে। সুতরাং আমি লাথিটা কাটিয়ে এনে থাই-এ লাগাই। তা সত্ত্বেও আমি টলে পড়ে যাই।

আমি টাল খেয়ে পড়ে যেতেও রাইফেলের বাঁট দিয়ে আমার মুখে আঘাত আঘাত করার চেষ্টা করে। তাতেও সফল হয় না। আমি ওকে সে সুযোগ দিইনা।

আমি সিনেমার নায়কের মত সফল হই। আমি মুহূর্তের মধ্যে মুষ্টা

সরিয়ে নিই।

তবু ওর হাত থেকে নিস্তার পাই না। ও দ্বিতীয়বার রাইফেলের বাঁট দিয়ে মারার আগে আমি এক ঝটকায় দেহটা সরিয়ে নিয়ে শরীরের সমস্ত দিয়ে ওর তলপেট লক্ষ্য করে সজোরে এক মোক্ষম ঘুঁষি চালাই।

পাঙ্চার করা টায়ারের মত মুখ দিয়ে শব্দ করে ও হাঁটু মুড়ে বসে পড়লো। যদি আবার উঠে দাঁড়ায়, তাই ওর মাথায় রাইফেল দিয়ে আঘাত করে ওকে সম্পূর্ণ অচেতন করে ফেলেছি।

তারপর আর ওখানে দাঁড়াই না। সঙ্গে সঙ্গে তাঁবুর ভেতরে প্রবেশ করি।

তাঁবুর চারিদিকে তাকাই। দুটো আলাদা বিছানা। একটা ক্যানভাসের হাত ধোবার বেসিন। আর একটা ফোল্ডিং টেবিল। টেবিলের এক ধারে মেয়েদের ব্যবহার করার জিনিস—চুলের ব্রাস, লম্বা চিরুনি, টুথ ব্রাস, সেন্ট স্প্রে আর ফেস পাউডার।

টেবিলের আর একধারে অন্য জিনিস—টুথ পেস্ট, মগ, সিগারেট আর সস্তা দামের একটা লাইটার।

ভাবি, একবার বাইরে আসা দরকার। লোকটা জেগে গেছে কি না একবার দেখা প্রয়োজন।

বাইরে এসে দেখি, লোকটা আস্তে আস্তে নড়াচড়া করছে এবং ক্রমশঃ চেতনা ফিরে আসছে।

আমি ওর কাছে এগিয়ে যাই। তারপর রাইফেলটা তুলে নিই এবং একটু তফাতে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে থাকি।

একটু পরে লোকটা হাঁটুর উপর ভর দিয়ে আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ায় এবং হাত দিয়ে মাথার ক্ষত জায়গায় হাত বোলাতে বোলাতে আমার দিকে তাকায়।

আমি ওর দিকে তাকিয়ে খুব সহজভাবে বলি, আসুন, বন্ধুত্ব করি।

আমি ওকে লক্ষ্য করি, ওর সিগ্রেটের মত ধূসর চোখে একটা বিপদের ইঙ্গিত। কারণ এখন ও মরিয়া হয়ে অনেক কিছু করে বসতে পারে।

ওর আবার সেই একই প্রশ্ন, আপনি এখানে কী করতে এসেছেন?

—বললাম তো, ব্ল্যাক বার্ডের গুহা খুঁজতে?

—ওসব ব্ল্যাক বার্ডের গুহার কথা বলবেন না! লোকটা আবার যেন আগের মত কথা বলে ওঠে।

—আপনি আমার কথা বিশ্বাস করছেন না!

—সত্যি করে বলুন, আপনি কী চান?

—ধরুন, আপনার মত একটু শান্তি আর নির্জনতা চাই।

—তা এখানে কেন?

—এখানে লুকিয়ে থাকার পক্ষে একটা তোফা জায়গা।

—আপনি কী পালিয়ে বেড়াচ্ছেন! কিসের জন্য ?

—আপাতত তাই।

—ঐ যে বললাম, একটু শান্তি আর নির্জনতার জন্য। এবং আপনি যদি আমার অবস্থায় পড়ে থাকেন তাহলে আপনাকে আমি সাহায্য করতে পারি।

তারপর লোকটা একটু ইতস্ততঃ করে বলে, আমি ছ'মাস আগে সেনাবাহিনী থেকে পালিয়ে এসেছি।

কিন্তু আমি বুঝতে পেরেছি, ও ডাহা মিথ্যে কথা বলছে। ওর মধ্যে সেনাবাহিনীর লোকের কোন লক্ষণ নেই। কারণ আমি তিন বছর মিলিটারিতে কাটিয়েছি। তাই সেনাবাহিনীর লোকদের আমি এক পলকেই চিনতে পারি।

আমি এটা ওকে বুঝতে দিই না। উল্টে বলি, আপনার জায়গাটা কিন্তু বেশ! আর তাঁবুটাও বেশ সুন্দর। তা আপনি কি এখানে বেশী দিন থাকবেন ?

—আপনার এখানে কিন্তু থাকা হবে না।

—অন্য দ্বীপে গিয়ে থাকতে হবে।

—হুকুম নাকি ? তারপর আমি একটু আগে তাঁবুতে যে মেয়েদের জিনিস-গুলো দেখেছিলাম, সেগুলোর কথা ভাবছি। লোকটার সাথে নিশ্চয় কোন মেয়ে আছে। নইলে ওগুলো ওখানে কিছুতেই থাকতো না। তাহলে ঐগুলো কী ন্যান্সি ব্যবহার করে থাকে ?

এর জবাবে ও যেন কিছু বলতে যাচ্ছিল। ও সে সুযোগ পেলো না। ওকে কথার মাঝে থামিয়ে দিয়ে বলে উঠি, আমি এখানে থাকলে আপনার ক্ষতি কী ?

—আছে বই কী!

—তার উত্তর আমি আপনার কাছে দেবো না।

—তা আমি চাইছি না। তবে আমি সঙ্গী পছন্দ করি বলেই এ কথা আপনাকে বলেছিলাম। কিন্তু আপনি যখন চান না তখন আমায় এখান থেকে চলে যেতেই হবে। কারণ আমারও তো' অপমানবোধ বলে একটা জিনিস আছে! এরপর আমি আস্তে আস্তে হেঁটে গিয়ে ঝোপের আড়াল থেকে হোল্ডঅলটা তুলে নিই।

—আপনি এখানে এলেন কী করে ? ও জানতে চায়।

—এ প্রশ্নটা নিজেকেই জিজ্ঞেস করুন, সব ঠিক উত্তর পেয়ে যাবেন।

—অর্থাৎ ?

—আপনি যেমন করে এসেছেন, আমিও ঠিক সেইভাবে···, বলে আমি চলতে শুরু করে দিই।

তিন চার মিনিট চলার পর বুঝতে পারি। লোকটা আমার অনুসরণ করছে।

ভাবি, লোকটার জঙ্গল যুদ্ধের অভিজ্ঞতা না থাকলেও অনুসরণ করার পদ্ধতি খুব একটা খারাপ নয়। আর আমি ওর দিকে পিছন ফিরে না তাকালেও বুঝতে পারছি। ও আমার কয়েক গজ পিছনে রয়েছে। আসলে আমি দ্বীপ ছেড়ে চলে যাই কি না তা না দেখে ও ঠিক নিশ্চিন্ত হতে পারছে না। তারপর আমি বোটে উঠে ইঞ্জিন স্টার্ট করে দিই।

তবে আমি এই দ্বীপ থেকে চলে গেলেও বন্দরের দিকে যাই না। আর একটা দ্বীপের দিকে এগিয়ে যাই। সেই দ্বীপের নাম 'কেটকর্মাক' এবং এক এক সময় এসে এখানে থাকি।

এই দ্বীপটা মোটামুটি বেশ বড়। এখানে লোক বাস করে।

বোটটা রেখে আমি একটা জেলেদের বারে গিয়ে হাজির হই। এখানকার নিগ্রো বারম্যানটা আমায় দেখে অবাক হয়ে যায়। হাঁ করে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। তারপর সে মুখে হাসি ফুটিয়ে বলে, মনে হয় যেন আবার সেনাবাহিনীর কাজে ফিরে এসেছি।

—আচ্ছা, আমি ওর কথা শুনে হাসি।

—আপনার পরনের ঐ জঙ্গল যুদ্ধের পোশাক আমার অনেক পুরনো স্মৃতির কথা মনে করিয়ে দেয়। আমি গিয়ে একটা টুলে বসি এবং ওর দিকে তাকিয়ে বলি, বীয়ার দাও।

ও একটা বোতল আর গ্লাস আমার দিকে এগিয়ে দেয়, এই যে স্যার!

আমার দারুণ তৃষ্ণা পেয়েছে। সেই সঙ্গে খিদেও। আমি এখন একটা উটও খেয়ে ফেলতে পারি।

আমি বীয়ার শেষ করে একটা সিগারেট ধরাই।

—স্যার, আপনার পরণে এখন এ পোশাক কেন?

—আমি ওদিকের একটা দ্বীপে ঘুরতে গেছলাম, বলে, আমি একটা দ্বীপের দিকে আঙুল নির্দেশ করি।

—ওসব জায়গায় পাখি ছাড়া কিছুই থাকে না। ঠিক পোশাকই পরেছেন।

এরপর আমি ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখি, এগারোটা বাজে। তারপর ঘড়ির দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে ওকে বলি, আমার একট ছিপ এবং টোপের দরকার।

—মাছ ধরতে চান বুঝি?

—আপনাকে আমি ঐ বোটটায় আসতে দেখেছি। ওটা নিশ্চয়ই টমির বোট?

—হ্যাঁ। তারপর আমি একটু ভালোভাবে লোকটার দিয়ে তাকিয়ে বলি। তুমি তাকে চেনো?

—হুঁ, আমার ছিপ আছে। আমি আপনাকে কিছু টোপ যোগাড় করে দিচ্ছি, বলে সে একটা নোংরা পর্দার আড়ালে অদৃশ্য হয়ে যায় এবং কিছুক্ষণ

পরে ও একটা ছিপ এবং কিছু টোপ নিয়ে ফিরে আসে।

আমি শেষ পঞ্চাশ ডলারের বিল ওর কাছে এগিয়ে দিয়ে বলি, মাছ ধরতে গিয়ে যদি মরে যাই, তাই এখানে রেখে গেলাম।

সে বিলটা না নিয়ে বলে, বস, আমি লোক চিনি। আপনার সিকিউরিটির কোন প্রয়োজন নেই।

বিলটা পেয়ে আমি খুশী এবং ওকে ধন্যবাদ জানিয়ে বোটে গিয়ে উঠি।

ধীরে ধীরে বোটটা একটা দ্বীপের দিকে এগিয়ে যেতে থাকে। এখন আমার পরনে আর জঙ্গল যুদ্ধের পোশাক নেই। সেগুলো খুলে হোল্ডঅলের মধ্যে ঢুকিয়ে রেখেছি। আমার পরনে এখন সাধারণ জামা-কাপড়।

খিদে পেয়েছে। তাই দ্বীপে ফিরে কয়েকটা স্যান্ডউইচ আর এক বোতল বীয়ার খাই।

তারপর আমি চিন্তা করতে থাকি, লোকটা এই দ্বীপে কী করছে? আর ও কিছুতেই সেনাবাহিনী থেকে পালিয়ে আসেনি। ওটা একটা ডাহা মিথ্যে কথা। তার সাথে কী কোন মেয়ে লোক আছে? না, শুধু ন্যান্সিই আসে?

আর ভাবি, ওর জীবনটা বেশ দামী। কিন্তু এর যা চেহারা এতে এর এত অর্থ থাকার কথা নয়। তবে কী ন্যান্সি ওকে সাহায্য করে?

ওদিকে সময় চলে যেতে থাকে। আমি ইতিমধ্যে মাছ ধরতে শুরু করে দিয়েছি। আগের দ্বীপের চেয়ে এটা একটু দূরে। তবে মাছ ধরার দিকে আমার আদৌ মন নেই।

এসব কথা চিন্তা করে শুধু ক্ষত বিক্ষত হচ্ছি এবং কিছু না পেয়ে শূন্য হাতে ফিরে আসি।

আমি আরো অনেক ঘটনা এবং তথ্য জানতে চাই। সমস্ত ব্যাপারটা আমায় বেশ ভাবিয়ে তুলেছে।

প্রায় তিনটে বাজে। আর তখনই চমক। সঙ্গে সঙ্গে আমি সামনের দিকে তাকাই।

না, কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। আঁতিপাতি করে চারদিকে খুঁজতে থাকি। কিন্তু শব্দটা একটু অস্পষ্ট হলেও ঠিক আমার কানে এসে পৌঁছচ্ছে।

আওয়াজটা এবার আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে আসে। এটা একটা মোটর বোটের আওয়াজ। আমি সঙ্গে সঙ্গে তৎপর হয়ে উঠি।

মাছ ধরা আমার মাথায় উঠলো। তাড়াতাড়ি ছিপটা ফেলে দিয়ে উঠে দাঁড়াই। তারপরেই আমার নজর গেল বোটটার দিকে।

ভাবি, ওটাকে লুকিয়ে ফেলা একান্ত প্রয়োজন। নইলে বোটটা নজরে পড়ে যাবে। সঙ্গে সঙ্গে অপর পক্ষ সাবধান হয়ে যাবে।

আমি তাড়াতাড়ি বোটটার ফিরে এসে স্টার্ট করে দিই, কিন্তু এতবড় একটা বোটকে কোথায় লুকোবো। বেশ চিন্তায় পড়ে যাই।

তারপর আমার দৃষ্টি গেল ডান দিকে। ওটার বেশ জঙ্গল রয়েছে এবং ঘন, তাই ওখানেই লুকোনো মনস্থ করলাম।

বোটটা ওখানে রেখে ফিরে আসতে দেখি, হ্যামেলের ইয়াটটা দ্রুতগতিতে এদিকে এগিয়ে আসছে। তারপর সেই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটলো। আগের মত এবারও সেই একই দৃশ্যপট। অর্থাৎ দুটো দ্বীপের মাঝখানে সেই জায়গায় এসে ইয়াটটা গাছপালার আড়ালে হারিয়ে গেল।

আমার জায়গা থেকে আমি চলে যেতে ঠিক ভরসা পাচ্ছি না। মনের মাঝে একটা কিছু এসে বাসা বেঁধেছে। এমনও হতে পারে, ন্যান্সি হয়তো জোন্সকে ইয়াটের উপর পাহারায় রেখেছে।

ওদিকে ঘন্টা খানেক পার হয়ে গেছে। তারপর আবার ইয়াটের মোটরের আওয়াজ শুনতে পেলাম। এর কিছুক্ষণ পরে ইয়াটটা বন্দরের দিকে চলে গেল।

ইয়াটটা চলে যেতে একটা কথা ভাবলাম। ভাবি, আবার গিয়ে হিপিটার সঙ্গে কিছু কথা বলতে হবে। কিন্তু গিয়ে কী বলবো? একটা অজুহাত খাড়া করতে হবে। এবার ব্লাক বার্ডের গুহা বলা চলবে না। তাহলে?

সঙ্গে সঙ্গে আমার বোটটার কথা মনে পড়ে গেল। গিয়ে বলবো, পেট্রোল ফুরিয়ে গেছে। কথাটা মোটেই অবাস্তব হবে না।

বলবো, আমায় কিছু পেট্রল ধার দাও। আর তা আছে কী নেই, তা আমার জানার দরকার নেই। তবে এখন বাজি ধরে বলতে পারি, তাঁবুর সমস্ত জিনিস-পত্তর ন্যান্সি ঐ হিপিটাকে সরবরাহ করে।

বোটটা জোরে চালানো যাবে না। তাহলে হিপিটা টের পেয়ে যাবে। আর ও কা জানে না যে আমি বন্দরে ফিরে যাইনি? ঠিক জানে। তাই দূর থেকে আমায় দেখা মাত্র অনেক কিছুই করে বসতে পারে। যেমন গুলি চালানো ওর পক্ষে আশ্চর্য কিছু নয়। তাব অতিমাত্রায় সাবধান হওয়া দরকার।

বোটের গতি মন্থর করে আস্তে আস্তে দু' দ্বীপের মাঝে সেই মাঝের জায়গায় এসে হাজির হই। তারপর বোটটা বেঁধে রেখে ধীরে ধীরে সেই তাঁবুর দিকে এগিয়ে যেতে থাকি।

ভাবি, এবার আর লুকিয়ে যাবার কোন প্রয়োজন নেই। তবু কিছুটা সাবধানতা অবলম্বন করি। তারপর তাঁবুর সামনে খোলা জায়গাটায় এসে থমকে দাঁড়াই।

আমি বিস্ময়ে হতবাক। এমনটি দেখবো তা আমি কল্পনাই করতে পারিনি। তাই বোকার মত ফ্যাল ফ্যাল করে তাকাতে থাকি।

কোথায় তাঁবু? সেই সঙ্গে অন্য জিনিস-পত্তরও উধাও। এ থেকে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, হিপি, ন্যান্সি জোন্সের সহায়তায় পালিয়ে গেছে। আর ওদের দেখা পাওয়া মাত্র হিপি নিশ্চয়ই আমার কথা বলেছে। তারপর এই কাণ্ড।

এবং এই ব্যাপারে আরো একটা জিনিস আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে গেল, হিপিটা একটা বিশ্রী ব্যাপারে জড়িয়ে পড়েছে। কারণ সে যে এই দ্বীপে রয়েছে তা আমি অন্য কাউকে বললে সে বিপদে জড়িয়ে পড়তে পারে। তাই পত্রপাঠ সরে পড়েছে।

তবু আমি একেবারে নিরাশ হই না! পাখি এভাবে হুট করে উড়ে গেলে আমার তো কিছু করণীয় নেই। আর আমি তো কাজে গাফিলতি দিইনি। তাই বিবেকের কষাঘাতেও জর্জরিত হবো না।

আমি একেবারে হাল ছেড়ে আস্তে আস্তে তাঁবুর জায়গাটার কাছে এগিয়ে যাই। এবং সেখানে গিয়ে ইতস্তত: ভাবে ঘুরতে থাকি। এখানে এভাবে ঘোরার একটাই কারণ, তাহলে ওরা তাড়াহুড়ো করে যেতে গিয়ে যদি কিছু ফেলে গিয়ে থাকে।

না, কিছুই পাচ্ছি না। এবার একটু নিরাশই হই। ভাবি, এখানে থেকে আর কী করবো। ফিরে যাই। ওরা কিছু ফেলে যায়নি। ওরা এভাবে তাড়াতাড়ি করে পালিয়ে গেলেও এটা ওদের অভ্যেস। এইভাবেই ওরা পালিয়ে বেড়ায়। তাই সব দিক দিয়ে তারা তৎপর।

তারপর মত পাল্টাই। ভাবি, আবার এসেই যখন পড়েছি তখন আর একটু ভালোভাবে খুঁজে দেখলে ক্ষতি কী!

কয়েক মিনিট খোঁজাখুঁজির পর আমি সফল হলাম। সকালে টেবিলের উপর রাখা লাইটারটা আমার চোখে পড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে আমার চোখ দুটো সজাগ হয়ে ওঠে।

আমি হাঁটু মুড়ে বসে লাইটারটার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আমার অভিজ্ঞতা বললো, ওটার উপর আঙুলের ছাপ থাকতে পারে! তাই খালি হাতে ওটা ধরা মোটেই বুদ্ধিমানের কাজ হবে না।

পকেট থেকে রুমাল বের করে অতি সাবধানে ওটাকে মাটি থেকে তুলে রুমাল দিয়ে ভালো করে জড়িয়ে পকেটে চালান করে দিলাম।

ভাবি, আরো কিছু পেলে পেতে পারি, লাইটারই আমার আশার বাণী শোনালো। তাই আমি আবার খোঁজার নেশায় মেতে উঠি। ভাগ্য সহায় হলে অনেক কিছুই হতে পারে। নইলে তো লাইটারটা পাবার কোন কথাই ছিল না।

কিন্তু মানুষ ভাবে এক আর হয় আর এক। আমার খোঁজাখুঁজি বৃথা হলো। আর কিছুই পেলাম না। ফলে আমি বোটের দিকে ফিরে গেলাম।

আমি ঘড়ির দিকে তাকাই। চারটে বাজে। রোদের এখনো বেশ তেজ রয়েছে।

তারপরেই মনে পড়লো ছিপটা বারম্যানকে ফেরত দিতে হবে। তাই ছ'টার আগে কিছুতেই বন্দরে ফিরতে পারবো না। আর তখন অফিস ফাঁকা হয়ে গেলেও ল্যাবরেটরির ইন-চার্জ হ্যারি মিডোসের দেখা পেলেও পেতে পারি, ও সাধারণত একটু দেরি করে অফিস থেকে যায়।

আমি যখন অফিসে পেঁছিলাম তখন কেরী বাড়ি যাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। ওকে দেখে বললাম, কর্নেল আছে?

—না। পাঁচ মিনিট আগে বেরিয়ে গেছে।

—তাকে কিছু বলতে হবে?

—কী আর বলবে। আমি মুখ বেজার করে জানাই। সারাদিন মেয়েটার পিছনে ঘোরাঘুরিই সার হলো।

—কিছু কাজ হয়নি বলো না। কেরী চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়। এখন তোমার এটাই একমাত্র কাজ। আমি চলি।

তারপর আমি করিডর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে ল্যাবরেটরিতে গিয়ে হাজির হই। আমার ধারণাই ঠিক হলো। ওখানে আলো জ্বলছে। অর্থাৎ হ্যারি অফিসে রয়েছে।

আমি বেশ খুশ মেজাজে ল্যাবরেটরিতে প্রবেশ করি, গিয়ে দেখতে পাই, হ্যারি মাইক্রোস্কোপ দিয়ে কি যেন পরীক্ষা করছে।

হ্যারির বয়স প্রায় সত্তরের কাছে। লম্বা ধরণের চেহারা। তবে খুব পাতলা। এক সময় সে প্যারাডাইস সিটি পুলিশ ল্যাবরেটরির চার্জে ছিল। সেখান থেকে অবসর নেবার পর কার্নেল তাকে ডেকে এনে এখানের ছোট ল্যাবরেটরিতে বসিয়েছে।

ভেতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করতে করতে বলি, আপনি এখনো কাজ করে চলেছেন?

—এরকম তো রোজই থাকি, বলে, হ্যারি আমার দিকে তাকায়। বলো, তোমার জন্য কী করতে পারি!

—একটা লাইটার নিয়ে এসেছি।

—এর ফিঙ্গার প্রিন্ট চাই।

—লাইটারটা কার?

—তা আমি জানি না।

—তাহলে তুলতে চাইছো কেন?

—হয়তো কাজে লাগতে পারে।

—ঠিক আছে। লাইটারটা দেখি।

—এই নিন, আমি পকেট থেকে রুমালে জড়ানো লাইটারটা বার করে হ্যারির দিকে এগিয়ে দিই।

—কাল সকালে তুমি এটার রিপোর্ট পেয়ে যাবে।

—ওয়াশিংটনে পাঠাবে নাকি?

—সেই রকমই ইচ্ছে। ও হো, আর একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞেস করবো।

—সেই চিঠিগুলোর খবর কী?

—ঐ চিঠির কাগজ আর টাইপ পরীক্ষা করা হয়েছে।

—কাগজগুলো এখানকার নয়।

—এখানের যত রকম কাগজ বাজারে চালু আছে তার সমস্ত স্যাম্পেল আমার কাছে আছে। তার কোনটার সঙ্গেই এ কাগজের মিল খুঁজে পাচ্ছি না।

—ফলে কাগজের ঠিক হদিশ পাচ্ছি না।

—আর টাইপ?

—হ্যাঁ, তা বার করতে পেরেছি।

—টাইপগুলো হলো আ. বি. এম. ৮২ সি গলব বল মেসিনের। এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত।

—আচ্ছা, টাইপের ঝামেলা নয় মিটলো। কাগজটা কোথাকার হতে পারে বলে আপনার ধারণা?

—আমার মনে হয় কাগজটা ইতালির।

—ইতালির কাগজ এখানে?

—কিন্তু আমার তো তাই মনে হচ্ছে।

—হয়তো আপনার অভিজ্ঞ ধারণাই ঠিক।

ভাবি, হ্যারির কথার মধ্যে যথেষ্ট গুরুত্ব থাকে। ওর ধারণা কখনো ভুল বলে প্রমাণিত হয়নি। তাই ওর কথাটা উড়িয়ে দিতে পারি না।

হ্যারিকে জিজ্ঞেস করি, ঐ চিঠিগুলোর রিপোর্ট কি আপনার কাছে আছে না পাঠিয়ে দিয়েছেন।

—আমি রিপোর্ট কেরীর কাছে পাঠিয়ে দিয়েছি।

ধন্যবাদ! চলি। কাল সকালে আবার আসবো।

অফিসে ফিরে এসে দেখি, চিক নেই। চেয়ার খালি। আর এত রাতে থাকার কথাও না।

আমি চেয়ারে বসে ভাবতে থাকি। ন্যান্সি নিশ্চয়ই হিপিটাকে সঙ্গে নিয়ে গেছে। কিন্তু কোথায় গিয়ে উঠতে পারে? তবে তাকে নিয়ে বন্দরে নামার সাহস হবে না। ওখানে দারুণ লোকের ভিড়।

আর নামলে অনেকে কৌতূহলী হয়ে উঠবে। এবং গুজব ছড়াতে শুরু করে দেবে।

ভাবি, আমি ন্যান্সির জায়গায় হলে কী করতাম? ছিপটাকে নিশ্চয়ই বন্দরে নামাতাম না। নামানো মানে যেচে বিপদ ডেকে আনা।

তাহলে কী করতাম? অন্য জায়গায়? না। তবে?

ওকে ইয়াটের মধ্যেই লুকিয়ে রাখতাম। যুক্তি বেশ আমায় আনন্দ দিল। তারপর রাত গভীর হয়ে গেলে ওকে নামিয়ে এনে কোথাও তুলতাম। তখন বন্দর বলতে গেলে ফাঁকাই থাকবে। সুতরাং ঝুঁকি অনেক কম। এটাই সব চেয়ে ভালো বুদ্ধি।

তারপর আমি ঠিক করি, আজ আর বার্থা নয়। আজকের রাতটা বন্দরে চোখ রেখে কাটাবো। তবে হাতে এখন প্রচুর সময়। কি করি এখন?

ড্রয়ার থেকে ৩৮ পুলিশ স্পেশ্যালই বার করে গুলি ভরে নিয়ে কোমরে গুঁজে অফিস ছেড়ে গাড়ির দিকে এগিয়ে যাই। অন্ধকার আরো গাঢ় হলে বারগুলো ঝলমল করতে থাকবে। আর তখন আমি বন্দরে একা ভূতের মত বসে থাকবো।

ভাবি, এই কী আমার জীবন? এই কী আমার ভবিতব্য?

আমার বার্থার কথা মনে পড়ে। ও বলেছিল, অনেকদিন তো গোয়েন্দাগিরি করলে, এবার এসব ছাড়ো। এসো আমরা দু'জনে সুখে ঘর সংসার করি।

আমার মুখ দিয়ে একটা চাপা নিঃশ্বাস বেরিয়ে আসে। ভাবি, বার্থা কী এখন ফ্রি আছে? না, আজ বার্থা থাক্। ফোনে আমার গলা পেলে বড় হোটেলে খেতে চাইবে। কিন্তু পকেটের অবস্থা খুবই শোচনীয়।

তাই আগের ভাবনা মতই কাজ করলাম। গাড়ি চালিয়ে সোজা বন্দরে চলে এলাম। তারপর গাড়িটা পার্কের জোনে রেখে উদ্দেশ্যহীন ভাবে হাঁটতে হাঁটতে অ্যালবার্নি'র কাছে এসে দাঁড়াই।

এখন অ্যালবার্নি'র সঙ্গে কেন জানি কথা বলতে ইচ্ছে করলো না। ওকে এড়িয়ে অন্যত্র চলে গেলাম। আর ও-ও বোধহয় আমায় দেখতে পায়নি।

হঠাৎ আমার মনে হলো অ্যালমেডা বারে গেলে মন্দ হয় না, আর যেখানে হ্যামেলের প্রথমা স্ত্রী গ্লোরিয়া কোর্টের সঙ্গে দেখা হয়ে যেতে পারে। এবং তার বন্ধু জেড ডিয়াজের হাব ভাব লক্ষ্য করতে করতে ডিনারটা সারা যাবে। মন্দ কী!

আমি এখন ইয়াট রাখার জায়গাটার কাছ থেকে পার হচ্ছি। লক্ষ্য করলাম হ্যামেলের ইয়াটটা বাঁধা আছে। আর ইয়াটের ডেকে জোন্স একটা ক্যানভাসের চেয়ারে বসে আছে। তার হাতে একটা লম্বা ছুরি, এবং সে ইয়াটে ঢোকার মুখে পাহারা দিচ্ছে।

আমার যা বোঝার তা বোঝা হয়ে গেছে। জোন্সের পাহারা দেবার ভঙ্গি

থেকে স্পষ্ট ব্ঝতে পারছি, ছিপিটা নিচের ডেকে ল্কিয়ে আছে। যাক রাত ছাড়া ছিপিটা এখানে নামতে সাহস করবে না।

ইয়াটের দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে আমি অ্যালমেডা বারের দিকে চললাম। আজ ব্ধবার। বারের সামনেটা নির্জন।

যেতে যেতে আমার একটা বইয়ের দোকানের দিকে নজর গেল। দোকানে রাস হ্যামেলের কতগ্লো বই টাঙানো রয়েছে। সবগ্লোর কভারে মেয়েদের উত্তেজক ছবি।

ওর মধ্যে থেকে একটা বই তুলে নিলাম। বইটার নাম নির্জন প্রেম।

প্রচ্ছদে মেয়েটার দারুণ চেহারা। আমার বার্থার মত ট্রাফিক থামানো চেহারা।

হাটতে হাটতে এক সময় অ্যালমেডা বারে হাজির হই। বারে একটা নিগ্রো ছেলে জাজ বাজাচ্ছে। আর তিনটে মেক্সিকান ওয়াটার বিভিন্ন টেবিলে পানীয় পরিবেশন করছে।

আমি একটা টেবিলে গিয়ে বসি। তারপর হ্যামেলের বইটার দিকে মন দিই। ইতিমধ্যে একজন ওয়েটারকে আমার কাছে আসতে বলি, আজকের স্পেশ্যাল খাবার কী আছে?

ওয়েটার বললো, স্যার, 'আরোজকর্ণপোলো', খেতে দারুণ লাগবে।

— তার মানে? ওটা কী ধরণের খাবার। আর ওতে আছেই বা কী?

—ম্রগী, ভালো চাল, লঙ্কা আর মাখন দিয়ে তৈরী।

— ঠিক আছে, আর ওর সঙ্গে স্কচও নিয়ে এসো।

ওয়েটার অর্ডার নিয়ে চলে যেতে আমি চেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে বসে আবার হ্যামেলের বইটা পড়তে শ্রু করি। এবার একটা সিগারেট ধরিয়ে বইটার ব্যাক কভারের দিকে তাকাই। সেখানে লেখা রয়েছে—এই দারুণ উপন্যাসটি লিখেছেন আমেরিকার আলোড়ন সৃষ্টিকারী লেখক রাস হ্যামেল। এটি সিনেমা হচ্ছে। এর মধ্যে পঞ্চাশ লক্ষ কপি বিক্রী হয়ে গেছে। এটা ফিকশনের উপর দারুণ একটা উত্তেজক বই।

কিছ্ক্ষণ পরে আমার টেবিলে খাবার এবং স্কচ পেঁীছে গেল। বেশ খিদে পেয়েছে। তাই সময় নষ্ট না করে হাত লাগালাম।

খেতে খেতে লক্ষ্য করলাম, তিন জন টুরিস্ট আমার সামনের বা দিকের চেয়ারগ্লো দখল করলো। ইতিমধ্যে একজন মহিলা ঘ্রতে ঘ্রতে আমার কাছে এসে দাঁড়ালো।

আমি মহিলাটির দিকে তাকাই। তার চ্ল বেশ ঘন, বাদামী, শরীরের গঠন বেশ স্ন্দর। গায়ের সঙ্গে আঁটো-সাঁটো পোশাক।

ও আমার দিকে তাকিয়ে হেসে বললো, খাবার কেমন লাগছে?

আমার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় সঙ্গে সঙ্গে আমায় জানিয়ে দিল, এ গ্লোরিয়া কোর্ট না হয়ে কিছুতেই যায় না। কারণ আমার বার্খা বলেছে, সে অ্যালমেডা বারে থাকে।

ওর কথার জবাবে আমি হেসে বলি, আপনি আসায় খাবারটা আরো ভালো লাগছে।

দেখতে পাচ্ছি একাই এসেছেন? সে এখনো হেসে কথা বলে।

—আসুন, দু'জনে মিলে একটু ড্রিঙ্ক করা যাক্, বলে সে ওয়েটারের দিকে তাকাতে একজন ওয়েটার প্রায় ছুটে এসে স্কচ দিয়ে গেল।

—তারপর সে আমার সামনের চেয়ারটা অধিকার করে বসলো, আপনি এখানে নতুন এসেছেন, তাই না? কারণ যারা এখানে একবার আসে তাদের মুখ আমি কখনো ভুলি না। আমার মনে থেকে যায়।

—আপনার স্মৃতি শক্তি তো দারুণ! তারপর ওর দিকে তাকিয়ে মিষ্টি করে হেসে বলি। আমি এর আগে আপনাকে কখনো দেখিনি। দেখলে কখনো ভুলতাম না।

—বেশ কথা বলেছেন! বলে সে খিল খিল করে হেসে ওঠে। তারপর সে হাসি থামিয়ে বলে, আপনার কাছে দেখছি আমার আগের মানুষের একটা বই।

—কী বললেন? আমি বিস্ময়ের ভাব মুখে ফুটিয়ে তুলি।

—এটা আমার আগের স্বামীর বই।

—স্বামীর?

—তাহলে ডিভোর্স হয়ে গেছে কত দিন হলো?

—এই তো গত বছর।

—একজন বিরাট লেখকের সঙ্গে ঘর করে আপনার কেমন লেগেছে তা দয়া করে আমায় একবার জানাবেন?

—অন্য লেখকদের কথা বলতে পারবো না। তবে হ্যামেল এক যন্ত্রণাদায়ক চরিত্র। আর··। ওর বইগুলো আমি আদৌ পছন্দ করি না।

—পছন্দ করেন না? কেন? বলেই মুখে ভদ্রতার মুখোশ এঁটে বলি, প্রথম আলাপে আপনাকে হয়তো এ ধরণের কিছু জিজ্ঞেস করা উচিত নয়।

—না। না। আপনি তাতে বিন্দুমাত্র সংকোচ বোধ করবেন না।

—বলুন, আপনি কি যেন বলছিলেন?

—ঐ বইগুলো আপনার ভালো লাগে না কেন?

—ঐগুলো যৌন কাহিনীতে ভরা, তারপর সে আমার দিকে তাকিয়ে বলে ওর কোন বই আপনি পড়ে দেখেছেন?

—না, এখনো সেই সৌভাগ্য হয়নি। এই সবে কিনে এনেছি।

—আর পড়ে দেখলে বুঝবেন, যে লোকটা বাস্তবে এইসব লেখে সে রাতে কী না করতে পারে ! কিন্তু বাস্তবে সে একেবারে কোন কাজেরই নয়।

—মানে ? বুঝে নিয়েছি। তারপর বলি, ভদ্রলোক শুনেছি আবার বিয়ে করেছেন, তাই না ?

—হ্যাঁ। কিন্তু মেয়ে যারা ওসব ব্যাপারে একেবারে গুরুত্ব দেয় না। কিন্তু আমি সে রকম মেয়ে নই।

তারপর ওয়েটার আমার টেবিলে কফি দিয়ে যেতে সে টেবিল ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়, চলি। আবার পরে দেখা হবে। ও আমার কাছ থেকে চলে গিয়ে ঐ তিনজন টুরিস্টদের সঙ্গে কিছু কথা বলে পর্দার অড়ালে অদৃশ্য হয়ে যায়।

তারপর আমি একটা সিগারেট ধরিয়ে কফিতে চুমুক দিই। ভাবি, বেশ কিছু তথ্য সংগ্রহ হলো। তাহলে হ্যামেল পুরুষত্বহীন।

এরপর আমার ন্যান্সির কথা মনে পড়লো। সত্যি, তাহলে সে নিঃসঙ্গ এবং অবহেলিত। তাই হিপিটার খপ্পরে গিয়ে পড়েছে।

আমার হাতে এখন বেশ খানিকটা সময় রয়েছে। অথচ এখন করার বলতে গেলে কিছুই নেই। তাই হ্যামেলের বইটার দিকে মন দিই।

বইটা শুরু হয়েছে একটা ব্যাভিচারের দৃশ্য নিয়ে। ভাবি, লোকটা লেখে ভালো। দৃশ্যটা সুন্দরভাবে আকর্ষণীয় এবং উপভোগ্য করে তুলেছে। এটা লেখকের কম কৃতিত্ব নয়।

দুটো পরিচ্ছেদ শেষ হতে ওয়েটার বিল নিয়ে হাজির হয়। তারপর দাম মিটিয়ে দিয়ে উঠে পড়লাম।

ভাবি, হ্যামেলের বইয়ের নায়িকাকে পেলে একটু ঘোরা যেত। কিন্তু বইয়ের পাতার নায়িকাকে আর ভালো লাগছে না। তাই বইটাকে কাগজ রাখার ঝুড়িতে ফেলে দিয়ে চলতে শুরু করে দিই।

আবার ইয়াটগুলোর অদূরে এসে দাঁড়াই। দেখি, এখনো জোন্স আগের মতন পাহারায় রয়েছে। এবং অ্যালবার্নিও তার নিজের জায়গায় রয়েছে। ফলে আগের চিত্র আর পাল্টায়নি।

এবার আমি বন্দরের এমন একটা জায়গা খুঁজেছি যেখান থেকে আমি হ্যামেলের ইয়াটটা প্রতিনিয়ত নজর রাখতে পারি। অথচ কেউ যেন আমায় দেখতেও না পায়।

এখন রাত দশটা বাজে। চারদিক জ্যোৎস্নায় ছেয়ে রয়েছে। আকাশে একটা বড় চাঁদ। সমুদ্র তার আভায় চিকচিক করছে। আর বন্দরের পথটায় একটা ছায়া পড়েছে।

কাছেই একটা কাফে বার। সেটা এখন বন্ধ হচ্ছে। নজর গেল, তার পাশের একটা কাঠের বেঞ্চ। আর তার চারপাশটা ঝোপঝাড়ে ভর্তি।

আমি ঐ বোঁপটার গিয়ে বসি এবং নিশ্চিন্ত যে, এখান থেকে জোন্স আমায় দেখতে পাবে না। কিন্তু আমি ঝোঁপের আড়াল থেকে স্পষ্ট তাকে দেখতে পাচ্ছি।

আমি অপেক্ষা করতে থাকি। এক সময় এগারোটা বেজে গেল। তখন দেখা গেল অ্যালবার্নি তার বীয়ারের খালি বোতলটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে কোথায় যেন মিলিয়ে গেল।

এখন বন্দর প্রায় নির্জন বললেই চলে। । দু'একটা লোক চলাফেরা করছে। আর এখন আমার সজাগ দৃষ্টি।

হঠাৎ হ্যামেলের ইয়াটের দিকে তাকিয়ে দেখি, জোন্স ওর জায়গায় নেই। সঙ্গে সঙ্গে আমি সচকিত হয়ে উঠে দাঁড়াই। তার কয়েক মিনিট পরে ইয়াটের উপর তিনটে অস্পষ্ট ছায়ামূর্তি দেখতে পেলাম। এরপর তারা ইয়াট ছেড়ে বন্দরে নামলো।

বন্দরে একটা প্রহরী রয়েছে। তার ওদের দিকে দৃষ্টি নেই। সে হাত পিছনে রেখে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

ওরা বন্দরের পথ ধরে চলেছে এবং আমি একটু ব্যবধান বজায় রেখে চুপিসারে ওদের পিছন পিছন চলেছি।

এবার আমি ওদের দিকে ভালো করে তাকাই। ওদের মধ্যে মধ্যের লোকটা জোন্স। তাকে আমার চিনতে ভুল হয়নি। কারণ সে আমার পরিচিত মুখ।

দ্বিতীয় লোকটার লম্বা চুল দেখে বুঝতে পারলাম, ও আমার সেই হিপি, যার সঙ্গে আজ সকালে মুলাকাত হয়েছে।

আর তৃতীয় একজন মহিলা। তাকে আমি চিনতে পারছি না। তার মাথা স্কার্ফ দিয়ে জড়ানো।

সামান্য একটু এগিয়ে ওরা একটা গলির মধ্যে ঢুকে পড়লো। সঙ্গে সঙ্গে আমিও ওদের পিছনে ছায়ার মত অনুসরণ করে চলেছি।

হঠাৎ আমার মনে পড়লো, জোন্স বন্দরের কাছে থাকে। এরপর ওরা একটা বাড়ির মধ্যে হারিয়ে গেল। ফলে আমার পক্ষে আর এগোনো সম্ভব হলো না। আমি পথের মাঝে দাঁড়িয়ে পড়ি।

সেই বাড়ির চার তলার একটা ঘরে আলো জেলে উঠলো। তারপর আমি দেখলাম, জোন্স জানলার কাছে এসে চারধারটা একবার ভালো করে দেখে নিল। এরপর সে আবার মিলিয়ে যায়।

তারপর ঘণ্টাখানেক অপেক্ষা করেও আর কাউকে দেখতে পেলাম না। ঘরের আলোটা নিভে গেল। তবু আমি অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে থাকি। অথচ কিছুই ঘটলো না। এক সময় ভোর হয়ে আসে। তারপর আমি পাখির সুমিষ্ট কলরব শুনতে শুনতে গাড়ির দিকে এগিয়ে যাই।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

পনেরো বছর আগে পেটে লেউনসকি, বন্দরের সবচেয়ে দক্ষ পুলিশ ছিল। তার চাকরির প্রথম দিক থেকে সে এই বন্দরের টহলদারের কাজে নিযুক্ত। ওষুধ খেয়ে নেশাখোর, স্মাগলার, ছোট ছোট অপরাধীরা পর্যন্ত স্বীকার করেছে। পেটের কাছ থেকে তারা ভালো ব্যবহার পেয়েছে।

একদিন পেটে তার স্ত্রী মেরীর জন্য একটা বাসন ধোয়া মেসিন কিনে নিয়ে এলো। বন্দরের সবাই জানতো, পেটে তার স্ত্রীকে দারুণ ভালোবাসে এবং সেও পেটেকে খুব ভালোবাসতো।

তার স্ত্রী ছিল একজন সুইডিস মহিলা। বেশ হাসি খুশী। তাকে গোমরা মুখে কখনো দেখা যেত না।

স্ত্রীর বেয়াল্লিশতম জন্মদিনে পেটে স্ত্রীকে এই বাসন ধোয়া মেসিনটা কিনে দিয়েছিল। কারণ হাতে করে বাসন ধোয়া তার কাছে একটা বিরক্তজনক ব্যাপার ছিল। তাই এ মেসিনটা পেয়ে এত খুশী হয়েছিল যে, বন্দরের সকলকে সে এই মেসিনটার কথা বলেছিল।

বন্দরের ফল বিক্রেতা, বন্দরের চোরা চালানকারীরা এবং ওষুধের নেশা করা লোকেরা পর্যন্ত খুশী হয়েছিল, আর এই মেসিন কেনার তিন মাস পরে মেরীকে মেসিনের পাশে মৃত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখা গেছে। প্রথমটা বোঝা যায়নি যে, সে মারা গেছে। পরে জানা গেছে, ইলেকট্রিক শক খেয়েই তার মৃত্যু হয়েছে।

এই আঘাতের পরই পেটে একেবারে মুষড়ে পড়ে এবং সে এত বিমর্ষ ও হতাশায় ভেঙে পড়লো যে শেষে বন্ধুদের পরামর্শে সে অল্প অল্প মদ খেতে শুরু করলো।

অথচ পেটে সাধারণত হাল্কা পানীয় পছন্দ করতো, আর ডিউটিতে থাকা অবস্থায় সে কখনো পান করতো না। তারপর সে আবিষ্কার করে, কড়া মদ তার দুঃখ কিছু সময়ের জন্য ভুলিয়ে রাখে।

তারপর মদ খাবার পরিমাণ উত্তরোত্তর বেড়েই চললো। ওদিকে পুলিশের বড় কর্তা টেলের, সে তার স্ত্রীকে খুব ভালবাসতো, সে ওর দুঃখ বুঝতে পেরেছিল। সে পেটের সঙ্গে কথা বলে দেখলো, তবু ওর মদ খাওয়া কিছুতেই কমাতে পারলো না।

ইতিমধ্যে একদিন দুটো মারাত্মক ধরণের ছেলে বন্দরের এক বারে গিয়ে টাকা-পয়সা ছিনতাই করছিল। তখন নেশাগ্রস্থ অবস্থায় পেটে সেখানে হাজির হয়ে তাদের গুলি করে মেরে ফেললো।

তারপর নেশা কেটে যেতে পেটে বুঝতে পারলো কী করেছে। তখন সে কাঁদতে শুরু করে দেয়। কিছুতেই তার কান্না থামতে চায় না।

ওদিকে টেলেরের কিছু করার উপায় ছিল না। সে তখন একরকম জোর করে পেটেকে অবসর গ্রহণ করতে বাধ্য করে।

শহরের প্রশাসন পেটেকে কোনরকম পেনসন মঞ্জুর করলো না। ফলে সামান্য সঞ্চয় ফুরিয়ে যেতে সে দিশেহারা হয়ে পড়লো এবং শেষ পর্যন্ত স্মাগলারদের দলে গিয়ে নাম লেখালো।

অ্যালবার্নি'র মাধ্যমে পেটের সঙ্গে আমার পরিচয় হলো এবং তার সম্বন্ধে এ কথাগুলো জানতে পারি। এরপর যখনই আমার সঙ্গে পেটের দেখা হতো তখনই তাকে এক প্যাকেট সিগারেট দিতাম। আর ওকে দেখলে আমার দুঃখ হতো। একটা বাসন ধোয়া মেশিনের জন্য ওর জীবনটা ছারখার হয়ে গেল।

তারপর জোন্সের পখান থেকে বেরিয়ে পেটের উদ্দেশ্যে রওনা দিই। এরপর বন্দরের কাছে এসে জেলেদের জাল পেটেকে সেলাই করতে দেখলাম।

—এই যে পেট্রে, আমি ওকে ডাকি।

পেটে মুখ তুলে আমার দিকে হেসে তাকায়, সকালেই যে আপনার দেখা পেলাম।

—আমি একটা কাজে এসেছি। জালটা রেখে তুমি কী আমার সঙ্গে এক কাপ কফি খাবে?

—নিশ্চয়ই! পেটে জালটা রেখে উঠে দাঁড়ায়, চলুন যাওয়া যাক্।

আমরা হাঁটতে হাঁটতে 'নেপচুন' বারের কাছে এসে দাঁড়াই। আমি আসতে আসতে লক্ষ্য করলাম, পেটে তার বাঁ পাটা একটু টেনে টেনে হাঁটছে। ওকে দেখে মনে হচ্ছে, এক রোগগ্রস্থ হাতি।

পেটেকে নিয়ে একটা টেবিলে বসতে বারম্যান সাম আমার দিকে তাকিয়ে হেসে বললো, গুড মরনিং স্যার! স্যার, কি দেবো?

—দুটো কফি, এক বোতল স্কচ, আর এক গ্লাস জল।

—এক্ষুণি আসছি, বলে সাম চলে যায়।

সাম চলে যেতে আমি পেটের দিকে তাকিয়ে একটু চাপা গলায় বলি, পেটে তোমার জন্য একটা কাজ এনেছি।

—কাজ? কিসের কাজ?

—স্যার, কাজের জন্য কত পাবো?

—বিশ ডলার।

—বলুন স্যার, আমার কী করতে হবে, আর কুড়ি ডলার পাবো তো ?

—নিশ্চয়ই।

—ইতিমধ্যে সাম কফি, স্কচ ইত্যাদি দিয়ে গেছে।

কথা শেষ করে পেটে এমনভাবে স্কচের বোতলের দিকে তাকাচ্ছে যেমন বাচ্চারা আইসক্রিমের দিকে তাকায়।

আমি পেটের লোলুপ দৃষ্টিতে তাকানো দেখে বললাম, তুমি ইচ্ছে করলে ড্রিঙ্ক করতে পারো।

—ধন্যবাদ স্যার! বলে, পেটে কাঁপা হাতে গ্লাসে স্কচ ঢালতে শুরু করে দেয়।

আমি এবার অন্যদিকে তাকাই। পেটের দিকে তাকাতে আর ভালো লাগছে না। ভাবি, লোকটার জীবন কীভাবে নষ্ট হয়ে গেল।

কিছুক্ষণ পরে আমি পেটেকে বলি, তুমি জোস জোন্স বলে কাউকে চেনো ?

—হ্যাঁ, আর এই বন্দরে এমন কেউ নেই যাকে এই শর্মা চেনে না, পেটের মুখটা আত্মগর্বে ভরে ওঠে।

—আমি চাই তুমি এখন থেকে জোন্সের উপর নজর রাখো। সে যা করে তা আমি জানতে চাই।

—জানাবো।

—আর তার ঘরে দু'জন লোক আছে।

—দু'জন ? না, কেউ তো থাকে না।

—কাল রাতে তারা এসেছে। তাদের মধ্যে একজন পুরুষ, অন্যজন মহিলা। তারা ঘর থেকে কখন যায়, আর গেলেও কোথায় কি করে, এসব তুমি আমায় জানাতে পারবে ?

—পারবো, বলে পেটে স্কচের বোতল শেষ করে দুটো কাপে কফি ঢালে। আর আমার কাছে এটা কোন একটা সমস্যাই নয়। আমার হাতে কয়েকটা ছেলে আছে।

—তারা বিশ্বাসী তো ?

—নিশ্চয়ই, নইলে এমন ছেলে রাখি না। তারা ওদের পিছনে আঠার মত লেগে থাকবে।

—আর একটা কথা। তারা যেন বুঝতে না পারে যে, তাদের উপর নজর রাখা হচ্ছে। বুঝতে পারলে কিন্তু সব মাটি।

—পারবে না স্যার, আর তাহলেই বিশ ডলার পাবো তো ?

—হ্যাঁ। তারপর আমি পেটের দিকে একটা কুড়ি ডলারের বিল এগিয়ে দিয়ে বলি, ভালোভাবে কাজ করতে পারলে আরো পাবে।

—আমার স্যার ফ্রেন্টার দুটি থাকবে না। বলে পেটে একগাল হেসে আমার হাত থেকে বিলটা নেয়।

—এই কার্ডটা রাখো, এটা আমার বিজনেস কার্ড'। ওরা কোথায় গেল তা সঙ্গে সঙ্গে আমায় ফোন করে জানাবে।

—নিশ্চয়ই স্যার, পেটের চোখে এখন পুলিশের দৃষ্টি। সে কর্তব্যকে কর্তব্য বলেই জানে। এ ব্যাপারে আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন। এবং আশা করি, আপনাকে নিরাশ করবো না। বলে সে চলে যায়।

এক সময়ে অফিসে ফিরে আসি। দেখি, চিক স্কচ পান করছে। আর আমি বার্থার টাকা দিয়ে এক বোতল 'স্টাটি সার্ফ' কিনে এনেছি।

বোতলের মোড়কটা যখন খুলছি তখন সন্দেহের চোখে আমার দিকে তাকিয়ে বললো, কার কান কামড়ে এটা জোগাড় করলে!

— আমিই কিনেছি। হ্যাঁ আমি, আর তোমার কী ধারণা, তুমি ছাড়া পৃথিবীতে আমার দ্বিতীয় কোন বন্ধু নেই।

আমার কথা বলার ধরণ দেখে চিক হেসে ফেলে। বলে, সারাদিন তুমি কী করলে?

—কিছুই না। শুধু সময় আর টাকা নষ্ট।

আরো এভাবে কিছুক্ষণ কথাবার্তার পর কেরীর কাছে গিয়ে হাজির হই এবং জানতে পারি, কর্নেল এখন ব্যস্ত। ফলে আমার টাইপ করা রিপোর্ট ওর হাতে দিয়ে বেরিয়ে এলাম।

আমার অফিস ঘরে ফিরে এসে দেখি, চিক বাড়ি যাবার জন্য তৈরী হচ্ছে। তারপর চিক চলে যেতে ভাবি, বার্থাকে একটা ফোন করলে বেশ হয়। ফোন করার আগেই টেলিফোনটা বেজে ওঠে। আমি রিসিভারটা তুলে নিয়ে বলি, বার্ট এন্ডারসন।

—বার্ট, আমি লু কথা বলছি। তোমার সঙ্গে দেখা করা ভীষণ জরুরী।

হ্যাঁ। তুমি আমার এখানে আসবে, না তোমার ওখানে যাবো। আমি একটু সতর্ক হই। কারণ লু কোল্ডওয়েল এখানকার এফ, বি, আই, র, কিন্তু এজেন্ট যদিও প্যারাডাইস সিটিতে ওর অফিস। কিন্তু এখানে তার কিছুই করার নেই। বেশীর ভাগ সময় সে কাটায় মিয়ামিতে।

আমি বলি, আজ আমার একটা ডেট আছে। কাল হলে কেমন হয়?

—কাল হবে না। ব্যাপারটা ভীষণ জরুরী। ফোনে ঠিক বলা… !

—তবু একটু আভাস দাও।

—তা হলে শোন। তুমি যে লাইটারের প্রিন্টগুলো পাঠিয়েছ তা নিয়ে

হৈ চৈ পড়ে গেছে। আমি দশ মিনিটের মধ্যে তোমার ওখানে যাচ্ছি।

—আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করছি।

রিসিভার নামিয়ে চিন্তা করি, এ ব্যাপারটা নিয়ে খুব সাবধানে কথাবার্তা বলতে হবে, আর হিপির পরিচয় বুঝতে না পারলেও ও বেশ গুরুত্বপূর্ণ লোক। নইলে ওয়াশিংটনে এত কাজ ঘটতো না।

লু আমার জন্য তার ছোট অফিস ঘরটায় বসে আছে। তারপর প্রাথমিক কথাবার্তার পর লু বললো, এই লাইটারটা তুমি কোথায় পেয়েছো, আর কেনই বা পরীক্ষা করতে পাঠালে।

এখানে পা দেবার আগে লুর কথার কি জবাব দেওয়া যায় তা ভেবে রেখেছিলাম। তাই ও একথা জিজ্ঞেস করার সঙ্গে সঙ্গে বলি, ব্যাপারটা কী বলতো?

—বলছি। বার্ট, তার আগে আমার কথার উত্তর দাও। বলো, লাইটারটা কোথায় পেয়েছো?

—কয়েকদিন আগে বন্দরে কুড়িয়ে পেয়েছি।

—বন্দরে? তুমি বন্দরে গিয়েছিলে কেন?

আমি লু'র এ প্রশ্নের জবাব না দিয়ে বলি, তুমি যেন অপরাধীর মত জেরা করছো!

—আগে বলো, তুমি ওখানে গিয়েছিলে কেন?

—কাজ শেষ করে আমি বন্দরে বেড়াতে গিয়েছিলাম।

—সেটা তুমি কর্নেলকে জিজ্ঞেস করলে ভালো করতে না!

আমি কঠোর স্বরে বলি, যাতে লু আমার বেশী না ঘাটায়।

এবার লু গলার স্বর একটু নিচে নামিয়ে বলে, বার্ট, জিনিসটা খুব জরুরী। তুমি ক'টার সময় ওখানে গেছিলে?

—তা ধরো, দশটা হবে। প্রথমে অ্যাবার্নি'র সঙ্গে খানিকটা গ্যাজালাম। একটা বীয়ারও খেলাম। তারপর হাঁটতে হাঁটতে বন্দরের দিকে যাচ্ছিলাম। সে সময় অন্ধকারের মধ্যে থেকে একটা লোক আমার সামনে বেরিয়ে এলো। তখন আমার মুখে একটা সিগারেট ছিল। লোকটা লাইটার দিয়ে জ্বালিয়ে দিল।

—দাঁড়াও! দাঁড়াও! লোকটাকে দেখতে কেমন?

—মাঝারী ধরণের বলিষ্ঠ স্বাস্থ্য। মুখে দাড়ি। মাথায় কালো ঘন লম্বা চুল। পরনে জিন্‌স আর টি সার্ট।

লু খস খস করে এগুলো একটা কাগজে লিখে নিল।

তারপর সে ড্রয়ার থেকে একটা ছবি বার করে আমার দিকে এগিয়ে দেয়, দেখো তো এইটা সেই লোক কী না?

ছবিটা বছর পঁচিশ বয়সের দাড়ি না কামানো এক যুবকের ছবি। তার

মাথার চুল ছোট ছোট করে ছাঁটা। কিন্তু তার চোখ দেখে বুঝতে পারি, এ আমার হিপি না হয়ে কিছুতেই যায় না।

এ কথা লুকে বলা যায় না। তাহলে বিপদে জড়িয়ে পড়বো। তাই ওকে ছবিটা ফিরিয়ে দিয়ে বললাম, ঠিক বুঝতে পারছি না। আর তখন আলো কম ছিল। লোকটার মুখে দাড়ি, মাথায় লম্বা চুল, তাই ঠিক···।

লু ছবিটার উপর একটা কলম দিয়ে দাড়ি এবং লম্বা চুল করে দিয়ে বলে এবার ভালো করে দেখো তো!

এখন আমার কোন সন্দেহই রইলো না। এ আমার দ্বীপের সেই হিপিই। তবুও কিছুটা কিন্তু কিন্তু করে বলি, মনে হচ্ছে যেন সেই লোক।

—ঠিক আছে, তারপর?

—বন্দরে বলতে গেলে আমি সব লোককেই চিনি। তবে ঐ লোকটাকে আমার অচেনা লেগেছে।

—লোকটি কে দেখে তোমার কী রকম মনে হচ্ছিল?

—খুব উদ্বিগ্ন।

—তা তো হতেই হবে। সে তোমার সঙ্গে কোন কথা বলেছে?

—সে আমার কাছে জানতে চেয়েছে বাহামায় কোন বোট যাবে কী না! এভাবে আমি একের পর এক মিথ্যে কথা বলে চলেছি, শেষে না আবার কথায় কথায় সত্যি কথাটা বেরিয়ে পড়ে। তাহলে গেছি।

—তখন তুমি কী বললে?

—আমি বলেছি, জানি না। তবে তুমি নেপচুন বারে গেলে ওর ব্যাপারে হয়তো কিছু জানতে পারবে। তবে তার আগে তোমায় দু' বোতল বীয়ার খরচ করতে হবে।

—তারপর লোকটা কী করলো?

—বিড় বিড় করতে করতে কোথায় যেন চলে গেল।

—তুমি তো আসল কথাটাই বললে না!

—লাইটারটা কোথায় পেলে?

—লোকটা চলে যেতে দেখি, লাইটারটা পড়ে রয়েছে। ভাবলাম, হয়তো পুলিশের খাতায় লোকটার নাম থাকতে পারে, তাই···

—হঠাৎ এটা কেন তোমার মনে হলো?

—ওর চেহারা দেখে।

—আর তার পরের ঘটনা তো তুমি সবই শুনলে।

—আর তুমি বাহামার কথা বললে না?

—আচ্ছা, বলে লু ফোন তুলে কয়েক জায়গায় ফোন করলে।

—তারপর লু রিসিভার নামিয়ে বলে, বার্ট, তোমায় অসংখ্য ধন্যবাদ!

তুমি একটা দারুণ কাজ করলে।

আমি ভালো মানুষের মত বলি, তবু যদি লোকটাকে ধরা যেত ! তাহলে একটা কথা ছিল।

—ধরা পড়লে তো কথাই ছিল না। তারপর লু একটু থেমে বলে, আচ্ছা বার্ট, লোকটা কী একাই ছিল ?

—হ্যাঁ, আমার সঙ্গে যখন কথা বলেছে তখন ও একাই ছিল। কেন, ওর সঙ্গে কী আর কারুর থাকার কথা ?

—ওর স্ত্রীর, এরপর লু বলে। বার্ট, এখুনি কাজ সেরে একবার বন্দরের দিকে যাবো।

ঠিক আছে, আমার গাড়িতেই চলো। লোকটা যদি বন্দর ছেড়ে না যায়, তাহলে তার দেখা পেলেও পেতে পারো। আমি গাড়িতে অপেক্ষা করছি, তুমি এসো।

আমি চলে যেতে যেতে লক্ষ্য করি, লু আবার টেলিফোনের ডায়াল ঘোরাতে শুরু করলো। তারপর গাড়িতে ফিরে চিন্তা করি, এখন আমার কাছে অনেকগুলো জিনিস পরিষ্কার হয়ে গেল। অর্থাৎ লোকটার সঙ্গে বউ আছে। যার জন্য তাঁবুতে দুটো বিছানা দেখেছিলাম। আর টেবিলের উপর তার সঙ্গে মেয়েলী জিনিসও ছিল। তাই সব মিলে যাচ্ছে।

ওদিকে মিনিট পাঁচেকের মধ্যে লু আসতে আমরা গাড়ি করে বন্দরের দিকে চললাম। যেতে যেতে আমি লুকে প্রশ্ন করি, লু, লোকটা কে ?

—লোকটার নাম অ্যান্ডো গ্রোফারি।

—ইতালির একজন সন্ত্রাসবাদী। তিন তিনটে খুন করেছে।

—আর তার স্ত্রী ? সেও একজন সন্ত্রাসবাদী দলের একজন। তার বিরুদ্ধেও দুটো খুনের চার্জ। রেড ব্রিগেড দলের মধ্যে ওরা সবচেয়ে মারাত্মক।

—ইতালিতে ওদের পক্ষে এখন চেলাফেরা খুব কঠিন। তাই এখানে পালিয়ে এসে আত্মগোপন করেছে। এদের উদ্দেশ্য দলের জন্য টাকা জোগাড় করা। আর ইতালি থেকে পালিয়ে যাবার পর এদের কোনরকম হদিশ করতে পারছিলাম না। এবং তুমি প্রথম লোক যে ওদের সম্বন্ধে আলোকপাত করলে।

—কিছু পুরস্কার দিচ্ছো নাকি ? বলেই হাসি। অথচ বুকের মাঝে যেন ট্রেন ছুটে চলেছে ;

বন্দরে পৌঁছে দেখি, ডিটেকটিভ টম লেভাস্কি আর ম্যাক্স জ্যাকভ আগেই হাজির। লু ওদের কাছে গিয়ে আমার সব কথা সবিস্তারে বর্ণনা করে। শুনে ওরা বেশ উত্তেজিত। এরপর আমাকে দেখানো সেই ছবিটা ওদের দেখায়।

তারপর ইয়াট রাখার জায়গায় লন্ড এবং ম্যাককে রেখে টম আমার দিকে তাকিয়ে বলে, চলো, বার্ট, অ্যালবার্নি'র সঙ্গে কথা বলে আসি। এ বন্দরের সব ঘটনা ওর জানা।

আমরা হাঁটতে হাঁটতে অ্যালবার্নি'র কাছে হাজির। সে তার নিজস্ব জায়গায় বসে আছে। তার হাতে বীয়ারের একটা খালি বোতল। ফলে তার মেজাজে চিড় ধরেছে।

—এই যে অ্যাল! টম বলে। আমরা একটা লোককে খুঁজছি। বলে প্রোফারির একটা বর্ণনা দেয়। লোকটাকে তুমি দেখেছো?

টম এ কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে বুঝলাম। সে চালে ভুল করে ফেলেছে। অ্যালবার্নি'র কাছে কিছু জানতে হলে ওকে আগে নেপচুন বারে নিয়ে গিয়ে বীয়ার খাওয়াতে হবে। তারপর অন্য কথা। আর টম কী না...।

ইতিমধ্যে অ্যালবার্নি তার খালি বীয়ারের বোতলটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে টমের দিকে তাকিয়ে একটা ইঙ্গিত করলো। টম সে ইঙ্গিতের মানে ধরতে পারে না।

টম কোন জবাব না পেয়ে ফের পুলিশী গলায় জিজ্ঞেস করে, এই রকম কোন লোককে দেখেছো?

—বলতে পারবো না, অ্যালবার্নি উদাসীন গলায় জবাব দেয়।

—লোকটা কিন্তু খুনী! টম এবার চিৎকার করে বলে।

—তাই নাকি?

—এবার আমার একটু ড্রিঙ্ক দরকার।

—বুড়ো হতভাগা! তোমার কখন মদ দরকার হয় না বলো তো? টম ধমক দেয়। এখন বলো, ঐ লোকটাকে দেখছো কী না?

—মনে করতে পারছি না।

অ্যালবার্নি'র দিকে তাকিয়ে টমের চোখ চকচক করতে থাকে। বুঝতে পারা যাচ্ছে, সে বেশ রেগে গেছে। তারপর ওর দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে আবার আমার দিকে তাকিয়ে বলে, চলো। একবার পেটের সঙ্গে কথা বলা যাক।

পেটে যদি না দেখে থাকে তবে আর কেউ দেখেনি।

পেটের নাম শুনে আমার প্রায় রক্ত চলাচল বন্ধ হবার উপক্রম। কারণ সে যতই মদ খাক না কেন, সে মনে মনে এখনো একজন পুলিশ। আর ভাবি, প্যারাডাইস পুলিশের সাহায্য হবে এমন কোন খবর সে নিশ্চয়ই চেপে যাবে না। ফলে ব্যাপারটা আমার পক্ষে বেশ জটিল হয়ে দাঁড়ালো।

তাই বিপদ এড়াবার জন্য বলি, টম, পেটের সঙ্গে কথা বলে কোন লাভ হবে বলে আমার মনে হয় না।

—না, না। পেটের সঙ্গে কথা বলা একবার দরকার। সে আগে পুলিশে

কাজ করতো।

মনে মনে ভগবানকে ডাকি। এ আমায় কোন বিপদে ফেললে! কিছুদূর এগোবার পর এডির দেখা পাই। ও বন্দরে প্রায়ই আসে। টম এডিকে জিজ্ঞেস করে, এই যে এডি, পেটেকে দেখেছো?

—না স্যার, আজ দেখিনি। অন্যদিন কিন্তু এখানে থাকে।

—ওর বাড়িটা কোথায় জানো?

—হ্যাঁ। স্টার ইয়ার্ডে।

—নম্বরটা জানো?

ছাব্বিশ, এডি টমের দিকে তাকিয়ে বলে, স্যার, একটা সিগারেট দেবেন?

এডিকে একটা সিগারেট দিয়ে টম আমায় নিয়ে একটা দুর্গন্ধময় গলিতে ঢোকে। গলির বাড়িগুলো পুরনো কাঠ আলকাতরা দিয়ে তৈরি। এটা বন্দরের বস্তি। এসব জায়গা টম বেশ ভালো করে চেনে।

টম বলে, এখানে মানুষ থাকে কী করে।

এ কথার জবাব দেবার মত আমার মানসিকতা নেই। এখন আমার মাথায় অনেক চিন্তা। আর কিছুতেই বুঝতে পারছি না পেটে সব বলে দিলে কী ভাবে ম্যানেজ করবো।

তারপর গলির মধ্যে আরো কিছুটা ঘোরাঘুরি করার পর ছাব্বিশ নম্বর বাড়িটার হদিশ মেলে। এরপর দরজাটায় ঠেলা দিতেই দরজাটা খুলে যায়। ভেতর থেকে একটা দুর্গন্ধ ভেসে আসে।

আমি ভেতরের দিকে তাকিয়ে দেখি, প্রায় অন্ধকার একটা ঘর। ঘরের মাঝখান দিয়ে একটা সিঁড়ি উপরে উঠে গেছে। ডান ধারে একটা প্যাসেজ। সেটা সম্পূর্ণ অন্ধকারে হারিয়ে গেছে।

টম ঘরের মধ্যে ঢুকে ফ্ল্যাস লাইট জেলে প্যাসেজের দিকে তাকায়। প্যাসেজের ডান দিকে একটা দরজা।

সে দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বলে, চলো বার্ট, ওদিকে যাওয়া যাক।

তারপর বিস্ময়, যা দেখে আমরা চমকে উঠি। আধ খোলা দরজা থেকে একটা রক্তের ধারা গড়িয়ে এসে প্যাসেজের কাছে থেমেছে।

টম সঙ্গে সঙ্গে ফ্ল্যাস লাইটটা নিভিয়ে পকেট থেকে পিস্তল বার করে আমায় বলে, পিছন দিকটা লক্ষ্য রাখেন।

আচ্ছা, তারপর আমি হাঁটু মুড়ে পুলিশ স্পেশালটা বার করে টমের সঙ্গে এগোতে থাকি।

টম লাথি মেরে দরজাটা খুলে ফেলে ঘরে প্রবেশ করে দেয়ালে পিঠ দিয়ে দাঁড়ায়। এভাবে মিনিট দুয়েক কেটে যায়। কিন্তু কিছুই ঘটলো না।

পিস্তলটা হাতে নিয়ে টম ভালো করে একবার ঘরটা দেখে নেয়। ঘরের স্বল্প আলোতে দেখতে অসুবিধে হয় না। তারপর টম বলে, এ কী!

তাকিয়ে দেখি, মেঝেতে একটা বছর চোদ্দর কালো ছেলে পড়ে রয়েছে। তার টি সার্ট রক্তে মাখামাখি, এবং মুখে চাপ চাপ রক্ত। আর তার চোখের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারলাম ও আর বেঁচে নেই।

ঘরের কোণের দিকে যেখানে আলোটা কম সেদিকে টম ফ্ল্যাস লাইটটা ফেলে। তখন সে একজনকে দেখতে পেলো। সে হলো পেটে। দেয়ালে ঠেস দিয়ে স্কচের একটা খালি বোতল নিয়ে বসে আছে। এবং তার মুখ রক্তে মাখা। আর নাকের খানিকটা উপরে একটা বুলেটের চিহ্ন।

তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বলে, দেখো, আশে পাশে কোথায় ফোন রয়েছে। আর আমি এখানে আছি।

ঘর ছেড়ে যেতে যেতে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। পেটে মরে গিয়ে আমায় বাঁচিয়ে দিয়ে গেল। নইলে···

আমি যখন আমার অ্যাপার্টমেন্টে ফিরে এলাম তখন রাত দশটা বাজে। কিছু স্যান্ডউইচ কিনে এনেছি। কিন্তু খিদে মোটেই নেই।

হঠাৎ আমার একটা কথা মনে পড়ে। পেটে আমায় বলেছিল, তার কতগুলো জানাশুনো ছেলে আছে। হয়তো জোন্স তা বুঝতে পেরে ওদের খুন করে চলে গেছে।

এবার লুর কথা মনে পড়ে। প্রোফারি মারাত্মক খুনে। সেও হয়তো জোন্সের সংগে ছিল। আর সবচেয়ে বড় কথা হলো, ন্যান্সি কীভাবে ওদের সংগে জড়িয়ে পড়লো। আর এ কথা ঠিক, ন্যান্সি ওদের সাহায্য করছে।

সিগারেটের টুকরোটা অ্যাসট্রেই গুঁজে দিয়ে আবার একটা সিগারেট ধরাই এবং নতুন করে পরিস্থিতিটা ভাবতে থাকি। তবুও আধঘণ্টা ভেবে এর কোন কুল কিনারা করতে পারলাম না।

ইতিমধ্যে দরজার বেল বেজে উঠলো। বিরক্ত বোধ করি। ভাবি, একে নিজের অশান্তিতে জ্বলছি, আবার কে জ্বালাতে এলো কে জানে! তারপর দরজা খুলে দিতে দেখি, লু দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে আছে।

লু ঘরে প্রবেশ করতে করতে বলে, তোমার ঘরে আলো দেখে চলে এলাম। আচ্ছা, এই খুনগুলো সম্বন্ধে তোমার কোন ধারণা আছে? কিছু বলতে পারো?

—না, কিছু নয়, আমি বলি। এসো ড্রিঙ্ক করি। তবে আমার ধারণা, প্রোফারি আর এখানে নেই।

তারপর লু এসে ঘরে বসে এবং গ্লাসে চুমুক দেয়। আর বলে, বার্ট, মৃতদেহ দেখে তোমার কী মনে হলো ? এরপর সে আবার বলে, আমি পরে দেখেছি। তবে আমার মনে হয়, এ পেশাদারী খুনের কাজ। দুটো গুলি খরচ করেছে, আর দুটো লোকই মরেছে। প্রোফারি এইভাবে খুন করে। আর এই ব্যাপারে সে জড়িত কী না কে জানে।

এরপর লু আমার দিকে তাকিয়ে বলে, বার্ট, তুমি কী ভাবছো ?

—আমার মনে হয় পেটের উপর কারুর আক্রোশ ছিল। তার উপর সে পুলিশে কাজ করতো।

—কিন্তু তাহলে ছেলেটাকে খুন করলো কেন ?

—সাক্ষী লোপাট করার জন্য হয়তো।

তারপর লু চিন্তিতভাবে বলে, যাক্ গে। এটা হলো গিয়ে টমের ব্যাপার। আমার সমস্যা হলো প্রোফারি।

আর একটু ড্রিঙ্ক দেবো ? আর প্রোফারির বউ সম্বন্ধে কিছু জানতে পারলে ?

—বিশেষ কিছুই নয়। তবে আমি ওয়াশিংটনে খবর পাঠিয়েছি। কিন্তু জানতে পারলে তোমায় জানাবো। তবে মেয়েটার বিয়ের আগে নাম ছিল লুসিয়া ল্যামর্তোট। কিন্তু আবার ইতালির পুলিশ বলছে ওটা নাকি ওর আসল নাম নয়। আঠারো মাস আগে মেয়েটা প্রোফারির সঙ্গে যুক্ত হয়। সে আর প্রোফারি যখন একটা ব্যাঙ্ক ডাকাতি করছিল তখন মেয়েটা পুলিশের হাতে ধরা পড়ে। কিন্তু প্রোফারি পালিয়ে যায়।

—তারপর মেয়েটা পালালো কী করে ?

—এর কিছুদিন পরে মেয়েটা জেলের দুটো গার্ডকে পিস্তল দিয়ে খুন করে পালায়।

—জেলের ভেতর পিস্তল কী করে পেলো ?

—কেউ স্মাগলিং করে পাঠিয়েছিল। আচ্ছা বার্ট, উঠি।

আপাতত বিছানায় শুতে যাওয়া ছাড়া কিছুই করণীয় নেই, আর এত রাতে বার্থাকে ডেকে কোন লাভ নেই। তারপর স্যান্ডউইচগুলো খেতে খেতে ভাবি, তাহলে পেটেকে কী জোন্সই হত্যা করলো ?

আমি পেটেকে ভালোবাসতাম। এখন ওর কথা ভেবে আমার দারুণ কষ্ট হচ্ছে। এই ভাবটা কাটাবার জন্য গ্লাসে আবার কিছুটা পানীয় ঢেলে নিই।

ড্রিঙ্ক শেষ করে শোবার ঘরে এলাম। নিজেকে বড় নিঃসঙ্গ বোধ হয়।

ভাবি, বার্থাকে একবার ফোনে ডাকার চেষ্টা করা যাক। ও এলে মন্দ হয় না। রাতটা ভালোই কাটবে।

ফোনের দিকে এগিয়ে যাই, তবু ফোন করা হলো না। মনে হয় কে যেন

দরজার মৃদু আঘাত করছে।

আমি সঙ্গে সঙ্গে সজাগ হয়ে উঠি। ভাবি, মাঝ রাত পার হয়ে গেছে। এখন আবার কে আসতে পারে?

দরজা না খুলেই জিজ্ঞেস করি, কে?

ওধার থেকে মৃদুস্বরে আওয়াজ ভেসে এলো, আমি পেটের লোক। প্রয়োজন বোধে সে আপনার সঙ্গে আমায় দেখা করতে বলেছে।

এসো, আমি দরজা খুলে দিয়ে বলি।

আমি ছেলেটার দিকে তাকাই। বয়স তের চৌদ্দ হবে। রোগাটে গড়ন। ছেলেটা রীতিমত হাঁপাচ্ছে। তার কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম।

দরজা বন্ধ করে বলি, তোমার নাম কি বাবা?

—জয়।

—পেটের কি হয়েছে তা তুমি জানো?

—হ্যাঁ, জয় মাথা নাড়ে।

—বসো। তুমি এখানে কেন এসেছো জয়।

—টম আমার দাদা। পেটের ঘরে...।

—মানে পেটের সঙ্গে, যে···।

—হ্যাঁ. জয়ের চোয়াল শক্ত হয়ে ওঠে, তারপর সে দাঁতে দাঁত চেপে নিজেকে সংযত করার চেষ্টা করে। তার চোখ দুটো আবার সজাগ হয়ে ওঠে।

আমি জয়কে সমবেদনা জানিয়ে বলি, জয়, তোমার জন্য আমি অত্যন্ত দুঃখিত।

—দুঃখ করে লাভ কী! জয় নিস্তেজ গলায় বলে।

—ঠিক বলেছো। আমার মুখ দিয়ে একটা চাপা নিঃশ্বাস বেরিয়ে আসে। যে যায় সে আর আসে না।

তারপর জয় বলে, আপনি পেটেকে কুড়ি ডলার দিয়েছিলেন জোন্সের উপর দৃষ্টি রাখার জন্য।

পেটে আমাকে টমকে জোন্সের উপর নজর রাখার জন্য লাগিয়েছিল। ও আমাদের খুব ভালোবাসতো। বলেছিল, কুড়ি ডলার তিন ভাগ করে পাবে।

—খুন করেছে কে তা তুমি জানো?

—হুঁ ওদের তিন জনের মধ্যে একজন। তবে সঠিকভাবে বলতে পারছি না কে করেছে। কিন্তু সে লোকটা আর মেয়েটা কোথায় রয়েছে তা আমি জানি। আর আমার টম পেটেকে জানাতে গিয়ে খুন হলো।

আমার কপালে ঘামের রেখা ফুটে ওঠে। জয়, তুমি এসব কথা পুলিশকে বলেছো নাকি?

—না, আর আমি পুলিশের কাছে কোন কথা বলি না। কারণ, ওরা

আমার বাবাকে গত বছর জেলে দিয়েছে।

—আচ্ছা, ওরা দু'জন কোথায় বলতে পারো? এবার আমি কিছুটা সহজ-ভাবে কথা বলি।

ওর কথার কোন জবাব না দিয়ে খানিকক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে বলে, এতে আমি কত পাব?

—এই নাও, বলে আমি একটা দশ ডলারের বিল ওর সামনে এগিয়ে দিই।

—জন মাথা নাড়ে। বলে এতে হবে না।

তারপর কিছুটা অনিচ্ছা সত্বেও ওর সঙ্গে আরো পাঁচ ডলারের একটা বিল দিয়ে বলি, এর বেশী আমার কাছে নেই।

—ঠিক আছে, দিন, জন নেয়।

—ওরা এখন কোথায় আছে?

—অ্যালামোডা বারে।

—এ যে আমি বিশ্বাস করতে পারছি না।

—কথাটা কিন্তু সত্যি।

—জোন্সের সঙ্গে আজ সকাল পাঁচটার সময়। গলির পেছনের পথ দিয়ে লুকিয়ে গেছে।

- আর জোন্স কি ওখানে রয়েছে?

—না। ও ফিরে এসেছে।

—আচ্ছা। এখন ওখানে কেউ পাহারায় আছে?

—আছে আমার ছোট ভাই জিম্বো!

—তোমার আরো একটা ভাই আছে নাকি?

—হ্যাঁ, সেও পেটের হয়ে কাজ করতো।

—ঠিক আছে, তোমরা ভালোভাবে নজর রেখে যাও। আমি তোমাদের আরো টাকা দেবো।

—আচ্ছা স্যার। এই কথা বলে যাবার জন্য পা বাড়ায়।

—জন, দাঁড়াও।

—তোমার আমি কোথায় পাবো?

—লবস্টার কোর্টে।

—ক্যার কোর্টের ঠিক পাশেই।

—বাড়ির নম্বর?

—দুই।

—সব চেয়ে উপরের তলায় আমি আর আমার ভাই জিম্বো থাকি।

—আর তোমার মা?

বাবার যখন জেল হয়, মা তখন শোক সামলাতে না পেরে আত্মহত্যা করে।

জর চলে যেতে আমি দরজা বন্ধ করে আবার চেয়ারে এসে বসি। ভাবি প্রোফারি আর তার স্ত্রী সেই দ্বীপটায় লুকিয়ে ছিল। ন্যান্‌সি তাদের সঙ্গে দেখা করে বন্দরে নিয়ে এলো। এরপর জোন্স তার বাড়ি নিয়ে গিয়ে, পরে তাদের আবার অ্যালামোডা বারে নিয়ে যায়।

কিন্তু তার পরমুহূর্তে ভাবি, অ্যালামোডা বারে কে? পরে ভাবি, জোন্স হ্যামেলের প্রথমা স্ত্রী গ্লোরিয়ার সঙ্গে হয়তো পরিচিত। তার মাধ্যমে ডিয়াজের সঙ্গে হয়তো একটা রফা করেছে, যার সাহায্যে ওদের নিরাপদে রাখতে পারে।

এইটুকুই যা পরিষ্কার। তারপর সব ঘোলাটে। ভাবি ন্যান্‌সির মত একটা সুন্দরী মেয়ে দুটো সন্ত্রাসবাদীর সঙ্গে এভাবে জড়িয়ে পড়লো? আমি অধৈর্যভাবে সিগারেটটা অ্যাসট্রেতে গুঁজে দিই।

ভাবি, এখন আমার কী করা উচিত? পুলিশকে ডেকে বলে দেওয়া প্রোফারি এবং তার স্ত্রী অ্যালামোডা বারে রয়েছে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ভাবি এতে আমার লাভ কী? বরং এতে ঝামেলার সৃষ্টি হবে।

আরো ভাবি, তাহলে টম জানতে চাইবে আমি কী করে জানলাম যে ওরা অ্যালামোডা বারে রয়েছে। যত মিথ্যে কথা বলি না কেন ওর তীক্ষ্ন চোখকে ফাঁকি দিতে পারবো না। সত্যি কথাটা হয়তো বেরিয়ে পড়বে, তাছাড়া কেউ তো আমায় এ জন্য পুরস্কার দেবে না।

হঠাৎ আমার একটা কথা মনে পড়ে যায়। এ সময় একবার ন্যান্‌সির সঙ্গে কথা বলা দরকার। সে কী আমার মুখ বন্ধ করার জন্য টাকা ঢালবে না?

নিশ্চয়ই। ব্যাপারটা নিয়ে খুব সাবধানে এগোনো যেতে পারে। পরে আবার ঠিক সাহস পাই না ভাবি, শেষে আবার ব্ল্যাকমেলের পর্যায়ে জড়িয়ে পড়বো নাতো?

এজেন্সীর কাজে যোগ দেবার পর আমি বহু ব্ল্যাকমেলারকে সায়েস্তা করেছি, আর এই অপরাধকে আমি সব চেয়ে জঘন্য অপরাধ বলে মনে করি। তবে আমার কাজটা ঠিক আবার ব্ল্যাকমেলের পর্যায়ে পড়ছে না।

আমি যা করবো তা হলো, ন্যান্‌সির সঙ্গে একান্ত নিভৃতে কিছু কথা বলবো। প্রোফারির সংগে যে তার যোগ রয়েছে, সে কথা তাকে জানাবো। আর এও বলবো, প্রোফারি এবং তার স্ত্রী কোথায় রয়েছে। এবং সব শেষে বলবো, আমাদের মত মানুষরা যা মাইনে পায় তাতে আমাদের চলে না!

তারপর কোন অর্থের বন্দোবস্ত হলে আমি এ সব ভুলে যাবো। এটা যে আমার চরিত্র গত পেশা নয়, তাও ন্যান্‌সিকে জানাতে কিছুতেই ভুলবো না। আবার ভাবি, জিনিসটা কী ব্ল্যাকমেল? না। না। এটা ব্যবসার একটা অংশ।

লোককে ঠকাতে আমি দক্ষ, আমি নিজেকে ঠকাতে চেষ্টা করি, তখন আমার জুড়ি মেলা ভার।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

পরের দিন অফিসে ঢুকে কেরীর কাছে হাজির। গিয়ে দেখি, কেরী ডাক বাছছে। তার ডেস্কের উপর হাত রেখে বলি, মক্ষীরাণী খুব ব্যস্ত দেখছি!

কেরী আমার দিকে না তাকিয়ে বলে, তুমি কি চাও? তোমার তো এখন কাজে থাকার কথা।

—কাজ ছেড়ে দিয়েছি তা তোমায় কে বললো! আমি পাল্টা জবাব দিই। আমি সেই চিঠিগুলো নিতে এসেছি।

কেরী একটা কেবিনেট দেখিয়ে বলে ওখানে আছে। নিয়ে নাও।

চিঠিগুলো পকেটে পুরে অফিস থেকে বেরিয়ে পড়ি এবং গাড়ি চালিয়ে সোজা কান্ট্রি ক্লাবের দিকে যাই।

কানট্রি ক্লাবের পার্কিং জোনে গাড়ি পার্ক করে একটা 'নিউজ উইক' কিনে অপেক্ষা করতে থাকি, কখন ন্যান্সি এখানে আসে। আমি নিশ্চিন্ত, ঠিক ভাবে এগোতে পারলে আমি ঠিক জয়ী হবো। তুরুপের তাস এখন আমার হাতে।

তখন প্রায় সাড়ে দশটা বাজে। আমার হৃৎপিণ্ড কাঁপিয়ে ন্যান্সি এলো। হাতে একটা টেনিস র‍্যাকেট। ওকে দেখে আমি দারুণ উত্তেজনা বোধ করছি। আমার বুকের স্পন্দন দ্বিগুণ বেড়ে গেছে।

ন্যান্সি আমার কাছে এসে একজনকে ডেকে বললো, জনসন, মিসেস পেনি হাইবি এসেছেন?

—উনি টেনিস কোর্টে আছেন। আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন।

ন্যান্সি আমার সামনে দিয়ে চলে যায়। তারপর আমি মিনিট পনেরো অপেক্ষা করার পর আমিও টেনিস কোর্টের অদূরে গিয়ে দাঁড়াই। দেখি ন্যান্সি পেনি হাইবির সঙ্গে টেনিস খেলছে।

তারপর ভাবি, ঠিক আছে সুইমিং, তোমার সঙ্গে লাঞ্চের সময় কথা বলা যাবেখন। এরপর সুইমিং পুলের কাছে এগিয়ে যাই এবং পোশাক ছেড়ে সাঁতার কাটতে নেমে পড়ি।

ইতিমধ্যে ঘন্টাখানেক সময় পার হয়ে গেছে। তাড়াতাড়ি পোশাক ছেড়ে টেনিস কোর্টের দিকে এগিয়ে যাই। গিয়ে দেখি, ওরা এখনো টেনিস খেলছে। তাই একটা বড় ছাতার নিচে চেয়ার টেনে বসে একটা ওয়েটারকে দেখতে পেয়ে স্কচ আর কোক দিতে বললাম।

হঠাৎ পিছন থেকে কে যেন আমার নাম ধরে ডেকে উঠলো,' আরে মিঃ এণ্ডারসন যে!

ঘাড় ফিরিয়ে দেখি, পামার। আমি তাকে দেখে হেসে সংবর্ধনা জানালাম ঠিকই, কিন্তু ভেতরে ভেতরে দারুণ অস্বস্তি বোধ করছি। তাকে আমি এখন এখানে মোটেই দেখতে চাইনি। সে যেন শনির ভূমিকা নিয়ে এখানে হাজির হয়েছে।

সৌজন্যতার খাতিরে বলতে হলো। বসুন মিঃ পামার, একটু ড্রিঙ্ক করি।

চেয়ার টেনে বসতে বসতে পামার ওয়েটারকে দেখে একটা ড্রিঙ্ক জিন আনতে বললো। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বললো, দেখছি আপনি কাজ করছেন। বলে সে একটা অর্থপূর্ণ হাসি হেসে টেনিস কোর্টের দিকে তাকায়।

— অন্যের উপর নজর রাখার ব্যাপারটা বড় একঘেঁয়ে।

—তা যা বলেছেন।

ইতিমধ্যে পামারের ড্রিঙ্ক চলে এসেছে। পানীয়তে চুমুক দিয়ে বলে, এটা অবশ্য আমার কাছে একটা সুখবর। আপনার রিপোর্টে আর কিছু আছে কী?

—গত চার দিন ধরে নজর রাখছি, কিন্তু রিপোর্ট করার মত কিছুই পাচ্ছি না।

আমার কথা শুনে পামারের হাসি দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হলো। সে বললো, আমি এই কথাটা মিঃ হ্যামেলকে বোঝাতে পারলাম না যে, এতে শুধু পয়সার অপচয় হচ্ছে। আসল কাজ কিছুই হবে না। কিন্তু লোকটা এমন একগুঁয়ে যে কী বলবো।

এরপর আমরা ওয়ালডো কারমাইকেল সম্বন্ধে খোজ খবর নিয়েছি। ও নামে কেউ নেই।

পামার তা শুনে কিছু বললো না, শুধু মাথা নাড়লো। বললো, এতে আমি আদৌ আশ্চর্য হইনি। আমরা একটা অসুস্থ পাগলা লোকের খপ্পরে পড়েছি, কিন্তু এ কথাটা সে কিছুতেই মানতে রাজি নয়।

দুশ্চিন্তা যে তোমার কমিশনের প্রতি, আমি মনে মনে বলে উঠি। সে স্থিরভাবে লিখতে না পারলে তোমার প্রাপ্য কমিশন সিগারেটের ধোঁয়ার মত হাওয়ায় মিলিয়ে যাবে।

—তারপর বলি, এ সপ্তাহের শেষে মিসেস হ্যামেলের চলাফেরার উপর একটা সম্পূর্ণ রিপোর্ট দিয়ে দেবো। সেই রিপোর্ট দেখে বুঝতে পারবেন, মিসেস হ্যামেল এক ঘেঁয়ে এবং নির্দোষ জীবন যাপন করে চলেছেন। আর আমার রিপোর্ট যদি মিঃ হ্যামেলের বিশ্বাস না হয় তাহলে আর কোন কিছুতেই বিশ্বাস

হবে না।

—চমৎকার! এই বলে পামার তার পানীয় শেষ করে। এবার তাহলে উঠি। সে বিদায় নেয়।

পামার চলে যেতে দেখি, ওদেরও টেনিস খেলা শেষ হয়েছে এবং দেহটা গরম রাখার জন্য উভয়েই সোয়েটার পরে নিল। আর ওরা কথা বলতে বলতে আমার দিকে এগিয়ে আসছে।

কাছে আসতে শুনতে পেলাম। ন্যান্সি বলছে, একটু ড্রিংক করে যাও পেনি।

—আর দেরি করার উপায় নেয় ন্যান্সি। কাল আবার দেখা হবে। কথা শেষ করে পেনি তাড়াতাড়ি চলে যায়।

তারপর ন্যান্সি গিয়ে একটা দূরের টেবিলে বসে এবং হাত ইশারা করে ওয়েটারকে ডেকে কি যেন অর্ডার দিল।

আমি কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর দেখি, ওয়েটার ন্যান্সির টেবিলে 'টম কলিন্স' রেখে চলে গেল।

ভাবি, এই হচ্ছে ন্যান্সির কাছে যাওয়ার প্রকৃত সময়। ও এখন একবারে একা। তারপর আমি আস্তে আস্তে ওর টেবিলের কাছে গিয়ে হাসলাম। এর-পর বলি, মিসেস হ্যামেল, আমি আপনার স্বামীর এজেন্ট মিঃ পামারের সঙ্গে এতক্ষণ কথা বলছিলাম।

ন্যান্সি আমার কথার জবাব না দিয়ে পরিশ্রান্ত দেহটা চেয়ারে এলিয়ে দিয়ে কিছুক্ষণ আমায় দেখলো। আমি লক্ষ্য করি, তার কালো চোখে এক আগ্রহের ছায়া।

—আপনি মিঃ পামারকে চেনেন? ন্যান্সি প্রশ্ন করে।

—অবশ্যই, আমি আর একটু হেসে বলি। আমি আপনার খেলা দেখছিলাম, সত্যি, অপূর্ব খেলেন?

—আপনি টেনিস খেলেন?

—খেলি। তবে আপনার মত নয়। আপনার ব্যাক হ্যান্ডের মারগুলো বার বার তারিফ করার মতন।

ন্যান্সির মুখের রেখায় কোন পরিবর্তন না ঘটায় বুঝলাম, সে আমার ব্যাপারে আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছে। তাই সম্ভবত সে আমায় বসতেও বললো না, তবু আমি আমন্ত্রণের অপেক্ষায় না থেকে বসে পড়লাম।

আমি ন্যান্সির পাশে বসতে, সে চমকে ওঠে এবং আড়ষ্ট হয়ে গেল কিছু ক্ষণ মুহূর্তের জন্য। তারপর সে আবার স্বাভাবিক হয়ে যায়। কিন্তু তার চোখ স্থির। তার হাবভাব গম্ভীর।

—আপনার কি একটু সময় হবে? আমি জিজ্ঞেস করি।

—কেন বলুন তো ?

—আমি আপনার সঙ্গে একটু কথা বলতে চাই। আমি খুব ঝামেলায় পড়ে গেছি।

—আমি খুব দুঃখিত, ন্যান্সি আবার আড়ষ্ট হয়ে যায়। মি……, মি… ।

—বার্ট এণ্ডারসন।

—হ্যাঁ, মিঃ এণ্ডারসন, আমি আপনাকে চিনি না। আর আপনার ঝামেলা সম্পর্কে আমি বিন্দুমাত্র আগ্রহী নই। এবং বুঝতে পারছি না কেন আপনি আমার সঙ্গে কথা বলতে চাইছেন।

—আমি আপনার সঙ্গে মোটেই কথা বলতে চাই না, আমি ধৈর্যের হাসি হেসে বলি। এবং বুঝতে পারছি, ন্যান্সিকে বাগে আনতে বেশ কষ্ট হবে। কিন্তু এ ব্যাপারে আপনার ভালোর কথা ভেবে আপনার কাছে এসেছি। নইলে আপনার কাছে আসার আমার কোন প্রয়োজন ছিল না। এবার আমি যা বলি তা দয়া করে শুনুন।

—আপনি যদি এখান থেকে চলে না যান তাহলে আমি ওয়েটার ডাকতে বাধ্য হবো, ন্যান্সি দৃঢ়তার সঙ্গে বলে।

ভাবলাম। কথাটা ন্যান্সি উত্তেজনার বশে বলেছে কিনা, তা একবার পরখ করতে চাইলাম। কিন্তু সেই একই জবাব। বুঝতে পারলাম, বেশি দেরি করার উপায় নেই। যা বলার তা সংক্ষেপে বলে পালাতে হবে। হাওয়া খুবই বেগতিক।

তারপর আমি আমার 'বিজনেস কার্ডটা' ন্যান্সির সামনে রেখে বলি, আপনার স্বামী আপনার উপর নজর রাখার জন্য আমায় নিয়োগ করেছেন।

এ কথা বলায় দারুণ কাজ হলো। ন্যান্সির চোখ-মুখ বিবর্ণ হয়ে ওঠে। চোখগুলো যেন সহসা ভেতরে ঢুকে যায় এবং সংকোচিত হয়ে পড়ে। আর আমার কার্ডটার দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে স্থির হয়ে বসে থাকে।

আমি ন্যান্সিকে কিছুটা সময় দিলাম। আমার সামনে দিয়ে একটা সুন্দরী মেয়ে যাচ্ছিল। তার চলার মনোরম ভঙ্গিটা দেখলাম।

মেয়েটা সুইমিং হলের দিকে যেতে আমি আবার ন্যান্সির দিকে তাকাই। সে আগের মতই স্থির হয়ে বসে আছে।

আমি আমার গলার স্বর নিচে নামিয়ে এবং যথেষ্ট ভদ্রতা সহকারে বলি, পরিস্থিতি বোঝার জন্য এ চিঠিগুলো আপনার পড়া দরকার। তাহলে বুঝতে পারবেন কেন আপনার স্বামী আপনার উপর নজর রাখতে বলেছেন।

এবার ন্যান্সি আমার দিকে তাকায়। তার চোখ দুটো দেখে মনে হলো সাদা কাগজের উপর দুটো গর্ত।

তারপর আমি পকেট থেকে দুটো চিঠি বার করে টেবিলের উপর রাখি।

ন্যান্সি কাঁপা হাতে চিঠি দুটো নিয়ে পড়তে থাকে এবং আমি একটা সিগারেট ধরিয়ে অপেক্ষা করতে থাকি। ভাবি, পরিস্থিতি এখন অনুকূল। তাড়াহুড়ো করার কোন দরকার নেই।

চিঠি দুটো শেষ করে ন্যান্সি টেবিলের উপর রাখে। এবং বলে, এ দুটো চিঠিই আমার স্বামী লিখেছে ?

—কী করে জানলেন ?

—তিনি এখন যে বইটা লিখছেন তার নায়কের নাম ওয়ালডো কারমাইকেল।

এই কথাগুলো শুনে আমি হাঁ হয়ে গেলাম। এবার তার মত আমার অবস্থা। তবু বলি, মিসেস হ্যামেল, আপনি হয়তো ভুল করছেন।

—কোন ভুলই করছি না।

—তা নয় মানলাম, কিন্তু আপনি একটা নিশ্চিত হয়ে এসব কথা কী করে বলছেন ?

—তার কারণ আছে। আমি প্রমাণ ছাড়া কোন কথা বলি না।

—তাহলে প্রমাণটা দেখতে বলছি না। মুখে বলুন তাহলেই হবে।

—এই যে চিঠির এই কাগজটা দেখছেন। এটা আমার স্বামী ব্যবহার করেন। আর এ টাইপও আমার পরিচিত। তাই আমার দৃঢ় ধারণা, এ দুটো চিঠি তিনিই লিখেছেন।

—কিন্তু তিনি এ ধরণের চিঠি লিখতে যাবেন কেন ? আর তাতে তার স্বার্থই বা কী !

ন্যান্সি সরাসরি আমার দিকে তাকিয়ে বলে, এটা একটা ডিটেকটিভ ভাড়া করার অজুহাত।

—কেন ? আর নিজের বউ-এর উপর বা নজর রাখা কেন। বলে আমি চিঠিগুলো পকেটে রাখি এবং আমার মাথা দ্রুত কাজ করে চলে।

অবশেষে বলি, তাহলেও এতে জটিলতা আছে মিসেস হ্যামেল, আর আমি যে ঝামেলার কথা বলেছিলাম, এ হলো সেই ঝামেলা।

তারপর একটু থেমে আবার বলি, আমি গত চারদিন ধরে আপনার উপর নজর রাখছি। এ সপ্তাহের শেষে আপনার উপর আমার রিপোর্ট দেওয়ার কথা।

ন্যান্সি টান টান হয়ে আমার দিকে তাকায়, এতে ঝামেলা বা জটিলতার কী আছে ? আপনি আপনার রিপোর্ট পাঠিয়ে দিন। তাতে তো কিছুই থাকবে না। বলে সে উঠে দাঁড়ায়।

—থাকবে না ? নিজের সম্বন্ধে এতটা নিশ্চিত। আমি যদি বলি কিছু

আছে।

—অসম্ভব।

—আছে মিসেস হ্যামেল। দ্দিন আগে আপনার ইয়াটের সাথে একটা বোটে করে দ্বীপে গিয়ে হাজির হয়েছিলাম।

এ কথা শ্নে ন্যান্সি চোখ বন্ধ করে এবং হাত ম্ঠ করে।

—তাহলে দেখছেন, আমি কী ঝামেলায় পড়েছি, আমার ভ্মিকা এখন ভিলেনের মতন। সেই দ্বীপে অ্যান্ডো প্রোফারির সঙ্গে আমার দেখা হয়। খ্নের দায়ে প্লিশ তাকে খ্ঁজে বেড়াচ্ছে।

—কে বললো আপনাকে?—আপনার জানা মিথ্যেও তো হতে পারে।

—মিথ্যা বলছি না। আর আমি যে সত্যি কথা বলছি, তাও আপনি কথার মধ্যে স্বীকার করেছেন।

—কোথায়?

—ঐ যে বললেন, মিথ্যেও তো হতে পারে।

—আপনার অন্মাণ করার শক্তি তো দার্ণ!

হ্যাঁ, যা বলছিলাম, আপনি এবং আপনার ইয়াটের চালক জোন্স প্রোফারি এবং তার স্ত্রীকে সেই নির্জন দ্বীপ থেকে নিয়ে চলে এসেছেন।

—আমি···আমি তাদের আনতে যাবো কেন?

—তা আপনিই জানেন। একেবারে সত্যি, এর এক অক্ষরও মিথ্যে নয়।

—আর আপনি কী জানেন? ন্যান্সি যেন দাঁত কড়মড় করে কথা বলে।

—আমার অন্মান আর একটু কাজে লাগায়?—তাদের কোথায় ল্কিয়ে রেখেছেন তাও আমি জানি।

—আমি এখনো বলছি। এদের সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই। তাই ওদের ল্কিয়ে রাখার কোন প্রশ্নই আসছে না।

—ঠিক আছে। মিসেস হ্যামেল, আমি উঠি, কথাটা বললাম বটে কিন্তু চেয়ার ছাড়লাম না। যা লেখার তা রিপোর্টেই লিখবো।

আমার কথা শ্নে ন্যান্সি গম্ভীর ম্খে বসে থাকে। তারপর—

—যাবেন না।

—এবার আমার ঝামেলাটা নিশ্চয়ই ব্ঝতে পারছেন?

—হ্যাঁ, আর আপনি কি আপনার রিপোর্ট পাঠাচ্ছেন।

—হ্যাঁ, পাঠাতে তো হবেই। তাই তো এ ঝামেলায় পড়েছি, কথা বলেই আমি তার দিকে তাকিয়ে থাকি। মিঃ হ্যামেল এজেন্সীকে ভাড়া করেছেন। আর আমি সেই এজেন্সীর হয়ে কাজ করছি। ওখানকার কুড়ি জন ডিটেকটিভের

মধ্যে আমি অন্যতম। তাবে আমাদের মাইনে পত্তর ভালো নয়।

তারপর একটু থেমে আবার বলি, সত্যি কথা বলতে কি, যেসব স্বামী তাদের স্ত্রীদের অবিশ্বাস করে, আমি তাদের দু'চোখে দেখতে পারি না। তবে আমার এ চাকরি করা ছাড়া গতি নেই। তাই এজেন্সী যা বলবে তা আমায় করতে হবে বই কী!

আমি মুখে হতাশা এবং বিরক্তির ভাব ফুটিয়ে বলি। এখন বুঝতে পারছেন আমার ঝামেলাটা কোথায়, বার বার এ কথা বলার উদ্দেশ্য হলো, ডলারের কথায় আসা।

এবার ন্যান্সি আমার দিক থেকে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বলে, তারপর বলুন।

—আমার কাছে দুটো রিপোর্ট রয়েছে।

—দুটো? ন্যান্সি আবার আমার দিকে তাকায়।

—হ্যাঁ। এর যে কোন একটা মিঃ হ্যামেলকে দিতে পারি। তবে প্রথম রিপোর্টটা পড়ে তিনি খুশীই হবেন। তাতে কিছুই নেই।

—আর দ্বিতীয়টা?

—তাহলে সব বেরিয়ে পড়বে। আপনি, ইয়াট, জোন্স, প্রোফারি, তার স্ত্রী, কোথায় লুকিয়ে ইত্যাদি সব বেরিয়ে পড়বে।

—রিপোর্ট দুটো আমি দেখতে চাই।

—সঙ্গেই আছে। এই যে, দুটো রিপোর্টের প্রথমটা আমি ন্যান্সির দিকে এগিয়ে দিয়ে তার মুখের ভাব লক্ষ্য করতে থাকি।

প্রথম রিপোর্টটা পড়া হয়ে গেলে ন্যান্সি বলে, দ্বিতীয় রিপোর্টটা এবার দেখি।

—এই নিন।

আমি ন্যান্সিকে যে দ্বিতীয় রিপোর্টটা দিলাম, তাতে তার কথা। জোন্স ইয়াট প্রোফারি এবং স্ত্রীকে যে পাইরেটস দ্বীপ থেকে এনে অ্যালামোডা বারে লুকিয়ে রাখা হয়েছে তা সাবিস্তারে লেখা হয়েছে।

—ন্যান্সির রিপোর্ট পড়া শেষ হতে তার মুখ ফ্যাকাসে হয়ে উঠে এবং তার হাত কাঁপছে।

তারপর আমি ন্যাকা সেজে জিজ্ঞেস করি, এখন আমি কী করবো বলুনতো মিসেস হ্যামেল? আর আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন, দ্বিতীয় রিপোর্টটা মিঃ হ্যামেলকে দেওয়া দরকার। আর তা না হলে আমার চাকরি যাবে। এবং গেলে আমায় পথে বসতে হবে। এছাড়া আমার আর অন্য কোন উপায় থাকবে না।

—আমি আপনাকে সাহায্য করতে চাই, ন্যান্সি সহসা কথা বলে উঠে।

—সাহায্য ? কী ভাবে ? আমার বুকের মাঝে যেন দ্রম্‌দ্রমা বাজছে। তারপর আমি বলি, আপনি যদি আমার স্বার্থ দেখার জন্য আমায় ভাড়া করেন, তাহলে আমি আর মিঃ হ্যামেলের হয়ে কাজ করবো না। তখন আমি আপনার হয়ে ·····।

—তাহলে দ্বিতীয় রিপোর্টটার কী হবে ?

—পাঠাবো না ছিঁড়ে ফেলবো। প্রথমটা পাঠাবে।

ভাবি, পাখি প্রায় বশ করে এনেছি। তারপর বলি, আপনার হয়ে কাজ করতে পারলে আমি খুশী হবো। এবং এ কথা বলতে গিয়ে নিজে যে ভাবে আনন্দে মেতে উঠেছি তাতে আমি নিজেই চমকে উঠেছি।

—আপনার কাজে কি কি কাজ পাবো ? ন্যান্‌সির চোখের ঘৃণিত দৃষ্টি আমার একটু আগের আনন্দকে মিলিয়ে দিল।

—মিঃ হ্যামেল প্রথম রিপোর্টটা পাবেন, তবু নিজেকে সহজ করে বলি। আর সেই রিপোর্টে তিনি সন্তুষ্ট না হলে ওর চাইতেও ভালো রিপোর্ট দেবো।

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর ন্যান্‌সি বলে। আপনি নিশ্চয়ই আপনার কাজের জন্য পারিশ্রমিক দাবি করেন ?

মনে মনে বলে উঠি, অবশেষে আসল জায়গায় আনতে পেরেছি। তারপর বলি, হ্যাঁ মিসেস হ্যামেল। আর যদি কখনো প্রমাণিত হয়, আমি মিথ্যে রিপোর্ট দিয়েছি তাহলে আমার চাকরি তো যাবেই, সেই সঙ্গে লাইসেন্সও ক্যানসেল হবে। কোন এজেন্সীতে আমার চাকরি হবে না। সুতরাং বুঝতেই পারছেন, আমায় কত ঝুঁকি নিতে হবে।

—আপনাকে কত দিতে হবে বলুন ? ন্যান্‌সি চারদিকে তাকিয়ে নিচু স্বরে কথাটা আমার দিকে তাকিয়ে বলে।

এর জবাবে আমি যা বলতে যাচ্ছিলাম তা আমার বলা হলো না। আমি শুরু করার আগেই আবার ন্যান্‌সি কথা বলে উঠলো। বললো, যদিও আমার স্বামী খুব ধনী, কিন্তু আমার টাকা পয়সা খুবই কম।

আমি পুলিশী দৃষ্টিতে ন্যান্‌সির দিকে তাকিয়ে বলি, মিসেস হ্যামেল, অন্তত, পাঁচটা খুনের দায়ে জড়িত সন্ত্রাসবাদীদের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করে ভুল করেছেন ওদের আশ্রয় দেবার আগে আপনার পরিণতির কথা চিন্তা করা উচিত ছিল ? তবে আপনি কেন ওদের আশ্রয় দিয়েছেন তা আমার জানার দরকার নেই, তবে এটা জানাজানি হয়ে গেলে আপনি অ্যারেস্ট হবেন, সেই সঙ্গে আমিও রেহাই পাবো না। আপনার মত আমারও একই পরিণতি হবে। তবু আমি ঝুঁকি নিয়ে আপনাকে সাহায্য করতে চাই।

—আপনার কাজের মধ্যে যথেষ্ট ঝুঁকি আছে, তা আমি অস্বীকার করছি না, ন্যান্‌সি আগের মতন নিচু গলায় কথা বলে। তবে কথা সংক্ষেপ করে এবার দয়া করে কাজের কথায় আসলে খুশী হবো।

—সে তো নিশ্চয়ই।

—বলুন, আপনার কাজের জন্যে কত পারিশ্রমিক চান।

—পারিশ্রমিক? আমি ভাবতে থাকি।

—হ্যাঁ, আমার অবস্থার কথা তো আপনাকে আগেই বলেছি, সে কথাটা মনে রেখেই কথাটা বলবেন।

—আচ্ছা। আমাকে একশো হাজার ডলার দেবেন।

এতবড় একটা অঙ্কের কথা বলে আমি যেন ন্যান্‌সিকে একটা চড় কষিয়েছি। ন্যান্‌সি সেরকম মুখটা করে আমার কথা পুনরাবৃত্তি করে বলে, একশো হাজার ডলার?

আমি এত দিতে পারবো না।

—পারবেন না? তবে এই আমার শর্ত মিসেস হ্যামেল, আর টাকাটা আপনি কী ভাবে যোগাড় করবেন সেটা আপনার দায়িত্ব। রাস হ্যামেলের স্ত্রীর কাছে ঐ টাকাটা কিছুই নয়। তিনি দিতে পারবেন না, তা আমি বিশ্বাস করি না।

একটু থেমে আবার বলি, শুধু মনে রাখবেন মিসেস হ্যামেল, শনিবার সকালে আমি মিঃ পামারের কাছে রিপোর্ট পাঠাবো।

হ্যাঁ, সে কথা তো আপনাকে বলেছি। সুতরাং শুক্রবার ঠিক এ সময় টাকাটা নিয়ে হাজির হবেন! নইলে দ্বিতীয় রিপোর্টটা আমি মিঃ পামারের হাতে তুলে দিতে বাধ্য হবো! এ ছাড়া তখন আর আমার করণীয় কিছু থাকবে না।

আমি আবার বলি, এ কথা শুনে প্রোফারির কাছে গিয়েও কোন লাভ হবে না। সে শুনে হলেও তাকে আমি আদৌ ভয় পাই না। কারণ ওদের মত লোকদের নিয়েই তো আমার কারবার। আর আমার প্রথম সাক্ষাৎকারের কাহিনীটা ইচ্ছে করলে প্রোফারির কাছ থেকে জেনে নিতে পারেন। অবশ্য জিজ্ঞেস করার হয়তো প্রয়োজন রাখেন না। সে কথা সে নিশ্চয়ই বলেছে।

ন্যান্‌সি আমার কথায় কোন উত্তর দেয় না। আগের মতন ফ্যাকাসে মুখ করে বসে থাকে এবং তাকে খুব বিমর্ষ দেখায় আর যেন সে একরাশ চিন্তায় মাঝে ডুবে রয়েছে. অন্তত তার মুখের ভাব ভঙ্গি সে কথা বলছে।

আমি ফের বলি, দ্বিতীয় রিপোর্টের একটা কপি আমার অ্যাটর্নির কাছে রাখা আছে। আমার কিছু হলে সেই রিপোর্টটা পুলিশের বড়কর্তার টেবেলের

কাছে দেবে। তাকে সেইরকম নির্দেশ দেওয়া আছে। আশা করি আমার কথার গুরুত্বটা বুঝতে পারছেন।

ন্যানসি এবারও নিরুত্তর। অশান্তভাবে বাঁ পাটা মেঝেতে ঘসে চলেছে।

—আর সামান্য একশো হাজার ডলারের জন্য নিশ্চয়ই দশ বছর জেলে যেতে চাইবেন না এবং সেটা মিঃ হ্যামেলের স্ত্রীর পক্ষে ভালোও দেখাবে না।

ন্যানসির সেই একই প্রতিমূর্তি। সে আমার দিকে তাকায়। তাকে দেখে কোন মোমের মূর্তির কথা মনে পড়লো। আর সহসা সে যেন বোবা হয়ে গেছে। ভাবি, বিপদে পড়লে, এদেরও এমন অবস্থা হয়।

—চলি, আবার আমাদের দেখা হবে, আমি ন্যানসির কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে আসি। এবং আমি এক রকম নিশ্চিন্ত যে, ওর কাছ থেকে আমি টাকাটা আদায় করতে পারবো। তার জন্যে বেশী বেগ পেতে হবে না। কারণ অনেকটা বোঝাপড়া তো হয়ে গেছে।

বন্দর এখন প্রাণ চঞ্চল। ভিড়ের মধ্যে গাড়ি নিয়ে আমি আস্তে আস্তে এগিয়ে চলেছি। লক্ষ্য ক্লাব কোর্ট।

বন্দর অতিক্রম করে গাড়িটা নিয়ে একটা অন্ধকার গলিতে ঢুকলাম। খুঁজতে হলো না। তবে আমার কপাল মন্দ। হঠাৎই আমার সঙ্গে টমের দেখা হয়ে যায়। এ সময় তার সঙ্গে দেখা হোক সেটা আমি আদৌ চাইনি। এড়িয়ে যে যাবো তা সম্ভব হয়নি। একবারে যাকে বলে মুখোমুখি দেখা।

টম বলে, এই যে বার্ট!

আমাকে একান্ত অনিচ্ছা সত্বেও গাড়ি থামাতে হলো এবং মেকী ভদ্রতার মুখোশ এঁটে বলতে হলো, এই যে টম, এদিকে কোথায় চললে?

—সেই কেসটার ব্যাপারে।

—কাউকে ধরতে পারলে বা সন্দেহ?

—উঁহু।

—তবে তো চিন্তার কথা, কারণ আমার দৃঢ় বিশ্বাস এ ঘটনার মধ্যে প্রোফারিরা জড়িত। তাই কিছুটা যে আমার আগ্রহ নেই তা বলা চলবে না।

—সত্যিই তাই, আর এটা আমার ঘাড়ে এসে পড়েছে।

—কারণ তুমি ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলে।

—হ্যাঁ, আর এই কেসটার এখনো কোন সুরাহা হলো না। বুঝতে পারছি না পেটে আর ঐ চোদ্দ বছরের ছেলেটাকে কে খুন করতে পারে।

—আমি এ ব্যাপারে লু-এর সঙ্গে কথা বলেছি।

—কথা বলেছো? টম আগ্রহ প্রকাশ করে।

—সে কী বললো?

—মনে হয় পুরনো বিশ্বেষর পরিণতি, আর ছেলেটা তখন উপস্থিত ছিল তাই সাক্ষীকে কেই বা বাঁচিয়ে রাখে। তাই জোরাকে প্রাণ দিতে হলো।

—হয়তো তোমার কথাই ঠিক, টম মাথা নাড়ে। তবে তাকে খুব গম্ভীর দেখাচ্ছে। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বলে, তা এদিকে কোথায় চললে ?

—আমিও এদিকে একটা কেসের ব্যাপারে ঘোরাঘুরি করছি। চলি। বেস্ট অফ লাক।

—বার্ট, এক মিনিট। লু-এর ধারণা, প্রোফারি এখানে নেই।

হতে পারে, প্রোফারির কথা শুনে আমার বুকের মধ্যে কম্পন জাগে। ভাবি, কোন শুভক্ষণে ওর সঙ্গে আমার এভাবে হঠাৎ দেখা হয়ে গেল !

—কিন্তু আমার মন অন্য কথা বলছে।

—এ খুনগুলো তারই।

—আমি এ ব্যাপারে কিছু বলতে পারছি না।

—তোমার কথা আমার মনে থাকবে, আর আমি যদি কিছু জানতে পারি সবচেয়ে আগে তোমায় গিয়ে জানিয়ে আসবো, এই বলে আমি টমের কাছ থেকে বিদায় নিই।

বেশ কিছুক্ষণ ঘোরাঘুরির পর লরস্টার কোর্ট খুঁজে পেলাম এবং দু' নম্বর বাড়িটার অস্তিত্ব খুঁজে পেতে আর কোন অসুবিধে হয় না।

সঠিক বাড়ি বুঝতে পেরে আমি কাঠের নড়বড়ে সিঁড়ির উপরে উঠতে থাকি, আর সিঁড়িতে পা দেওয়ার সংগে সংগে ভাবছিলাম, এই বুঝি সিঁড়ির ধাপগুলো খসে পড়ে গেল। তবু আমি সাবধানে পা ফেলতে থাকি।

যেতে যেতে যে শব্দগুলো কানে এলো সেগুলো হলো, জোরে চালানো টি. ভি-র আওয়াজ, একজন স্ত্রীলোকের গালাগালি, একটা বাচ্চার কান্না আর একটা কুকুরের চিৎকার।

অবশেষে আমি উপর তলায় হাজির হোলাম। সামনে একটা দরজা। সেখানে এত প্রচণ্ড রোদ যে ডিম ফাটিয়ে রাখলে ওমলেট হয়ে যাবে। আমার বুক আর ঘাড় বেয়ে দরদর করে ঘাম নামতে থাকে।

দরজাটায় কয়েকবার টোকা মেরে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে থাকি। কিছুক্ষণ পরে দরজাটা খুলে গেল। দেখি, জয় দরজার কাছে দাঁড়িয়ে।

—এই যে জয়! উঃ, কী গরম বলতো ! বলে আমি ভেতরে ঢুকলাম।

ভেতরে ঢুকে ঘরের চারিদিকে তাকাই। তিনটে বিছানা বাঁ দিকের দেয়াল ঘেঁষে একটা টেবিল। তার সামনে তিনটে চেয়ার। আর উত্তর দিকে মিড সেফের উপর পুরনো একটা রেডিও। তার ঢাকনাটা ছেঁড়া।

—জয়, কোন খবর আছে ?   আমি গিয়ে এবার জানলার কাছে দাঁড়াই।

—জিংবো ওদের উপর নজর রাখছে।

—ওরা এখন কোথায় আছে ?

—ঐ বারেই আছে।

—ঠিক জানো তো ?

—হ্যাঁ।

—ওরা হয়তো ওখান থেকে চলে যেতে পারে।

—আচ্ছা. জয় মাথা নাড়ে।

—ভালো করে নজর রেখো। যদি যায় তবে কোথায় গেল, তা কিন্তু আমি জানতে চাই।

—ঠিক আছে, বলে একটা দশ পাউন্ডের বিল দিই। খুশী তো ?

—হ্যাঁ, আর আমি এখনই গিয়ে জিংবোকে সব বলে আসছি।

—সাবধানে চলাফেরা করো।

এ কথায় জয়ের হাসি মিলিয়ে গেলেও পরমুহূর্তে একটা হিংস্র ভাব ফুটে ওঠে। বলে, ওরা টমিকে খুন করেছে। আমাকে আর জিংবোকে কিছুই করতে পারবে না।

—তবুও জয়, সাবধানের মার নেই। ওরা সাংঘাতিক। ওদের স্বার্থে ঘা পড়লে সব করতে পারে। চলি জয়।

গাড়ি করে 'ওসান ক্রোমেনেডের' দিকে চলেছি। এখন লাঞ্চের সময়। ক্ষিদে পেয়েছে। কিছু খাওয়া দরকার।

খেতে খেতে ভাবি একশো হাজার ডলার ? কী করে এত ডলার দিবে ? অবশ্য এটা পেলে কর্নেলকে প্রথম রিপোর্টটা দিতে হবে। সে দেবে পামারকে। আবার পামারের মাধ্যমে এটা গিয়ে হ্যামেলের কাছে পৌঁছবে। আর তার যদি মাথা খারাপ না হয়ে থাকে, অথবা সে আর এ নিয়ে মাথা ঘামাবে না।

তারপর ভাবি, অনেকদিন কোন ছুটি নেয়নি। সুতরাং আমার অনেক ছুটি জমে রয়েছে। ক'দিন ছুটি নিলে বেশ হয়।

আমি অনেক দিন ধরে ভাবছি, ইয়াট ভাড়া করে বিলাস-ভ্রমণে বেরুবো। সঙ্গে অবশ্যই বার্বা থাকবে।

হঠাৎ একটা বাজে চিন্তা মাথায় এলো। সঙ্গে সঙ্গে ছুটি নেবার কথা যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেল। আর ইয়াটটাও যেন হাতছানি দিয়ে দূরে সরে যেতে থাকে।

ভাবি, যদি ন্যান্সি শুক্রবার টাকাটা নিয়ে না আসে ? তাহলে ? তখন আমার করণীয় কী থাকবে ? সত্যি এটা একটা ভাববার কথা।

তারপর ভাবি, যদিও বা ন্যান্সি এলো। বললো, আপনি যা খুশী তাই করতে পারেন এবং আমিও তাই যা খুশী তাই করবো। মোট কথা আপনাকে আমি টাকা দিতে পারবো না।

এ কথা ভাববার পর আর খাবারের দিকে মন দিতে পারলাম না। খাবার যেন বিস্বাদ লাগছে। খাবারের প্লেট সরিয়ে একটা সিগারেট ধরাই। ভেবে দেখি, ন্যান্সিকে চাপ দেবার মত অবস্থা নেই। সে যেমন ঝামেলায় রয়েছে, তেমনি আমিও। আর সে দু'জন খুনীকে লুকিয়ে রেখেছে এবং আমি আমার মুখ বন্ধ রেখে একই অপরাধ করছি। সুতরাং এ অবস্থায় পুলিশ ডেকে ভয় দেখানোর উপায় নেই। আর পুলিশ ডাকার ঝামেলাও আছে। সে পুলিশকে বলে দেবে, আমি তাকে একশো হাজার ডলার দেবার জন্য চাপ দিয়েছি। এখন পুলিশ আমায় সহজে ছাড়বে না। আর তারা প্রথমেই যে প্রশ্নটা করবে তা হলো, প্রোফার্গি কোথায় লুকিয়ে আছে। আর এ খবর আমি জানার সঙ্গে সঙ্গে কেন তাদের জানাইনি।

এর কোন সদোত্তর নেই। এসব চিন্তা করে আমি রীতিমতন ঘেমে উঠেছি। শুধু মনকে সান্ত্বনা দিয়ে বললাম, ন্যান্সি তো আসতেও পারে। একেবারে যে আসবে না তা বলা যাবে না। আর অনেক হিসেব করে দেখলাম, আসা আর না আসার মধ্যে চান্স ষাট এবং চল্লিশ!

কিছুক্ষণ আগে ইয়াটে বসে স্যাম্পেনের কর্ক খোলার যে স্বপ্ন দেখছিলাম, তা মিলিয়েই গেছে! তারপর হ্যামেলের কথা চিন্তা করি, চিঠিগুলো ওর লেখা শুনে বেশ ধাঁধায় পড়ে গেলাম।

এবার ন্যান্সির কথা ভাবি। ও যেভাবে দৃঢ়তার সঙ্গে চিঠিগুলোর কথা বললো তাতে আবার অবিশ্বাসও করতে পারছি না। এবং ওয়ালডো কারমাইকেল তার গল্পের নায়ক। আর এসব করার আসল উদ্দেশ্য হলো ডিটেকটিভ ভাড়া করা।

আমি ব্যাপারটা নিয়ে খুব গভীরভাবে চিন্তা করতে থাকি। একজন লেখক কীভাবে গল্প লেখে তা আমি জানি না। কিন্তু মনে হচ্ছে, এই রকম একটা ব্যাপার হ্যামেলের গল্পে রয়েছে। সুতরাং বাস্তব জীবনে এটা নিয়ে কেমন ঘটবে এবং কেমন রিপোর্ট হয়, সে হয়তো তা জানতে চেয়েছে। সেইজন্য তার স্ত্রীকে টোপ হিসেবে ব্যবহার করেছে এই ভেবে যে, তার স্ত্রী নির্দোষ। কিন্তু নিজের অজান্তে এমন একটা ঢাকনা খুলে বসে আছে যার মধ্যে বিষাক্ত পোকা কিলবিল করছে।

এই প্রথম পার্সেল এজেন্সীতে আমার কোন কাজ নেই। আবার 'কান্ট্রি ক্লাবে' গিয়ে ন্যান্সির উপর নজর রাখার কোন মানে হয় না। ভাবি, সারা দুপুরটা কাটিয়ে পড়ন্ত বেলায় এসে এমন একটা ভান করবো যেন সারাদিন

ন্যান্‌সির উপর নজর রেখে ফিরে এলাম।।

তারপর বিকেলটা কি ভাবে কাটাবো ভাবছি, তখনই হঠাৎ মনে পড়লো, পার্নেল এজেন্সী'তে আমাকে ছাড়া আরো উনিশ জন অপারেটার রয়েছে। সুতরাং আমার কেউ যদি বিপদে ফেলতে চায় অনায়াসে তা সে করতে পারবে। আর করলে এটা মোটেই সুখের হবে না। আর যেহেতু আমি আর চিক এখানকার সেরা, তাই অন্যরা এই সুযোগ নিয়ে আমার পিছনে ছুরি চালাতে পারে। তাই এখন একান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমায় 'কান্‌ট্রি ক্লাবে' গিয়ে বসে থাকতে হলো।

ওখানে বসে চারদিকে তাকাই, কিন্তু ন্যান্‌সির কোন পাত্তা নেই। হঠাৎ দেখলাম, আমাদের এজেন্সীর একজন অপারেটার ল্যারি কেসার এখানে এসেছে।

চোখাচোখি হতে ল্যারি আমার দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নেয়। তাতে মনোক্ষুণ্ণ হোলাম। ভাবি, ও চায় না যে আমি এখন ওর সঙ্গে কথা বলি। আর আমার মনে হয়, ও-ও কারুর উপর নজর রাখতে এখানে এসে হাজির হয়েছে। এর কিছুক্ষণ পরে সে এখান থেকে চলে যায়।

আরো কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর পিছনের একটা পথ ধরে এসে গাড়িতে উঠলাম। এখন যাই ঘটুক না কেন, অন্তত ল্যারি সাক্ষী দেবে, আমি এখানে এসেছিলাম।

তাই কিছুটা নিশ্চিন্ত মনে এখান থেকে গাড়ি চালিয়ে বন্দরের দিকে এগিয়ে যাই এবং বন্দরে এসে দেখি, হ্যামেলের ইয়াটটার কোন চিহ্ন নেই।

অ্যালবার্নি'কে আমি দেখতে পেয়ে তার দিকে এগিয়ে যাই, এই যে অ্যাল, এখন বীয়ার খাবে।

—মিঃ এন্ডারসন, বীয়ার খাবার কোন নির্দিষ্ট সময় আছে নাকি! বলে অ্যালবার্নি' হাসে।

তারপর আমরা 'নেপচুন' বারে গিয়ে দুটো বীয়ার নিয়ে বসলাম। এরপর বীয়ারে চুমুক দিয়ে অ্যালবার্নি'কে জিজ্ঞেস করি, মিসেস হ্যামেল কী তার ইয়াট নিয়ে চলে গেছে?

—হ্যাঁ।

—কতক্ষণ আগে?

—তা প্রায় ঘণ্টাখানেক আগে, ইতিমধ্যে অ্যালবার্নি' প্রথম বোতল বীয়ার শেষ করে দ্বিতীয় বোতলে চুমুক দেয়।

—তখন সঙ্গে আর কেউ ছিল?

—জোন্স।

—অন্য কেউ?

—উঁহু।

—এখন পেটের ব্যাপারে টম বুঝতে কিছুই পারছে না। তোমার কী মনে হয়?

—ঐ বোকা পুলিশটা?

—ওর ব্যাপারে দয়া করে আমায় কিছু জিজ্ঞেস করবেন না। পেটেকে আমি ভালোবাসতাম। সে অন্যের ব্যাপারে নাক গলিয়েছিল, তাই তাকে এভাবে যেতে হলো।

—এ বন্দরে যা কিছু ঘটে তা আমি জানি এবং এও জানি, কখন মুখ খুলতে হবে।

—এই কথা বলার পর অ্যালবার্নি'র বীয়ার শেষ হয়ে যেতে সাম আবার বোতল দিয়ে যায়। তারপর অ্যালবার্নি' বীয়ারে চুমুক দিয়ে নিচু গলায় বলে, অ্যালফানসো ডিয়াজের উপর বেশী আগ্রহী হয়ে পড়েছিল। আর ডিয়াজ খুব বাজে লোক।

—কিসের আগ্রহ অ্যাল?

—তা আমি জানি না।

তবে অতীতের কথা আমি ভুলে যাইনি। তাই অ্যালবার্নি' সরাসরি 'না' বলে দিতে ততটা বিচলিত হয়নি। কারণ বীয়ার ফুরিয়ে গেছে, ওর কথাও শেষ। আবার বীয়ার দিলে হড়মড় করে ওর মুখ দিয়ে কথা বেরিয়ে আসবে আর খাবার দিলেও একই কথা।

বলি, অ্যাল এরপর তোমায় লঙ্কার চাটনিটা কেমন লাগবে?

একথা শুনে অ্যালবার্নি' আমার দিকে তাকিয়ে হাসে, মিস্টার এন্ডারসন, আপনি তো আমার দুর্বলতা জানেন।

তারপর অ্যালবার্নি' আমার অর্ডারের অপেক্ষায় না থেকে নিজেই আগের মত সামকে ডেকে এক প্লেট লঙ্কার চাটনির অর্ডার দেয়।

এই খাবারের কথায় মনে পড়ে, আমি একবার বোকার মতন খেয়ে নাকের জলে চোখের জলে এক হয়েছিল। সেই থেকে এই খাবার দেখলে সাত হাত দূরে থাকি।

ওদিকে অ্যালবার্নি' নির্বিকার চিত্তে একটু একটু করে লঙ্কার চাটনি খেয়ে যাচ্ছে এবং সেই ঝাল এড়াবার জন্য বীয়ারে একটা দীর্ঘ চুমুক দেয়।

—মিঃ এন্ডারসন, আপনি কী জোন্স সম্বন্ধে এখনো আগ্রহী? বলে অ্যালবার্নি' নিজের বুকে হাত বোলাতে থাকে। আমি ওর সম্বন্ধে আপনাকে কিছু বলবো।

অ্যালবার্নি' গলার স্বর নিচুতে নামিয়ে বলে, আগে জোন্সের সঙ্গে হ্যামেলের প্রথমা স্ত্রী গ্লোরিয়া কোর্ট খুব ফুর্তি করে বেড়িয়েছে এবং এ ব্যাপারটা ঘটেছে ডিয়াজের আগে। আর এখনো ওরা খুব ঘনিষ্ঠ।

—তার মানে তুমি বলছো, হ্যামেলের সঙ্গে বিয়ের পরও সে আর জোন্স···।

—হ্যাঁ, সেই নাবিকটা, আর এ সব হয়েই থাকে। বলে অ্যালবার্নি একটা অর্থপূর্ণ ইঙ্গিত করে।

—আচ্ছা, তারপর আমি ওর লক্ষার চার্টানির প্লেটটা সরিয়ে বলি। তুমি কী এখনো ভাবো, হ্যামেলের দ্বিতীয় স্ত্রী ন্যান্সিও জোন্সের উপর আকৃষ্ট এবং তাকে পছন্দ করে।

—না স্যার, অ্যালবার্নি একটু ঝুঁকে বলে। সেই মহিলা আদৌ এ রকম নয়। সে খুব ভালো। তার সম্বন্ধে এসব কিছুই জানা যাইনি। সেরকম কিছু ঘটলে আমি নিশ্চয়ই জানতাম। কারণ আমার চোখ সর্বত্র রয়েছে।

তারপর আমি ঘড়ির দিকে তাকাই। এখন ছ'টা বাজে। বলি, চলি অ্যাল। আবার দেখা হবে।

নিশ্চয়ই স্যার, অ্যালবার্নি আমার আমার হাতাটা চেপে ধরে আর ধন্যবাদ দেয় ওদের খাবারের জন্য। সে বলে স্যার, আমি যা বলেছি তা মনে রাখবেন। ওদের কাছ থেকে একেবারে দূরে থাকবেন।

আমি মাথা নেড়ে আস্তে আস্তে বন্দরের দিকে যেতে থাকি। ইতিমধ্যে হ্যামেলের ইয়টটাকে বন্দরের দিকে আসতে দেখলাম।

আমার দৃষ্টি এখন ন্যান্সির দিকে। সে ডেকে দাঁড়িয়ে আছে। এবং জোন্স ইয়ট চালাচ্ছে।

ওদের দেখামাত্র সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে বন্দরের ভিড়ের মাঝে মিশিয়ে দিয়ে দ্রুত হেঁটে আমি ম্যাসারে গিয়ে বসি এবং আমি চাই, ন্যান্সি আমায় দেখুক।

তারপর আমি অফিসে ফিরে আসি। কেরীর কাছে গিয়ে জানতে পারি কর্নেল আমায় ডাকছে এবং জরুরী ব্যাপারে।

আমি কেরীকে বলি, কেরী, কোন বাজে খবর আছে ?

—নিজেই গিয়ে জিজ্ঞেস করো না ! কেরী মুখ ঝামটা দেয়। আর বলে, তাড়াতাড়ি যাও তো !

তারপর আমি কর্নেলের চেম্বারে মৃদু করাঘাত করে ঢুকে বলি, আমি স্যার।

কর্নেল নিজের চেয়ারে বসে আছে এবং তার দৃষ্টি একটা ফাইলের দিকে। তারপর সে দৃষ্টি ফাইলের উপর থেকে সরিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বলে হ্যামেলের ব্যাপারে নতুন কোন খবর আছে ?

—কিছু না স্যার, আমি মাথা নাড়ি। একেবারে নেই। আমি আজ সকালে মিঃ পামারের সঙ্গে কথা বলেছি। আর তাঁকেও জানিয়েছে, রিপোর্ট করার মত একেবারে কিছুই নেই।

—তোমার কথা শুনে সে কী বললো ?

—তিনি এর একটা পূর্ণ বিবরণ চান এবং মিঃ হ্যামেলকে বোঝাবেন যে, ব্যাপারটার এখানেই ইতি টানুন।

—কিন্তু তুমি নিশ্চিত যে, মিসেস হ্যামেল কোনরকম আজেবাজে ব্যাপারে নেই?

—না স্যার।

—কোন লোকের সঙ্গে ঘনিষ্টভাবে জড়িয়ে পড়েছে? কথাটা বলে কর্নেল তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকালো, যেন আমার অন্তর আত্মাটা দেখে নিতে চাইছে।

—স্যার, আমি এইটুকু বলতে পারি, মিসেস হ্যামেল কোন ব্যাপারে নেই এবং অন্য কারুর সঙ্গে ফষ্টি নষ্টিও করছে না। এবং এ কথা ঠিক, দুপুরের দিকে তিনি যখন ইয়াটে করে বেরিয়েছিলেন তখন আমি তাঁকে অনুসরণ করতে পারিনি। কিন্তু আগের বার যখন হ্যালিকপ্টারে করে তাঁর পিছু নিয়েছিলাম তখন তাঁকে শুধুই মাছ ধরতে দেখেছি। তাই ওঁর ব্যাপারে আমি পুরোপুরি নিশ্চিত। আর মিঃ হ্যামেল আজেবাজে চিঠি পেয়ে শুধু শুধু হতাশায় ভুগছেন।

—তুমি তোমার রিপোর্ট মিস্টার পামারের কাছে পাঠিয়ে দাও।

—ও হ্যাঁ, কেরী বলছিল, তোমার নাকি ছুটিতে যাবার ইচ্ছা হয়েছে?

—হ্যাঁ স্যার।

—ঠিক আছে, কালই বেরিয়ে পড়ো এবং সময়টা ভালোই কাটাও।

—ধন্যবাদ স্যার।

এখান থেকে বেরিয়ে এসে অফিসে হাজির হই এবং প্রথম রিপোর্টটা টাইপ করি, যেটা আমি ন্যান্‌সিকে দেখিয়েছিলাম। আর দ্বিতীয় রিপোর্টটা যেটা ন্যান্‌সির পক্ষে ক্ষতিকর হতে পারে, সেটা ব্যাগ থেকে বার করে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ওয়েস্ট পেপার বক্সে ফেলে দিই।

তারপর আমি আবার কেরীর কাছে হাজির হই, কেরী, এটা পামারকে পাঠিয়ে দেবে। আমার ছুটি শুরু হলো।

—জানি।

—আর তুমি যদি বলো, এটা আমার পক্ষে একটা সুসময় তাহলে আমি হয়তো কেঁদেই ফেলবো।

—এসব বাদ দিয়ে ছুটি কাটিয়ে ঠিক দিনে এসে অফিসে জয়েন্ট করবে, বলেই কেরী আমার রিপোর্টটা পড়তে থাকে।

—চলি কেরী, বলে আমি এডওয়ার্ডের ঘরের দিকে পা বাড়াই। এখান থেকে আমার মাসের মাইনে এবং ছুটির টাকা নিতে হবে। ভাবি, আমি আবার বড়লোক হয়ে গেলাম।

এডওয়ার্ডের অফিস হয়ে আবার আমার ঘরে ফিরে আসি। এসে দেখতে পাই, চিক বসে আছে, এবং আমি ঘরে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে হাত বাড়িয়ে বলে, আমার পঞ্চাশ ডলার ফেরত দাও।

—এই নাও।

—তা যাচ্ছো কোথায়, চিক পঞ্চাশ ডলারের বিলটা পকেটে রাখতে রাখতে বলে।

—আমি এই টাকা নিয়ে আর কোথাই বা যেতে পারি! শুধু মেয়েদের সঙ্গে গল্প করবো। আর ফুর্তি করবো?

—পথে এসো বন্ধু!

এরপর চিক চেয়ার ছেড়ে উঠে বলে, যাক্ বার্ট, ফুর্তি করো। কিন্তু সব টাকা যেন খরচ করে বসো না!

তোমার উপদেশ আমার মনে থাকবে, আর কিছু টাকা তো খরচ হবেই, বলে আমি চেয়ারে বসি। এবং ড্রয়ার খুলে স্কচের বোতলটা বার করে চিকের দিকে তাকিয়ে বলি, যাবার আগে গলাটা একটু ভিজিয়ে নাও।

একদম সময় নেই। ভীষণ তাড়া আছে।

বলেই চিক দরজার দিকে এগিয়ে যায়। সহসা যেতে যেতে চিক দরজার কাছে থেমে যায় এবং আমার দিকে ঘুরে তাকায়, ও হ্যাঁ, তোমায় বলতে একেবারে ভুলে গেছি। তোমার একটা খবর আছে।

এই কয়েক ঘণ্টা আগে এফ. বি. আই. থেকে এই সীল করা খামটা এসেছে। এতে কোল্ডওয়েল কি লিখেছে?

আমি খামটা নিয়ে মিথ্যে করে বলি, সে আমায় বলেছিল, নৌকা ভাড়ার ব্যাপারে আমার সাহায্য করবে।

নৌকা?

ডুবে মরো না যেন! বলে চিক বেরিয়ে যায়।

আমি এ কথার জবাব দেবার কোন প্রয়োজন বোধ করলাম না। আমি যেন এখন ঘামছি। আর একটা চাপা উত্তেজনা বোধ করতে থাকি। তারপর আস্তে আস্তে চিঠিটা খুলি। বড় চিঠির সঙ্গে একটা মেয়ের রঙ ছবি রয়েছে।

চিঠিতে লেখা আছে—

প্রিয় বার্ট,

তোমায় আমি সেদিন বলেছিলাম, অ্যাঞ্জেলো প্রোকারির স্ত্রী লুসিয়া প্রোকারির চিঠি পাঠিয়ে দেবো। এই হলো সেই ছবি। এর প্রতি কড়া নজর রেখো।

কিছু খবর পেলে সঙ্গে সঙ্গে আমায় জানাতে ভুলবে না। আমি এইরকম কোন খবরের আশায় অপেক্ষা করতে থাকলাম।

প্রীতি ও শুভেচ্ছা রইলো। ইতি

এল. এম.

এবার আমি চিঠির দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে ছবিটার দিকে তাকাই। মেয়েটির বয়স চব্বিশ পঁচিশ হবে। মাথায় একরাশ সোনালী চুল এবং ছবি থেকে যেন তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে আছে।

ছবিটা দেখে একটা যেন শক পেলাম। ওর চুল যদি কালো হতো তাহলে আমি শপথ করে বলতে পারতাম, ও মিসেস হ্যামেল না হয়ে কিছুতেই যায় না।

তারপর টেবিলের উপর থেকে একটা পেন তুলে নিয়ে ওর চুলে বোলাতে থাকি। এক সময় রং বোলানো শেষ হলো। এখন আমি নিঃসন্দেহ যে, এই মহিলা দুটো খুনের দায়ে অভিযুক্ত এবং সে একজন সন্ত্রাসবাদীকে বিয়ে করেছে। সে আর কেউ নয়। সে হলো মিসেস ন্যান্সি হ্যামেল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ফেনি ব্যার্টাল 'দ্য প্যা রাডাইস সিটি হ্যারল্ড' পত্রিকার একজন কেরানী। সে সাধারণতঃ রাতের বেলায় কাজ করে এবং সে আমার বিশেষ পরিচিত।

আমি অফিসের বড় ঘরটায় পা দিতে ফেনি আমার দিকে তাকায়। এই ঘরটায় ফাইল, খবরের কাগজ, লোহার আলমারি এবং নানা রকম ছবিতে বোঝাই। আর এগুলো রয়েছে যবে থেকে এই পত্রিকার জন্ম হয়েছে।

পার্সেল এজেন্সীর অপারেটাররা এখানে মাঝে মাঝে আসে। ফলে সকলের সঙ্গে ফেনির হৃদ্রতা গড়ে উঠেছে।

ফেনি মেয়েটি বেশ প্রানোজ্বল। সে তার কাজ সম্বন্ধে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল। এবং কোন কাজে তার কাছে গেলে সে সব সময় সাহায্য করতে প্রস্তুত।

—হাই বার্ট! ফেনি মিষ্টি করে হেসে আমার দিকে তাকায়।

—তুমি এখনো কাজ করে যাচ্ছো!

—না বিশ্রাম নিতে এসেছি। কোথায় জানো তোমার টেবিলে।

—আমি বিশ্বাস করি না, ফেনি আবার হাসে। নিশ্চয়ই আমার কাছে কোন কাজে এসেছো।

—ঠিক ধরছো।

—ছোট একটা কাজে। কাল থেকে আমি ছুটিতে যাচ্ছি।

—তাই নাকি তা যাচ্ছো কোথায়?

—আপাতত তোমার টেবিলে। হ্যাঁ শোন, যাবার আগে একটা ছোট্ট কাজ সেরে যেতে চাই।

—বলো, তোমার জন্য কি করতে পারি।

—আমি লেখক হ্যামেল সম্বন্ধে জানতে চাই?

—হ্যামেল ন্যান্সিকে কোথায় বিয়ে করেছে?

—এটা কোন সমস্যাই নয়। তুমি বসো।

ফেনি ডেস্কের কাছে এগিয়ে যায়। তুমি যা চাইছো, তা আমি নিয়ে আসছি।

ফেনি এইরকম স্বভাবেরই মেয়ে এবং এর জন্য ও সবার প্রিয়। আর সবচেয়ে বড় কথা, ও কোন ব্যাপারে অহেতুক আগ্রহ প্রকাশ করে না।

আমি চেয়ারে বসে একটা সিগারেট ধরাই এবং ফেনির জন্য অপেক্ষা করতে থাকি।

ফেনি ওখানে গিয়ে একটা ফাইল টেনে বার করে একটা কার্ড টেনে আনে। তারপর ওর থেকে সে নির্দিষ্ট ফোলিওটা এনে আমার হাতে দেয়।

আমি তারপর ফেনিকে বলি, এই সুখী দম্পতির কোন ছবি আছে? থাকলে ভালো হয়।

—এক মিনিট, বলে ফেনি একটা স্টীল আলমারি খুলে একটা খাম বার করে এনে আমার সামনে ধরে।

—ফাইন! আমি ফেনিকে ধন্যবাদ জানাই।

—ফেনি ইতিমধ্যে তার টেবিলে ফিরে গেছে। এখন সে দারুণভাবে কাজে মন দিয়েছে।

আমি এখন ছবিটার দিকে তাকিয়ে। রাফ হ্যাবেলের গোল মুখ। দারুণ চেহারা। সুপুরুষ। মাথার কিছু চুল পাকা। এবং তার চাউনির মধ্যে একটা গর্ব ও অহংকারের ভাব ফুটে উঠেছে, যাতে বোঝাচ্ছে সে তার উন্নতিতে সুনিশ্চিত।

তারপর আমি ন্যান্সির দিকে তাকাই। সে চোখে একটা সানগ্লাস পরে রয়েছে, যা দিয়ে সে তার চোখ ঢাকতে সক্ষম হয়েছে। ফলে রাস্তা-ঘাটে হুট করে কেউ তাকে দেখে ফেললেও এই ছবি থেকে কেউ তাকে চিনতে পারবে না।

এরপর আমি ওদের প্রসঙ্গে খবরের কাগজের জায়গাটা পড়তে থাকি। তাতে একটা সাক্ষাৎকারে হ্যাবেল, তার সঙ্গে ন্যান্সির প্রথম পরিচয় হয় রোমে এবং এই পরিচয়ের দু'মাস পরেই তারা বিয়ে করে। তবে বিয়ের ব্যাপারে ন্যান্সি একটু চাপা ছিল। তবে সে নিয়ে সে মাথা ঘামায়নি। সে নিজেই উদ্যোগী হয়ে বিয়েটা সেরে নেয়।

তারিখটা দেখে ভাবি, আজ থেকে আট মাস আগে ওদের প্রথম সাক্ষাৎকার হয়েছে। তারপর আমার কোল্ডওয়েলের কথা মনে পড়ে। সে বলেছিল, লুসিয়া প্রোফারির সঙ্গে আঠারো মাস আগে খুন করার ব্যাপারে জড়িত ছিল।

তারপর আমি একটা কথা ভেবে চমকে উঠি। সে প্রোফারিকে বিয়ে করার পর হ্যাবেলকে বিয়ে করলো? সে কী হ্যাবেলকে বিয়ে করলো ইতালি থেকে খুনের অপরাধে বেরিয়ে আসার জন্য?

এটাই এখন আমার একমাত্র ধারণা, আর কেই বা ভাবতে যাবে, হ্যাবেলের স্ত্রী একজন সন্ত্রাসবাদী, যাকে পুলিশ ভীষণভাবে খুঁজে বেড়াচ্ছে।

আর কিছু জানার নেই। যা জানার তা আমার জানা হয়ে গেছে। তাই আমি চেয়ার ছেড়ে উঠে ফেনির দিকে ফাইল এবং খামসুদ্ধ ছবি এগিয়ে

দিয়ে বলি, আবার দেখা হবে কোন। চলি। বলে একটা চুমু তার দিকে ছুড়ে দিই।

আমি এসে আমার ম্যাসারে বসেছি এবং কী করবো ভাবছি। ভাবি কাল দুপুরে আমার সঙ্গে ন্যান্সির 'কার্নোট ক্লাবে' দেখা হওয়ার কথা। আশাবাদী হয়ে ভাবি, ওর কাছ থেকে টাকাটা বার করে আনতে পারবো।

সেই সঙ্গে আর একটা কথা ভাবি, ওর এখন টাকা না দিয়েও উপায় নেই। ওকে আমি এখন কব্জায় পেয়েছি। তাই ওর উপর জোর খাটিয়ে বললো, তুমি ন্যান্সি নাও। তখন ও নিশ্চয়ই অবাক হয়ে যাবে। বিস্ময়ের ভান ফুটিয়ে তুললো। হয়তো কেন নিশ্চয়ই আমাকে 'পাগলের' আখ্যা দিতেও ছাড়বে না। তা বলুক, তবু আমায় যেন তেন প্রকারে প্রমাণ করতে হবে ওই লুসিয়া প্রোফারি, ন্যান্সি হ্যামেল নয়। তারপর সে একান্ত বাধ্য মেয়ের মত সুড়-সুড় করে টাকা ঢালতে বাধ্য হবে।

আবার মনের মাঝে চিন্তা এসে যায়। নতুন চিন্তা সম্বন্ধে আমায় বেশ ভালো ভাবে চিন্তা করতে হবে এবং এ চিন্তাটা আমায় বেশ আনন্দ দেয়।

তারপর ভাবি, এখন আর কোথাও যাওয়া নেই। বাড়ি ফিরবো। ফলে উঠে দাঁড়িয়ে চলতে থাকি।

আমি গাড়ি চালিয়ে দিয়েছি। তবু পথের মাঝে আমায় একবার থামতে হলো এবং একটা বার থেকে এক প্যাকেট স্যান্ডউইচ কিনে নিলাম।

দাম মিটিয়ে দিয়ে আবার গাড়ি চালিয়ে দিয়েছি। তারপর গাড়িটা যখন বাঁক নিয়ে উপরের রাস্তার দিকে উঠেছে তখন হঠাৎ একটা কালো ছোট হাত আমার গাড়ি উদ্দেশ্য করে নাড়তে থাকে।

আমি সঙ্গে সঙ্গে প্যাডেলে চাপ দিয়ে গাড়ি থামাবার চেষ্টা করি। তবুও গাড়িটা কয়েক পা এগিয়ে থামলো।

জয় আমার গাড়ির সামনে এসে বললো, মিঃ এন্ডারসন, আমি এখানে আপনার জন্য দাঁড়িয়ে আছি।

—এখন আপনি বাড়ি যাবেন না।

—জয়ের কথার মধ্যে একটা আতঙ্কের ভাব ফুটে ওঠে।

—ওরা আপনার জন্য অপেক্ষা করছে।

—'ওরা' বলতে কারা আবার আমার জন্য অপেক্ষা করছে, আমি ভালো করে জয়ের দিকে তাকাই।

আমি একটা গাড়ির পেছনে আমার ম্যাসারটা থামিয়েছি। তারপর জয়ের দিকে তাকিয়ে বলি, জয়, গাড়িতে উঠে এসো। এরপর জয় গাড়িতে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে আমি গাড়ি ছেড়ে দিই। আমি জয়কে প্রশ্ন করি, জয়, তুমি কাদের কথা বলছো?

স্যার, ডিরাজ এবং জোন্স।

তুমি দেখেছো?

তবুও আমার সন্দেহ দূর হয় না। ওকে ফের জিজ্ঞাসা করি, তুমি কী করে জানলে?

আমি ওদের ফলো করছি।

আমি দেখেছি, ওরা আপনার অ্যাপার্টমেন্টে ঢুকেছে। ওরা লাইট জ্বালিয়েছে, আবার নিভিয়েছে। আর আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এখনো আপনার জন্য অপেক্ষা করছে। তাই…।

জয়, তুমি একটা ভালো কাজ করেছো।

জয় এমন একটা সুখবর জানাতে পেরে খুশী। হয়তো কিছু ডলার আশা করছে।

আমি জয়ের কথা শুনে বেশ চিন্তিত হয়ে পড়ি এবং আমার বুঝতে কোন অসুবিধে হয় না, এটা ন্যান্সির কাজ। কারণ ডিরাজ এবং জোন্স আমায় আদৌ চেনে না। সুতরাং তাদের আমার অ্যাপার্টমেন্টে যাবার কোন প্রয়োজন নেই। ন্যান্সি নিশ্চয়ই ডিরাজ এবং জোন্সকে গিয়ে আমায় চাপা দেবার কথা বলেছে, আর তারপরই ওরা অ্যাকশনে নেমে পড়েছে।

সংগে সংগে আবার অ্যালবার্নি'র কথা মনে পড়ে। সে বলেছে, মিঃ এণ্ডারসন ওদের কাছ থেকে দয়া করে দূরে থাকবেন। ওরা বড় সাংঘাতিক। করতে পারে না এমন কাজ নেই।

জয় বলে, স্যার, আমি আপনার হয়ে কাজ করে যাচ্ছি।

অ্যাঁ! আমি সম্বিৎ ফিরে পাই।

হ্যাঁ, তা তুমি বলতে পারো। তবে এখন একটু চুপ করো। আমায় একটু ভাবতে দাও।

আমি দেখি, জয় স্যাণ্ডউইচের প্যাকেটটা দেখতে পেয়েছে এবং হাত দিয়ে নাড়ছে।

তা দেখে বলি, হ্যাঁ, তুমি খেতে শুরু করে দাও। তবে আর একটিও কথা নয়।

জয় আমার অনুমতি পেয়েই স্যাণ্ডউইচে কামড় বসিয়েছে, আর আমি ভাবতে শুরু করে দিয়েছি। আমার পেটের ঘটনা মনে পড়ে। ও ডিরাজের ব্যাপারে আগ্রহী হয়ে পড়েছিল বলে ওকে প্রাণ দিতে হলো।

তারপর আমার মনে পড়ে, আমি ন্যান্সিকে বলেছি, আমি আমার উকিলের কাছে একটা রিপোর্ট পাঠিয়েছি, তাতে যে তাকে শুধু দোষারোপ করে লিখেছি তা নয়। প্রোকারি কোন গোপন স্থানে লুকিয়ে আছে তাও জানিয়েছি।

অন্যদিকে এটা হয়তো ডিরাজ ভেবেছে। আমি মিথ্যে কথা বলেছি। তবে

আমায় মেরে না ফেললেও ভয় দেখাবার জন্য ওরা নেমে পড়েছে।

কিন্তু আমি ঠিক করেছি, একটা লিখিত রিপোর্ট জানাবো যে আমি জানতে পেরেছি, মিসেস ন্যান্সি হ্যামেল প্রোফারির স্ত্রী। এবং এই রিপোর্ট আমি ডিয়াজকে দেখাবো। আর উকিলের কাছে এই রিপোর্টটা রেখে একটা রসিদ নেবো। যাতে বোঝাতে পারবো, আসল রিপোর্টটা উকিলের কাছে রয়েছে। এইভাবে আমি ডিয়াজকে বিপদে ফেলতে পারি।

আরো অনেক চিন্তার পর বাড়ি যাওয়া বাতিল করে অফিসে গেলাম এবং গিয়ে টাইপরাইটারের সামনে বসলাম।

এজেন্সীর নাইট গার্ড আমায় বেশ ভালো করেই চেনে। তাই ম্যাসারটা গ্যারেজে রাখতে কোন অসুবিধে হয়নি। ইতিমধ্যে জয়কে বিদায় দিয়ে বললাম, জয়, তুমি এখন যাও।

গিয়ে ওদের উপর লক্ষ্য রাখো।

আর ওরা যাবার সঙ্গে সঙ্গে আমায় জানাবে। এই নাও আমার "বিজনেস কার্ড" বলে আমি কার্ডটা জয়ের দিকে এগিয়ে দিই।

তারপর পকেটে হাত ঢুকিয়ে একটা কুড়ি পাউণ্ডের বিল তুলে জয়কে দিতে ওর ক্ষুদে ক্ষুদে চোখগুলো উজ্জ্বল হয়ে ওঠে এবং খুশী ভরে মাথা দোলাতে থাকে।

এরপর জয় চলে যেতে এজেন্সীর নাইট গার্ড জ্যাকসন অফিস ঘরের দরজা খুলে দিল। তার কাছে এটা মোটেই একটা আশ্চর্য ব্যাপার নয়। আমি এভাবে মাঝে মধ্যে এখানে আসি।

এবং জ্যাকসন আমায় জিজ্ঞেস করে, মিঃ এণ্ডারসন, আপনি কী কিছু নিতে ভুলে গেছেন?

আমি লরির দিকে যেতে যেতে বলি, আমার টেবিল গোছাতে একেবারে ভুলে গেছি। তার উপর কাল থেকে আবার লম্বা ছুটিতে যাচ্ছি। তাই...।

এরপর পাক্কা দু'ঘণ্টা লাগলো রিপোর্টটা টাইপ করতে। তিনটি কপি করলাম। তারপর টাইপিস্ট পুলের কাছে গিয়ে প্রোফারি এবং ন্যান্সির ছবির তিনটে ফটো স্টাড কপি করিয়ে নিলাম, যেটা আমায় কোল্ডওয়েল দিয়েছে।

তারপর চেয়ারে ফিরে এসে রিপোর্টের সঙ্গে ফটো স্টাড কপি দিয়ে আলাদা আলাদা খামে পুরলাম এবং প্রতিটি খামের উপর টাইপ করে দিলাম—এটা পুলিশের প্রধান মিঃ টেরেলের হাতে আমার মৃত্যু অথবা নিখোঁজ হয়ে যাবার পর।

এরপর একটা বড় খামে রিপোর্টের প্রথম কপি এবং ন্যান্সি ও প্রোফারির আসল ছবি পুরে ফেললাম। আর এটা হাওয়ার্ড সেলভির উদ্দেশ্যে।

হাওয়ার্ড সেলভি আমার অ্যাটর্নি। বেশ স্মার্ট যুবক। তার সঙ্গে এজেন্সীরও কাজ কারবার চলে। এছাড়া সে আমার একজন বন্ধুও বটে।

আমি সেলভিকে একটা চিঠিও লিখি—

প্রিয় সেলভি,

আমি একটা সাংঘাতিক দলের পিছনে লেগেছি। তারা কথায় কথায় খুন জখম করে বেড়ায়। আমি তাদের কাছ থেকে অনেক তথ্য যোগাড় করার চেষ্টায় আছি।

এই খামের মধ্যে একটা রিপোর্ট এবং একটা ছবি রয়েছে। আর যতক্ষণ না পর্যন্ত আমি এই কেসটা শেষ করতে পারছি ততক্ষণ পর্যন্ত এটা খুলবে না।

ওরা আমায় ভয় দেখিয়েছে। তাই নিজের নিরাপত্তার কথা ভাবছি। তুমি যদি শোন আমি মারা গেছি, কিংবা আমার কোন খোঁজ নেই, তাহলে তুমি এই খামটা পুলিশের প্রধান মিঃ টেবেলের হাতে দিতে কখনোই ভুলবে না।

ও হ্যাঁ, আর একটা কথা। তুমি যে আমার চিঠিটা পেয়েছ, তা কাল দুপুরের আগে একজন লোক মারফৎ আমায় অতি অবশ্যই জানাবে।

প্রীতি ও শুভেচ্ছা রইলো।

ইতি

বার্ট এন্ডারসন।

ট্রুম্যান বিল্ডিং-এর পাঁচ তলায় সেলভির অফিস। তাই আমি লিফটে করে নিচে নেমে মেল বক্সে চিঠিটা ফেলে দিই। তারপর আবার অফিসে ফিরে আসি।

জ্যাকসন অবাক চাউনিতে ওসব দেখে চলেছে। বুঝতে পারছি, ওর বিস্ময়ের শেষ নেই। তবু ও আমায় কোন প্রশ্ন করছে না।

আমি আবার চেয়ারে এসে বসি এবং এখন আমার ভাবতে ভালো লাগছে যে, আমি এখন কিছুটা বিপদমুক্ত

তারপর ড্রয়ার খুলে দ্বিতীয় রিপোর্টটা রবার্টসন ল বইয়ের মধ্যে রাখলাম, আর এখানেই আমার স্কচের বোতলটা রয়েছে।

সঙ্গে সঙ্গে বোতলটা টেনে আনলাম। এখনো এর কিছুটা অবশিষ্ট রয়েছে। গ্লাসে ঢেলে চুমুক দিলাম এবং তৃতীয় রিপোর্টটা আমার ব্যাগে রাখি।

গ্লাসে চুমুক দিতে দিতে আমার ভাবনা গিয়ে একশো হাজার ডলারে পেঁছিয়, আর ভাবি, ন্যান্সি কী কাল দুপুরে 'কান্ট্রি ক্লাবে' থাকবে? অবশ্য আসবে কী না তাতে আমার মনে যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

ন্যান্সি নিশ্চয়ই ডিয়াজের কাছে গেছে সাহায্যের জন্যে, যার জন্য ওরা

আমার অ্যাপার্টমেন্টে আমার জন্য অপেক্ষা করছে ? তবে ওরা কী বন্দুক নিয়ে অথবা একটা চুক্তি করার জন্যে এসেছে ?

ইতিমধ্যে আমি পানীয় শেষ করেছি, আর গ্লাসে আরো খানিকটা ঢলবো ভাবছি, আর ঠিক তখনই ক্রিং ক্রিং শব্দ করে টেলিফোনটা বেজে উঠলো।

—হ্যালো। স্যার, আমি জয় কথা বলছি।

—পাঁচ মিনিট হল ওরা চলে গেছে। অ্যালামেডা বারের দিকে।

—তুমি ঠিক দেখেছো তো ?

—থ্যাঙ্ক ইউ জয় ! এখন ঘুমোতে যাও।

—আচ্ছা, জিম্বো এখন কী করছে ?

ও এখন অ্যালামেডা বারে পাহারায় রয়েছে।

ওকে ওখানেই থাকতে বলো। আর কোন খবর থাকলে সঙ্গে সঙ্গে আমার অ্যাপার্টমেন্টে ফোন করে জানাবে।

নিজেকে খুব ক্লান্ত লাগছে ! আমার এখন ঘুম দরকার। তারপর নাইট গার্ডকে শুভরাত্রি জানিয়ে গ্যারেজ থেকে গাড়ি বার করে অ্যাপার্টমেন্টে এলাম।

ধীরে ধীরে অ্যাপার্টমেন্টে প্রবেশ করতে করতে ভাবি, দিনের বেলা খারাপ কাজ হয়নি। আর কাল থেকে আমার ছুটি। আমার অখণ্ড অবসর।

অ্যাপার্টমেন্টে ঢুকে চারদিকে তাকাই। সব ঠিকঠাক আছে। শুধু সিগারেটের ছাই মেঝেতে পড়ে রয়েছে। এ ছাড়া, বুঝবার উপায় নেই যে, এখানে ডিয়াজ এবং জোন্স এসেছিল।

কাল থেকে কি করবো তা আমি আগেই মনে মনে ঠিক করে রেখেছি। এ ব্যাপারে আমি একেবারে নিশ্চিন্ত। তারপর দরজায় তালা লাগিয়ে আমি শুয়ে পড়ি, এবং ঘুমন্ত অবস্থায় আমি রাশি রাশি সবুজ নোটের স্বপ্ন দেখতে থাকি।

আমার ঘুমটা ভেঙে গেল। কে যেন সদর দরজায় বেল বাজাচ্ছে। আমি বিরক্ত অবস্থায় বিছানা ছেড়ে উঠে কি হোল তা বাইরের দিকে তাকাবা আগে ঘড়ির দিকে তাকাই। এখন সকাল দশটা পঁয়ত্রিশ বাজে।

এবার ঘাড়ের দিক থেকে বাইরের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করি, কে ?

আমি মিঃ সেলভির ওখান থেকে আসছি, একটি মেয়ের গলা ভেসে এলো।

এক মিনিট।

তারপর আমি দরজা খুলতে সেলাজির ক্লার্কের কাছ থেকে একটা খাম পেলাম। এরপর আমি মেয়েটির দিকে তাকাই। তাকে দেখতে অনেকটা ইঁদুরের মত। এবং সে সব সময় একটা আতঙ্কিত অবস্থার মধ্যে রয়েছে। ভাবটা এমন এই বুঝি তার শালীনতা হরণ করা হলো।

এরপর মেয়েটি চলে যেতে আমি খামটা খুলি। একটা চিঠি রয়েছে। তাতে লেখা আছে—

প্রিয় বার্ট এন্ডারসন,

আমি তোমার কাছ থেকে এই মর্মে একটা চিঠি পেয়েছি যে, তোমার মৃত্যু অথবা তুমি নিখোঁজ হলে যেন চিঠিটা পুলিশের প্রধান মিঃ টেরেলের হাতে দেওয়া হয়।

আর তোমার জ্ঞাতার্থে জানাচ্ছি যে, আমি খামটা খুব সাবধানের সঙ্গে আয়রন সেফে রেখেছি এবং তোমার নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলবো।

ধন্যবাদান্তে,

ইতি

তোমার হাওয়ার্ড সেলাজি

একটা স্বস্তির আশ্বাস থেকে চিঠিটা ডেস্কের উপর রেখে কিচেনে গেলাম এবং কফি তৈরি করি। তারপর কফিতে চুমুক দিয়ে ভাবি, আমার যতটা নিরাপত্তার দরকার ছিল, তা আমি করেছি।

তারপর সাড়ে এগারোটার সময় দাড়ি কামিয়ে চান করতে যাই এবং বাথরুম থেকে ফিরে এসে একটা সুন্দর স্যুট পরলাম, যার রং হাল্কা হলুদ। তার উপর নীল স্ট্রাইপ দেওয়া। এরপর দরজা দিয়ে ম্যাসার নিয়ে বেরিয়ে পড়ি।

আজ শুক্রবার। আমি কান্ট্রি ক্লাবের উদ্দেশ্যে গাড়ি চালিয়ে দিয়েছি। এবং গাড়িটা পার্কি জোনে পার্ক করে ন্যানসির জন্য অপেক্ষা করতে থাকি।

এখন সময় এগারোটা পঞ্চান্ন। তারপর একটা ওয়েটারকে দেখতে পেয়ে তাকে ইশারা করে কাছে ডেকে জিজ্ঞেস করি, মিসেস হ্যামেল কি এসেছেন ?

—না স্যার, এখনো আসেন নি।

তারপর এমন একটা জায়গা বেছে নিয়ে বসলাম যেখান দিয়ে ন্যানসি প্রবেশ করলে তাকে দেখতে পাবো। এরপর একটা সিগারেট ধরিয়ে অপেক্ষা করতে থাকি।

তবে একথা ঠিক, আমি এখানে ন্যানসির দেখা পাবো তা আশা করছি না। না পেলে দ্বিতীয় কাজটা করতে সচেষ্ট হয়ে উঠবো।

আমার এখানে আসার কথা ছিল তাই এসেছিলাম। সে যদি তার কথা না

রাখে, তাহলে সেই আমার দ্বিতীয় কাজটা করার জন্য ঠেলে দিল।

এখানে সাড়ে বারোটা পর্যন্ত অপেক্ষা করার পর আমি রেস্তোরায় গেলাম এবং 'ক্লাবে সেন্ডাভ' খেতে থাকি। শুধু মুখে আর কতক্ষণ বসে থাকা যায়! আর সময় তো কাটানো দরকার।

তারপর ন্যান্‌সি আসছে কী না তা আরো নিশ্চিত হবার জন্য লাঞ্চ সেরে একবারে সোজা টেনিস কোর্টের কাছে গিয়ে হাজির হই। কিন্তু কোথায় ন্যান্‌সি।

এরপর গেলাম সুইমিং পুলে। এখানেও সেই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটলো।

সুতরাং আমি দ্বিতীয় কাজটা করার জন্য তৎপর হয়ে উঠি এবং গাড়ি বার করার জন্য পার্কিং জোনের কাছে যেতে যেতে ভাবি, একশো হাজার ডলার কী এত সহজে পাওয়া যায়? তার জন্য খাটতে হয়। মেহনত দরকার। তাই আমিও . .

আমি এখান থেকে গাড়ি চালিয়ে সোজা বন্দরে চলে আসি। তারপর গাড়িটা অ্যালামোডা বারের কাছে পার্ক করে সুইং দরজা ঠেলে ভেতরের বড় ঘরটায় প্রবেশ করে।

ঘরের চারদিকে তাকাই। বেশ কয়েকটা বন্দরের বদমাইশ এখানে পানাহার করতে এসেছে। এছাড়া, কয়েকজন বিদেশীকেও যেতে দেখলাম। এবং ম্যাক-সিকান ওয়েটাররা খুব ব্যস্তভাবে তাদের কাজ করে চলেছে।

বারকিপারের কাছে আমি এগিয়ে যাই। মানুষটার বেশ মোটা ধরণের চেহারা।

বারকিপারকে আমি হেসে জিজ্ঞেস করি, আমি মিঃ ডিয়াজের সঙ্গে দেখা করতে চাই।

• —মিঃ ডিয়াজ? বারকিপার বেশ অবাক হয়।

—হ্যাঁ। আমি তার সঙ্গে দেখা করতে চাই।

আমার কথা শুনে বারকিপারের চোখদুটো বড় বড় হয়ে উঠে, আপনি মিঃ ডিয়াজের সঙ্গে দেখা করতে চান?

—আপনি নিশ্চয় কালা বা ঐ ধরণের কিছু নন বলেই আমার বদ্ধ ধারণা, কথাটা বলেও আমি মুখের হাসি বজায় রাখি।

—মিঃ ডিয়াজ এখন খুব ব্যস্ত।

—তাহলেও আমি তার সঙ্গে দেখা করতে চাই।

—কিন্তু বললাম না উনি খুব ব্যস্ত!

—তবুও তার সঙ্গে আমার দেখা হওয়া প্রয়োজন। গিয়ে বলুন, বার্ট এন্ডারসন তার সঙ্গে দেখা করতে চায়।

তারপর কিছুটা বিরক্তির সঙ্গে বারকিপার রিসিভারটা তুলে নিয়ে অপর পক্ষের সঙ্গে মৃদু স্বরে কথা বলে রিসিভারটা নামিয়ে রাখে এবং কি বলবো তা যেন কিছুটা ভাবে।

এরপর বারকিপার আমার কাছে ফিরে এসে সামনের দিকে আঙুল নির্দেশ করে বলে, এখান থেকে সোজা চলে যান। গেলে একটা ঘর পাবেন। এবং সেই ঘরেই…।

আমি বারকিপারের নির্দেশ মত একটা ঘরের কাছে এসে দাঁড়াই। তারপর বাঁ দিকে দরজা ঠেলে ঘরের মধ্যে এসে দাঁড়াই।

ঘরটা একটা অফিস ঘর। সামনে একটা ডেস্ক। ফাইলিং কেবিনেট আমার ডান দিকে। বাঁ দিকে একটা ডেস্কের উপর দুটো সুদৃশ্য টেলিফোন। এই ডেস্কের পর আর একটা ডেস্ক। সেখানে একটা টাইপরাইটার শোভা পাচ্ছে।

বড় ডেস্কটার পিছনে দাঁড়ালাম। মুখে একটা আলগা হাসির রেখা ফুটিয়ে তুলেছি, যেন ধোয়া তুলসী পাতা।

আমার সামনে একজন লোক বসে আছে। তার চোখ দুটো জ্বলছে এবং যে চোখ কেউটে সাপ দেখলে পর্যন্ত হিংসে করবে।

তার রোগাটে চেহারা, মাথার চুল তেলে চকচক করছে। তার চুল ঘাড়ের কলার পর্যন্ত নেমে এসেছে। তার চওড়া গোঁফ দুটো ঠোঁটের দু'দিকে নেমে গেছে।

এবার আমি আরো ভালো করে তার দিকে তাকাই। ভাবি, অ্যালবার্নি কেন এর ব্যাপারে আমায় এত সাবধান করে দিয়েছে। ও নাকি সাংঘাতিক। সামানাতম স্বার্থের হানি হলে করতে পারে না এমন কোন কাজ নেই।

—আপনি নিশ্চয়ই মিঃ ডিয়াজ? আমি তার দিকে তাকিয়ে দরজাটা বন্ধ করতে করতে বলি।

ডিয়াজ চিন্তিত মুখে মাথা নাড়ে, হ্যাঁ। তারপর সে দেশলাইয়ে কাঠি দিয়ে দাঁত খুঁটতে থাকে।

—আপনি তো লুসিয়া প্রোফারির হয়ে কাজ করে চলেছেন? কথাটা ডিয়াজের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে আমি তাকে এক দৃষ্টিতে লক্ষ্য করতে থাকি।

—আমি? ডিয়াজ এমনভাবে কথাটা বললো যেন সে জীবনে প্রথম আমার মুখে লুসিয়া প্রোফারির নামটা শুনলো।

—আপনি ভুল খবর পেয়েছেন?

আর আপনি তো মিসেস ন্যান্সি হ্যামেলের হয়ে কাজ করে চলেছেন।

—হতে পারে, তারপর আমি জানাই। তার সঙ্গে আজ আমার 'কার্নোই ক্লাবে' অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল। কিন্তু তিনি সেখানে যান নি।

ডিয়াজ আমার কথার কোন জবাব দেয় না। সে শুধু সোজা হয়ে এবং

তাকে এ মুহূর্তে দারুণভাবে বিরক্ত দেখাতে থাকে।

—আমি আশা করেছিলাম। সে ওখানে যাবে এবং আমার সম্বন্ধে নোট নেবে। কিন্তু কোথায় সম্বন্ধে নোট।

এবারও ডিয়াজ আমার কথার কোন উত্তর দেয় না এবং তাকে আগের মতন বিরক্ত দেখাতে থাকে।

ভাবি, এখন তাড়াতাড়ি আমার কাজটা করে যাওয়া দরকার। আমি একটা চেয়ার টেনে ডিয়াজের সামনে বসি। এবং পকেট থেকে নির্দিষ্ট খামটা বের করে ওর দিকে এগিয়ে দিই।

ডিয়াজ হাত বাড়িয়ে খামটা নেয়। তারপর খামটা খোলে এবং তার মধ্যে যথেষ্ট বিরক্ত ভাব দেখায়।

সহসা খামের দিক থেকে ডিয়াজ দৃষ্টি ফিরিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বলে, আপনি কী আপনার মৃত্যু কামনা করেন?

—যেমন পেটে মরেছে? তবে এত তাড়াতাড়ি আমি ঠিক মরতে চাই না! ডিয়াজের চোখ এখন দারুণ, যেন দারুণভাবে জ্বলতে থাকে, এ ব্যাপারে বাজি ধরতে চান নাকি?

আমি ডিয়াজের একথার জবাব দেবার মত প্রয়োজন বোধ করি না। শুধু স্মার্টভাবে বলি, চিঠিতে যা লেখা আছে তা পড়ে যান। আর যদি পড়া হয়ে গিয়ে থাকে তাহলে সিনেমার সেকেণ্ড গ্রেড ভিলেনের মত কথা বলবেন না। বুদ্ধি সম্পন্ন লোকের মত কথা বলতে চেষ্টা করুন।

আমার কথা শুনে ডিয়াজের মুখ চকচকে হয়ে উঠলেও মুখখানা যেন ভাবলেশহীন দেখাতে থাকে। তারপর পাতলা ধারালো একটা ছুরি বার করে খামের মুখটা কেটে টাইপ করা চিঠিটা বার করে পড়তে থাকে।

আমি প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট বার করে ধরাই এবং ডিয়াজকে লক্ষ্য করতে থাকি। আমার এখন চোখের যেন পলক পড়ছে না।

ডিয়াজ প্রথমে ছবিটা পরীক্ষা করতে থাকে এবং তার মুখের হাবভাব দেখে বুঝতে পারি, সে একটা ফেলনা ছবি হিসেবে আদৌ দেখছে না। তারপর দেহের ভার পিছনের চেয়ারে ছেড়ে দিয়ে পাঁচ পাতা চিঠিটা পড়তে থাকে।

আমি ডিয়াজের সঙ্গে 'পকার' খেলতে চাই না। শুধু আমি অপেক্ষা করতে থাকি। তবে বেশ উত্তেজনা বোধ করছি।

শেষ পর্যন্ত চিঠিটা শেষ করে ডিয়াজ আমার দিকে তাকায়।

—এটা হলো চিঠি, আমার দৃষ্টিও ডিয়াজের দিকে। এবং এই হলো এই চিঠির রসিদ। সেটা আমায় হাওয়ার্ড সেলভি দিয়েছে।

—এতে আমি যেন ব্ল্যাকমেলের গন্ধ পাচ্ছি।

—জানেন এর পরিণাম কী?

—এর জন্য আপনার কম করে পনেরো বছরের জেল হয়ে যেতে পারে।

—হ্যাঁ, তা হতে পারে বই কী? আমি মুখে একটা তাচ্ছিল্যের হাসি ফুটিয়ে তুলি। আর আপনার দলের লোকদের কথা একবারও ভেবে দেখেছেন।

—আপনার কথা আমি বুঝতে পারছি না।

—পারছেন না?

—অর্থাৎ প্রোকারির কথা বলছি। তাকে ইতালির সুগন্ধময় জেলে কুড়ি বছর কাটাতে হতে পারে সে ব্যবস্থা আমিই করতে পারি। আর···।

—এ থেকে আপনিও রেহাই পাবেন না।

—আমি আবার এতে কিসে জড়িয়ে পড়লাম!

—তাকে আশ্রয় দিয়ে।

—আমি তাকে মোটেই আশ্রয় দিইনি। সে এখানে আছে তাও আমি জানি না।

জেনানি? এসব ছেঁদো কথা বলে আমায় ভোলাবার চেষ্টা করবেন না। ওকে এখানে লুকিয়ে রাখার জন্য আপনাকে আমি পাঁচ বছর জেলের ভাত খাওয়াতে পারি। আমি কথায় বেশ জোর দিয়ে বলি।

ডিরাজ আমার কথায় তেমন আমল না দিয়ে হাত বাড়িয়ে একটা বাক্স টানে এবং তা থেকে একটা সিগার বার করে সেটা ধরিয়ে এক গাল ধোঁয়া আমার দিকে ছোড়ে।

তারপর ডিরাজ বলে, সে আমায় একশো হাজার ডলারের কথা বলেছে। আর আমি তাকে বলেছি, ও সব ফাঁদে তুমি পা দিওনা। একটা বাজে ব্যাপার।

—তা বলতে পারেন, তবে এর পরিস্থিতির জন্য কিন্তু প্রস্তুত থাকতে হবে।

—হয় একশো হাজার ডলার দেবেন, নয়তো······।

—ডিরাজ আমার কথার মাঝে থামিয়ে দিয়ে বলে, নয়তো কী?

—নয়তো বাঁশী বেজে উঠবে।

—তাহলে কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে সাপ বেরিয়ে পড়বে এবং আপনাকেও জেলে যেতে হবে।

—ওসব কথা বাদ দিন। এখন বলুন, ন্যান্সি কতটা উঠেছে। এবং সে আমায় টাকা দিতে বাধ্য থাকবে কিনা?

—রিপোর্ট পড়ে কী বুঝেছেন?

—বলুন, আমি আর এখানে দাঁড়িয়ে থেকে সময় নষ্ট করতে চাই না।

—হ্যাঁ, ভালো করে খেলাতে পারলে বেশ চড়া দামই পাবেন এবং তা সবই আপনার উপর নির্ভর করছে?।

—তবু কত?

—পঞ্চাশ হাজারের বেশী দিতে পারবো না।

—যা দিতে পারবো না, তা বললে তো দেওয়া যাবে না।

—হ্যামেলের অনেক আছে।

—কিন্তু ন্যান্সির তো নেই।

—সে তার স্ত্রী।

—হ্যামেল তাকে সন্দেহ করে। তাই বলে তার টাকা থাকবে না সে তো কখনো হতে পারে না।

—যাক্, কত দিতে পারবেন?

—ঐ যে বললাম, পঞ্চাশ হাজার ডলার, তারপর ডিয়াজ সিগারে একটা লম্বা টান দিয়ে ড্রয়ার খুলে একশো পাউণ্ডের অনেকগুলো বিল বার করতে থাকে। এবং অন্য একটা ড্রয়ার থেকে একটা চামড়ার ব্যাগ করে বললো।

এরপর ডিয়াজ আমার দিকে তাকিয়ে বলে, মিঃ এণ্ডারসন, এতে পঞ্চাশ হাজার ডলার রয়েছে। এই ব্যাগে ভরে ফেলুন।

আমি লোলুপ দৃষ্টিতে পাউণ্ডগুলোর দিকে তাকাই এবং অনুভব করি, আমার হাত ঘামতে শুরু করে দিয়েছে। একটা দারুণ উত্তেজনা বোধ করছি। জীবনে একসঙ্গে এত টাকা কখনো দেখিনি। ঐ সবুজ নোটগুলো যেন আমায় কাছে টানতে থাকে।

—তবু আমি বলি, এটা পঁচাত্তর করুন।

—সম্ভব নয়।

ন্যান্সির কথা তো আপনাকে বলেছিই, আর মিঃ এণ্ডারসন, চালাকের মত কাজ করুন। আর আমার কাছে এর বেশী নেই।

নেই বললেই হলো! তবু আমি একই কথা বলে আবার চাপ দিই। হ্যামেলের স্ত্রীর কাছে...... ।

—যা বললাম কথাটা ঠিকই, ডিয়াজ ব্যাগে ডলারগুলো ভরতে থাকে।

দরাদরি করবো ভেবেছিলাম, তবে এ কথা ঠিক, টাকাগুলো যে এত সহজে চলে আসবে তা আমি আদৌ ভাবিনি। ভাবি, এটা একটা স্বপ্ন নয়তো। আর এখন থেকে আমি ঐ ডলারগুলোর মালিক। সত্যি, বিশ্বাস করতে ঠিক পারছি না।

ডিয়াজ আমার দিকে ব্যাগটা এগিয়ে দিয়ে বললো, এখানে আর আসবার চেষ্টা করবেন না। সে শান্ত গলায় কথাটা বললেও তার তীক্ষ্ন চোখ দুটো যেন আমায় ভয় পাইয়ে দিচ্ছে।

ডিয়াজ আবার যেন সাপের মত হিস্ হিস্ করে বলে, যারা ব্ল্যাকমেল করে তারা লোভী। কিন্তু একটা কথা আপনাকে আমি মনে করিয়ে দিতে চাই, এটাই শেষ, বুঝেছেন?

—আপনার কথা আমি মনে রাখতে চেষ্টা করবো, বলে আমি চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়াই।

—রাখলে খুশী হবো, তারপর ডিয়াজ কঠোরভাবে তাকিয়ে ফের বলে। আর একটা কথা।

—যদি এ ব্যাপারে আবার চাপ সৃষ্টি করেন তাহলে একটা শোচনীয় পরিস্থিতি হবে, আর এবার থেকে সেটা আমি শক্ত হাতে দেখবো। এবং তেমনি হলে আপনি একটু একটু করে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাবেন। কথাটা খেয়াল রাখবেন।

আমার শরীরের ভেতর থেকে যেন একটা ঠান্ডা প্রবাহ বয়ে চলছে এবং আমি যেন একটা সাপের স্বপ্ন দেখতে শুরু করে দিয়েছি আর সেই সাপটা হলো ডিয়াজ।

তবুও আমি জোর দিয়ে বলি, তুমি আমার পথ থেকে দূরে সরে থাকো, তাহলে আমিও তাই করবো। নইলে......।

তারপর আমি কথা শেষ করে কয়েক পা এগিয়ে যাই এবং দরজার দিকে এগিয়ে যেতে যেতে পেছন ফিরে বলি, তুমিই সেই লোক যে পেটে আর সেই বাচ্চা ছেলেটাকে খুন করেছে।

এ কথা শুনে জ্বলন্ত চোখে আমার দিকে তাকায়, সে দিকে নজর না দিলেও চলবে। বলে সে রিপোর্টটা ড্রয়ারে রাখতে থাকে।

আমি এখন রাস্তায় দাঁড়িয়ে। রোদের তেজ বেশ কড়া।

এখন আমার একমাত্র চিন্তা, ডলারগুলো ভালোভাবে নিরাপদ জায়গায় রাখা। সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি চালিয়ে একটা ব্যাঙ্কে গেলাম। লকার ভাড়া করলাম। এবং পাঁচশো একশো ডলারের বিল বার করে বাকীটা রেখে দিলাম।

এখন আমি নিশ্চিন্ত। ব্যাংক থেকে বেরিয়ে জয়ের কথা মনে পড়লো, ভাবি একবার ওর কাছে গেলে কেমন হয়।

বাড়ি আর যাওয়া হলো না। গাড়ির মুখ বন্দরের দিকে ঘোরালাম এবং বন্দরে গাড়ি পার্ক করে পায়ে হেঁটে লবস্টার কোর্টের দিকে চলতে থাকি।

তারপর জয়ের বাড়ি এসে দরজায় বেশ কয়েকবার কড়া নাড়ার পর জয় এসে দরজা খোলে। সে এক জোড়া আন্ডারওয়্যার পরে ঘুমোচ্ছিল।

—জয়, আমি তোমায় জাগিয়ে দিলাম তো? আমি ওর ঘরে প্রবেশ করতে করতে বলি।

—না স্যার, ঠিক আছে।

—জিম্মো এখনো ওর কাজ করে চলেছে?

—হ্যাঁ স্যার।

—আচ্ছা। কাজটা হয়ে গেছে।

ওকে ডেকে আনো। ওর ওখানে থাকার আর কোন দরকার নেই।

তারপর ব্যাগ থেকে বার করে একটা পঞ্চাশ পাউন্ডের বিল জয়কে দিয়ে বললাম, খুশী তো?

—হ্যাঁ স্যার, জয়ের সব দাঁত বেরিয়ে পড়ে। তবে স্যার, ঐ ব্যাপারে আপনি আর কোন রিপোর্ট চান?

—এ ব্যাপারটা ভুলে যাও।

—ভুলে যেতে পারবো না, জয়ের একটু আগের হাসি খুশীতে ভরা উজ্জ্বল মুখটা সহসা যেন একরাশ কালো মেঘে ছেয়ে ফেললো এবং তাকে খুব ম্লান দেখাতে থাকে।

—কেন জয়?

—ওরা টমকে খুন করেছে।

—তাই ওদের আমি ছাড়বো না। ওরা যত বড় সাংঘাতিক হোক।

মিঃ এন্ডারসন, আপনি আপনার ব্যবসা নিয়ে যেমন ব্যস্ত, তেমনি আমিও আমাদের ব্যবসা নিয়ে ব্যস্ত, জয় দৃঢ়তার সঙ্গে জানায়।

—জয়, এ কথা বলো না, আমি জয়কে ফের সাবধান করে দিই। তুমি ভাবতেও পারবে না ওরা কী ধরণের লোক!

ঠিক আছে। আপনার কথা আমি শুনবো, জয় কিছুটা শান্তভাবে বললেও ভেতরের গজরানি যেন ওর কমে না। সহজে কমবেও না। ও যেন হিংসা-পরায়ণ হয়ে উঠেছে। আর মায়ের পেটের নিজের ভাইকে নৃশংসভাবে খুন করলে কেই বা চুপ করে বসে থাকতে পারে।

তবু আমি বলি, এই তো ভালো ছেলের মত কথা বলেছো। আমি ওর পিঠে মৃদুভাবে চাপড় মারতে থাকি।

—স্যার, এখন আর আমার কিন্তু কোন কাজ নেই, জয় কথাটা করুণভাবে জানায়।

—ঠিক আছে, তোমার কথা আমার মনে থাকবে। তেমন কোন কাজের সন্ধান পেলেই তোমায় আমি জানাবো। তাহলে চলি জয়।

আমি রাস্তায় এসে দাঁড়িয়েছি। তারপর বাড়ির দিকে রওনা হয়েছি। ভাবি, সহজে ডলারগুলো ব্যাঙ্কে রয়েছে। আর ভাবতেই পারিনি, ডিয়াজ এত সহজে ওগুলো দিয়ে দেবে। এবং এখন আমি রীতিমত একজন বড় লোক। নিজেকে আমার এখন দারুণ ভালো লাগছে। একটা খুশী খুশী মেজাজ আমার সর্বত্র ঘিরে রয়েছে।

ভাবি, এর জন্য একটা উৎসব করা দরকার। অর্থাৎ বার্থা। ওকে নিয়ে

শহরের বাইরে চলে যাওয়া একান্ত প্রয়োজন। আর ও যেন এখন আমায় চুম্বকের মত কাছে টানতে থাকে!

এখন সময় সাতটা। ভাবি, এতক্ষণে বার্থা নিশ্চয়ই অফিস থেকে ফিরে এসেছে। এবং আজ যদি ওর কোন ডেট থাকেও তাহলে ও আমার জন্য তা বাতিল করবে।

ম্যাসারটা রাস্তায় উঁচু জায়গায় রেখে সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠে এলাম এবং দরজা খুলে টেলিফোনের দিকে হাত বাড়াই, আর ঠিক তখনই টেলিফোনটা বেজে উঠলো।

ভাবি, এ নিশ্চয়ই বার্থা। ও না হয়ে কিছুতেই যায় না। আর ভাবি, দুশো মাইল দূরে থেকেও সবুজ নোটগুলোর গন্ধ ও পেয়ে গেল!

আমি রিসিভার তুলে নিই, হাই বেবী!

একটা ঠাণ্ডা শব্দ অপর দিক থেকে ভেসে আসে, আপনি কি বার্ট এণ্ডারসন কথা বলছেন?

—হ্যাঁ, মেজাজে চিড় ধরলো। আর আপনি কে কথা বলছেন?

—এক মিনিট ধরুন। মিঃ পামার আপনার সঙ্গে কথা বলতে চান। উনি এখুনি লাইনে যাবেন!

আমি এ মুহূর্তে পামারের হেড়ে গলা শুনতে মোটেই ইচ্ছুক নই। এখন আমার বার্থাকে ভীষণভাবে প্রয়োজন। আর এখন কী না··· ।

—আমি আপনাকে অনেকক্ষণ ধরে কনটাক্ট করার চেষ্টা করছিলাম, পামার জানায়।

—আমি এখনই ফিরেছি।

—আমি এখন ছুটিতে। যদি তেমন কিছু দরকার থাকে তাহলে অফিসের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

—মিঃ এণ্ডারসন, আমি মিঃ হ্যামেলকে আপনার রিপোর্টটা দিয়েছি, পামার আমায় কথাটা বলে।

—উনি রিপোর্টটা পড়েছেন?

—হ্যাঁ এবং খুশী। আর তিনি ব্যক্তিগতভাবে আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান।

—আমার সঙ্গে? আমি বিস্ময়ে হতবাক।

—হ্যাঁ।

কিসের জন্য? একটা আতঙ্ক সহসা এসে আমার মনের দরজায় ধাক্কা দেয়। কারণ আমি ডলারগুলো হাতিয়েছি। তাই আমার মন এখন পুরো মাত্রায় দুর্বলতায় ভরা।

—সঠিকভাবে বলতে পারছি না।

—পারছেন না ? ভাবি, পুরো মাথায় চেপে ধরার মতলব নাকি !

—না। তবে তিনি কাল সকাল দশটার সময় আপনার সঙ্গে কথা বলতে চান।

—তাকে বলে দেবেন, আমি এখন ছুটিতে, বলেই ভাবি। আমার বেঁচে থাকাটা এরা দুর্বিসহ করে তুলবে নাকি !

—মিঃ এণ্ডারসন, দয়া করে এ কথাটা বলবেন না। তিনি আপনার দেখা পাওয়ার জন্য আশা করছেন।

—কিন্তু কেন ! ভাবি, কথা দিয়ে যেন বধ করে পড়ছ !

—বললাম তো ঠিক··· ।

—কিন্তু মিঃ হ্যামেলের সঙ্গে দেখা করারই আমার তো কোন উপায় নেই।

—উপায় নেই ? পামার যেন হতাশভাবে কথাটা বলে।

—কেন ?

—আমি কাজ শুরু করে দিলেই আমার ছুটিটা বাতিল হয়ে যাবে। সুতরাং আমি এখন কোনরকম কাজ করতে চাই না। তার উপর আমি অনেকদিন পরে ছুটি পেয়েছি।

—আমি কী এ ব্যাপারে মিস কেরীর সংগে কথা বলবো, পামার আমাকে রাজি করবার জন্য চেষ্টা চালিয়ে যায়।

—না, তার কেন দরকার হবে ?

—আমি যেতে পারি, তবে... ।

—বলুন কী করতে পারি ? পামার আশ্বাস্বিত।

—আমার নামে একটা একশো ডলারের চেক পাঠিয়ে দেবেন তাহলেই হবে।

—ঠিক আছে, আর মিঃ হ্যামেলকে আপনার কথা বলতে পারি ?

—হ্যাঁ, বলেই আমি রিসিভার নামিয়ে রাখতে যাই। বাধা পাই।

—হ্যালো ! হ্যালো !

—কাল তাহলে সকাল দশটা।

—ঠিক আছে, রিসিভার নামিয়ে রাখি।

এক নাগাড়ে কথা বলে বলে যেন গলাটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে উঠেছে। ফ্রিজ থেকে স্কচের বোতলটা বার করে গ্লাসে ঢালি। তারপর চুমুক দিতেই মেজাজ খুশ।

ভাবি, এবার বার্থাকে ফোন করি। তারপর ডায়াল করতে বার্থার গলা পাই, হ্যালো !

বলো তো কে ফোন করছে ? আমি জিজ্ঞেস করি।

ন্যাকা ! আর আমার লেফ্‌্ট্‌ পাউণ্ড কেমন দিচ্ছো না কেন !

তুমি পাউণ্ড, পাউণ্ড করে গেলে ! এসব ছাড়া কিছুই ভাবতে পারো না, না ?

আগে টাকার কথা বলো ?

হচ্ছে ওকথা। তার আগে বলো, আজকের রাতটা কোথায় সেলিব্রেট করবে।

হেতু ?

আছে বই কী। আর তোমার রাবে হুকগুলো আলগা করে রাখো।

আচ্ছা বার্থা, তুমি সেদিন 'স্প্যানিশ বে হোটেলে' যাবার কথা বলেছিলে।

ওখানে গেলে কেমন হয় ?

তুমি কী মাতাল ?

হয়নি। তবে হবো। আর আমার ডবল বেডের বিছানাটা একেবারে খালি খালি লাগছে।

আমার টাকাটা কী পাবো ?

পাবো কী না তাই বলো ?

বাবা, পাবে ! আর দ্বিতীয় বালিশটার কথা কী ভাবলে ?

আগে 'স্প্যানিশ বে গ্রিল'।

ঠিক বলেছো।

কিন্তু ওখানকার ডিনারের চার্জ কত জানো ?

তা সত্বেও তুমি ওখানে যেতে চাইছো ?

এবার আমার একটা কথার জবাব দেবে ?

উঁহু।

বিছানাটা বড্ড খালি লাগছে। কী তোমার কথাটা কী ?

তুমি কী ব্যাঙ্ক ডাকাতি করছো নাকি ?

নইলে এত টাকা পাচ্ছো কোথায় ?

সে কথা পরে হবে খন, আর শোন, তোমায় ঠিক একঘণ্টা সময় দিচ্ছি। তার মধ্যে তুমি না এলে আমি আর একটা পাখি ডেকে নেবো।

এরপর করিডরে যে শব্দ পাবে, সে হলো আমি, বলে বার্থা রিসিভারটা নামিয়ে রাখে।

ঠিক আছে বেবী, আমি ফোনটা রিসিভারের উপর রেখে গ্লাসে চুমুক দিই। ভাবি, টাকাটা কী সুন্দর জিনিস !

তারপর আর পেগ স্যাম্পেন ককটেল খাওয়ার পর বার্থা আমার একান্ত প্রিয়

হয়ে উঠেছে। আমরা এখন একটা সুপার রেস্তোরায় বসে আছি। সেটার নাম —'স্প্যানিস বে গ্রিল'।

তারপর আমি ওয়েটারকে ডেকে যা খাবার অর্ডার দিলাম, তা দেখে বার্থা তো হাঁ। ওর চোখ যেন ঠিকরে আসার যোগাড় হয়েছে।

তুমি ওসব করছো কী? বার্থা ভয়ে ভয়ে আমায় জিজ্ঞেস করে।

খাওয়ার পর ঠিক পুলিশ এসে হাজির হবে।

শান্ত হও, বলে নিচু গলায় টাকাটার ঘটনা সংক্ষেপে বার্থাকে বললাম। ন্যান্সির কথাও জানালাম। এবং শেষে বললাম, আমি ঢাকনা খুলে কতগুলো বিষধর পোকা বার করেছি।

সেই মেয়েটা? বার্থা আমার মত চারদিক তাকিয়ে একটু চাপা গলায় বলে।

হুঁ, আর ও আমায় বললো, আমার সম্বন্ধে কিছু বলো না এবং আমার রিপোর্ট কিনে নিতে চাইলো। ফলে ওকেও আমার বাধিত করতে হলো।

বার্ট! বার্থা আমার হাত চেপে ধরে।

বার্থা! আমি বার্থাকে বুকের কাছে টেনে নিই।

আমি জানতাম, তুমি একদিন চালাক হবে। বার্থা খুশীতে উজ্জ্বল মুখে। তা কত পেলে।

পঞ্চাশ হাজার ডলার, চার দিকটা আর একবার ভালো করে দেখে নিয়ে বার্থার কানে কানে বলি।

বলেই ভাবি। না, না, এভাবে কথা বলা ঠিক নয়। সাবধান হওয়া উচিত। শাস্ত্রেই বলে দেওয়ালের পর্যন্ত কান আছে।

তারপরও বার্থা যেন কি বলতে যাচ্ছিল। আমি তাকে থামিয়ে দিয়ে বলি, বেবী, এখন ওসব আলোচনা থাক।

বার্থা এখন উত্তেজিত, যেমন প্রথমটা আমার হয়েছিল। ফলে সে থামতে চাইবে কেন। ফের বলে, পঞ্চাশ হাজার ডলার! আমি ভাবতে পারছি না। আমার মাথা ঝিমঝিম করছে।

তোমায় কিছু ভাবতে হবে না। তুমি এখন দয়া করে চুপ করো। তারপর ওয়েটার খাবার দিয়ে যেতে বার্থা বলে, এ দিয়ে তুমি কি করছো?

কিছু না। আমি বার্থাকে রাগাবার জন্য বলি।

কিছু না। সোজা সহজ সরলভাবে বললাম। স্রেফ টাকাটা ব্যাঙ্কে রেখে দিয়েছি। ডিম পাড়বে। একটা একটা করে খাবো। আর বুড়ো বয়সের কথাও তো এখন ভাবতে হবে।

আমি বিশ্বাস করি না, যদিও বার্থা কথাটা বললো, তবু তাকে খুব গম্ভীর দেখাতে থাকে।

আমিও না। তুমি আর আমি ছুটিতে যাবো। বলে বার্থার নাকে বাঁ হাত দিয়ে আলতো করে একটা ঘুঁষি মারি।

বার্ট! বার্থা যেন লতার মত আমার গায়ে ঢলে পড়ে।

তোমাতে আমাতে গিয়ে আনন্দের মাঝে বেশ কিছুদিন কাটাবো, আর ভাবছি, একটা ইয়াট ভাড়া করবো।

তা তুমি আমার সংগে যাবে তো?

এ আবার বলতে! আর ইয়াট ভাড়ার ব্যাপারে আমার ওপর ছেড়ে দাও।

তোমার জানাশুনো আছে নাকি?

হ্যাঁ।

আমার এক বন্ধুর দারুণ একটা ইয়াট আছে এবং আমি তাকে ভাড়া দেবার কথা বলবো। আর আমার কাছ থেকে সে সামান্যই ভাড়া নেবে।

ইয়াটটা দারুণ! তাছাড়া, ইয়াটে চারটে নাবিক। একজন ফ্রেঞ্চ কুক আছে। তার রান্নাও খুব ভালো!

তারপর বার্থা মাংসের টুকরোটা মুখে পুরতে পুরতে বলে, তা কত দিনের জন্য যেতে চাও?

কিন্তু এযে দেখছি অনেক টাকার ব্যাপার!

বললাম তো, ও ব্যাপারটা তুমি আমার উপর ছেড়ে দাও। শুধু বলো, কতদিনের জন্য যেতে চাও?

চার সপ্তাহ, তার বেশী নয়। এবার ভাড়া কত নেবে বলতো সোনামণি?

সপ্তাহে কুড়ি হাজার ডলার?

তাহলে একবারে ছেঁটে দাও।

বলো কি, সপ্তাহে কুড়ি হাজার ডলার দিয়েকখনো যাওয়া যায় নাকি! তাহলে চার সপ্তাহে কত পড়বে ভাবো!

তোমাকে সেই একই কথা, বার বার বলতে হচ্ছে। ইয়াটের ভাড়ার ব্যাপারটা আমি ম্যানেজ করবো। আমি চার সপ্তাহের জন্য কুড়ি হাজার ডলার দিতে তো...

তা দিতে আমার বেশ অসুবিধে নেই, কিন্তু এত কমে কী করে রাজি করাবে?

সে ভান্ডার আমার গোপন রসদে জমা আছে।

শুধু একবার প্যান্টি···।

কিন্তু তুমি ওর সামনে ওভাবে···

ও একটা নপুংশক। ওর ঘরে উলংগ হয়ে নৃত্য করলেই কাজটা হাসিল হয়ে যাবে।

কালই আমি ওর সংগে দেখা করে সব ঠিক করে ফেলবো।

ইতিমধ্যে মাছ আর ডিমের খাবার এলো। খাবারে মুখ দিয়ে বলি, ও রাজী হবে তো?

—বাজি ধরবে নাকি?

—যদিও আমি বড়লোক, তবু আমি বোকা নই।

তার পরের দিন সকাল ন'টা প'য়তাল্লিশ মিনিটের সময় আমি প্যারাডাইস ল্যারগোতে হাজির হই। আমায় দেখে একজন গার্ড কেবিন থেকে বেরিয়ে এলো। সে তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে থাকে।

এবার আমি ওকে চিনতে পারছি। তারপরই মনে পড়ে, ওর নাম মাইক ও হ্যাগহার্ট। আমাদের পার্সেল এজেন্সীতে একজন অপারেটার ছিল। ও অবসর নেবার এক মাস পরে আমি ওখানে ঢুকি।

—মাইক! আমায় চিনতে পারছো? আমি জিজ্ঞেস করি।

—বার্ট! মাইক আমার হাতটা চেপে ধরে। কেমন আছো?

—ভালো, তা এখানে খ্রীষ্টমাস গাছের মত দাঁড়িয়ে কী করছো?

—এজেন্সী থেকে অবসর নেবার পর একটা হাল্কা চাকরির দরকার ছিল। না পেলে বেশ অসুবিধের পড়ে যেতাম। আমি রোগা হয়ে যেতাম। আমার কোন দাম থাকতো না।

—তোমার মত আমারও করতে হবে দেখছি! তা এখানে কোনরকম ওয়েটিং লিস্ট আছে?

—এ চাকরি তোমার পোষাবে না বার্ট। একবারে নিরামিষ জায়গা। তা এখানে কী ব্যাপারে?

—মিঃ রাস হ্যামেলের সঙ্গে সকাল দশটার সময় আমার দেখা হবার কথা।

—মিঃ রাস হ্যামেল?

- আমি তোমায় চেক করবো।

—আমায় চেক করার কী আছে! পুলটা তুলে দাও। আমি ভেতরে যাবো।

আমার কথা শুনে মাইক বলে, এটা ফ্লোরিডার মধ্যে সবচেয়ে নিরাপদ জায়গা। তাই এখানে চেক না করে কাউকে ভেতরে পাঠাবার নিয়ম নেই। সেই সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে রাখা একান্ত প্রয়োজন। এত সাবধানতা, তাই এখানে ছিনতাই বা চুরি করা একবারে অসম্ভব।

তারপর একটু থেমে আবার বলি, যদিও আমি জানি, তুমি কে, তবুও তোমায় আমি…।

—তুমি তোমার চেকের কথা আমায় বলো না, আমি একটু রেগে যাই।

এখানকার সব লোকদের তুমি চেক করো ?

—হ্যাঁ উচিত এবং করিও। না করলে আমার অবহেলা প্রকাশ পাবে। তাছাড়া, ওদের গাড়ির নম্বর আমার জানা। এবং আমি ওদের দেখে পর্দা তুলে দিই। কিন্তু তোমার মতন অপরিচিতদের ক্ষেত্রে...।

—ধনীদের সত্যি যোজা !

তারপর মাইক আমার চেক করে নিয়ে গ্রান্ড হাউসের দিকে ফিরে যায় এবং এর কয়েক মিনিট পরে পর্দাটা তুলে দেয়।

এরপর মাইক বলে, প্রথমে একটা অ্যাভিনিউ পড়বে তোমার বাঁ দিকে। সেটা হবে তৃতীয় দরজা ? সেখানে একটা টি. ভি. বসানো আছে নিরাপত্তার জন্য। ওখানে তুমি গাড়ি থেকে নেমে পড়বে। তোমার গাড়ির লাইসেন্স দেখাবে। তারপর লাল বোতামটা টিপে অপেক্ষা করবে। এরপর সব কিছু ঠিক আছে দেখে নিয়েই তবে তুমি ভেতরে প্রবেশ করতে পারবে।

—দারুণ সিকিউরিটি তো ! আমি ম্যাসারে বসতে বসতে বলি।

—হ্যাঁ, তা তুমি বলতে পারো।

তারপর আমি মাইকের কথা মত এগিয়ে চলতে থাকি। সামনে প্রায় পনেরো ফুট উঁচু ওক গাছের একটা শক্ত দরজা। দরজার গায়ে তারের কাঁটা জড়ানো, ওখানে আমি গাড়ি থেকে নেমে লাল বোতামটা টিপে অপেক্ষা করতে থাকি। এর আগে আমার গাড়ির লাইসেন্সটা দেখানো হয়ে গেছে। তারপর দরজাটা খুলে গেল।

আবার ভাবি, দারুণ নিরাপত্তার ব্যবস্থা। সহজে কেউ হ্যামেলের এখানে ঢুকতে পারবে না। এবং চেষ্টা করলে তার শোচনীয় পরিণতি হবে।

তারপর আমি বাঁকা বেঁকানো পথ ধরে এগিয়ে চলি। চারধারে লেবু গাছ। আর বাড়িগুলো দারুণ। এরপর আমি বাড়ির সদর জায়গায় একটা কালো লোক দেখতে পেলাম। ওর পরনে সাদা পোশাক। বয়স মাঝারী।

ওকে দেখে আমি ম্যাসারটা একটা ফোর্ড স্টেশন ওয়াগানের পিছনে দাঁড় করাই এবং গাড়ি থেকে নেমে তিন পাও যাইনি, তখন ঐ লোকটা বললো, গুড মর্নিং মিঃ এন্ডারসন। মিঃ হ্যামেল আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন। এই পথ ধরে আসুন।

আমি তাকে অনুসরণ করে একটা লবিতে হাজির হই। সেখানকার রং বাদামী ও কমলায় মেশানো। সঙ্গে একটা ছোট করিডর। সেটা পার হয়ে ফোয়ারা। তার কাছটা সিমেন্ট দিয়ে বাঁধানো। তার জলে মাছেরা শান্তভাবে সাঁতার কাটছে এবং তাদের পেটগুলো মোটা দেখাচ্ছে।

এখানে কতগুলো গার্ডেনিং চেয়ার পাতা এবং কাঁচ দেওয়া টেবিল রয়েছে। এসব পার হয়ে আমি বাড়ির পিছন দিকে এলাম। তারপর সরু দরজা দিয়ে

যেতে একটা বড় দরজা পেলাম। লোকটা বোতাম টিপতে দরজাটা খুলে গেল।

—স্যার। আপনি এগিয়ে যান, লোকটা ঘাড় ফিরিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বলে।

এখানকার ব্যাপার স্যাপার দেখে বুঝতে পারছি, বড়লোকেরা কিভাবে ছুটিয়ে ভোগ করছে! শুধু টাকার খেলা।

—আসুন মিঃ এণ্ডারসন, একটা কথা বেরিয়ে এলো, যে নিজের সম্বন্ধে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল।

আমি একটা বিরাট ঘরে প্রবেশ করেছি। ঘরটা এয়ার কণ্ডিসন। ঘরে চেয়ার, টেবিল, ককটেল কেবিনেট, টেপ রেকর্ডার, আই. বি. এম. মেশিন, সি-৮২ মডেলের একটা টাইপরাইটার ইত্যাদি সজ্জিত। এবং জানালা পথে বাইরের অবর্ণনিয় দৃশ্য ভেসে ওঠে।

রাস হ্যামেল একটা ডেস্কের পিছনে বসে আছেন। গোল মুখ। লম্বা চওড়া স্বাস্থ্য। গায়ের রং বাদামী।

রাস হ্যামেল চেয়ার ছেড়ে উঠে আমার দিকে হাত বাড়িয়ে দেয়, আপনার সঙ্গে মিলিত হয়ে খুশী হলাম। শুনলাম আপনি ছুটিতে যাচ্ছেন।

আমি হ্যামেলের কথায় সায় জানিয়ে ওর নির্দেশিত একটা গদি আঁটা চেয়ারে বসলাম।

তারপর চেয়ারে বসতে হ্যামেল বলে, কফি? পানীয়? একটা সিগার?

—ধন্যবাদ স্যার। এখন কিছু চাই না।

—আমি আপনার রিপোর্ট পড়েছি, হ্যামেল আমার দিকে তাকিয়ে বলে। রিপোর্টটা হ্যামেলের টেবিলের উপর রয়েছে। এখন বুঝতে পারছি না কেন আপনাকে আমার স্ত্রীর পিছনে অনুসন্ধান করতে লাগিয়েছি।

আমি হ্যামেলের দিকে তাকাই এবং আমার তাকানোর মধ্যে একটা পুলিশী দৃষ্টি ফুটে উঠেছে। সেই সঙ্গে ভেবে নিয়েছি, খুব মেপে কথা বলতে হবে। একটাও বাড়তি কথা নয়।

তারপরই আমার ন্যান্সির কথা মনে পড়ে যায়। সে বলেছিল, ওয়ালডো কারমাইকেল হ্যামেলের বইয়ের নায়ক।

তাই আমি বলি, এটা একটা সহজ কথা। আপনি একটা বই লিখছেন। সেই বইয়ের মাল মশলা সংগ্রহ করার জন্য নিজের স্ত্রীর বিরুদ্ধে কত ! আপত্তিকর চিঠি লিখলেন এবং আপনার এজেন্টকে বললেন, আমাদের ভাড়া করতে। আর এ ক্ষেত্রে আপনার মিসেস্ হাস্যকর ভূমিকা গ্রহণ করলেন। তারপর আপনি আমায় একা আপনার সঙ্গে দেখা করতে বললেন।

হ্যামেল প্রথমটা কোন কথা বলে না। এক দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে থাকলো। তারপর সে হাসিতে ফেটে পড়ে। এরপর হাসি থামিয়ে

বলে, আপনার ধারণাই ঠিক। আর এই বুঝতে পেরেছেন বলে আপনাকে আমার দারুণ ভালো লাগছে।

—আমারও আপনাকে।

—ভগবানের দোহাই দিয়ে বলুন তো, আপনি কী করে বুঝলেন?

—কারণ আমি একজন ডিটেকটিভ। আমার কাজ যেমন রহস্যের পিছনে খুঁজে বেড়ানো, তেমনি আপনার কাজ হলো ভালো বই লেখা।

—আপনি ঠিক ধরেছেন মিঃ এন্ডারসন, আর আপনাদের এজেন্সীর প্রশংসা না করে কিছুতেই থাকতে পারছি না।

তারপর হ্যামেল আবার বলে, আপনার রিপোর্টটা সত্যি তাৎপর্যপূর্ণ। এবার আপনি কী আপনার সম্বন্ধে আমায় কিছু বলবেন? এবং আমার ইচ্ছে সেগুলো আমি বইতে ঢোকাই।

—কিন্তু স্যার…।

—বলুন, সংকোচ করবেন না।

—আমার বলতে আপত্তি নেই।

—ধন্যবাদ! তার জন্য আমি আপনার সময় নষ্ট করছি ঠিকই। এর জন্য আমি আপনাকে পারিশ্রমিক হিসেবে কিছু দেবো।

হে ঈশ্বর! এবার থেকে কী আমার কাছে এইভাবে টাকাই আসতে থাকবে, আমি মনে মনে ভাবি।

তারপর বলি, ধন্যবাদ স্যার। বলুন, আপনি আমার কাছে কি জানতে চান।

এরপর প্রায় আধঘণ্টা ধরে আমায় একের পর এক প্রশ্ন করে গেল। তার মধ্যে কোনটা ছোট, কোনটা বড়। তারপর জানতে চাইলো আমাদের এজেন্সী সম্বন্ধে। কী ভাবে আমাদের ট্রেনিং দেওয়া হয়। এবং আমার অতীত ইতিহাস।

প্রতিটি প্রশ্ন বুদ্ধিদীপ্ত। ফলে আমি মনে মনে হ্যামেলের তারিফ না করে কিছুতেই থাকতে পারি না।

শেষে হ্যামেল মাথা নেড়ে বললো, মিঃ এন্ডারসন আমি ঠিক যা চেয়েছি, তা আপনার কাছ থেকে পেলাম। আপনি আমায় যে তথ্য জানালেন, তা শুধু আমার বইয়ের পক্ষেই মূল্যবান নয়, এতে আমার ব্যক্তিগত জ্ঞানও বাড়লো।

—স্যার, এটা ঠিক কথা? আমি একটু লজ্জিতভাবে হাসি।

—হ্যাঁ, তারপর হ্যামেল বলে। আমার গল্পে একজন মহিলা বিয়ে করে একজন বাস্তু শল্য চিকিৎসককে। সে ডাক্তারের চেয়ে বয়সে অনেক ছোট। তার স্ত্রীর সম্বন্ধে নানা ধরণের কুৎসিত চিঠি পেতে থাকে। সুতরাং সে তাকে অনুসরণ করতে শুরু করে দেয়।

এরপর হ্যামেল একটু থেমে আবার বলে, এটা একটা ঈর্ষার কাহিনী।

যেখানকার ডিটেকটিভও এমন একটা নির্দোষ রিপোর্ট দেয় যে, তার স্ত্রী কোন বাজে ব্যাপারে নেই। এবং একেবারে নিঃসঙ্গ জীবনযাপন করছে। আর আমার স্ত্রীর ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য হলো। এবং সেই কারণে আমি তাকে ব্যবহার করেছি।

তারপর হ্যামেল আমার দিকে হেসে তাকিয়ে বলে, জানতাম এটা কোনো রিস্কের ব্যাপার হবে না এবং তার সম্বন্ধে এমনিই রিপোর্ট পাবো।

তুমি তো জানো কী বিষাক্ত কীটের ঢাকনা তুমি খুলে ফেলেছো! ভাবি, জানতে পারলে তোমার মুখের ঐ গর্বভরা হাসি এক ফুৎকারে মিলিয়ে যাবে। এবং চেয়ারে বসে থাকার পরিবর্তে ক্যাপা কুকুরের মত রাস্তায় ঘুরে বেড়াতে হবে।

—আমি আপনার কাছে কৃতজ্ঞ মিঃ এন্ডারসন, হ্যামেল বলে চলে। এ ধরণের বড় এবং সুন্দর রিপোর্টের জন্য। তবে আমি ঠিক বুঝতে পারছি না, আমি যখন লিখি তখন আমার স্ত্রী কী ধরণের নিঃসঙ্গ জীবনযাপন করে।

আমি এর কি জবাব দেবো তাই না বুঝতে পেরে চুপ করে থাকি। আমার বুকের মাঝে হাতুড়ির শব্দ।

—ধন্যবাদ আপনাকে মিঃ এন্ডারসন, বলে হ্যামেল আমার দিকে একটা সীল করা খাম এগিয়ে দিয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়। এটা আপনার ফি।

—ধন্যবাদ মিঃ হ্যামেল, আমি খামটা তুলে নিয়ে দরজার দিকে এগিয়ে যেতে থাকি।

দরজার কাছে এসে দেখি, সেই কালো লোকটা দাঁড়িয়ে আছে। হয়তো আমার জন্য অপেক্ষা করছে!

—আবার দেখা হবে, বলে হ্যামেল মাথা নাড়িয়ে স্টাডি রুমে চলে গেল।

আমি মাথা নাড়িয়ে ম্যাসারে ফিরে এসে একটা সিগারেট ধরাই এবং ভাবি, হ্যামেল কখন জানতে পারবে যে সে একজন হত্যাকারীকে বিয়ে করেছে। তবে এখনই আমি তাকে জানাতে পারি, কিন্তু জানাবো না আমি তাকে ভালোবেসে ফেলেছি।

এবার আমি কাঁপা হাতে সীল করা খামটা খুলি। তাতে দেখি, পাঁচশো ডলারের একটা বিল রয়েছে। বিলটাকে আমি চুমু খাই।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

কোন কিছুই চিরস্থায়ী নয়। তবে রঙীন স্বপ্নের অনেক কিছুই ক্ষয় হয় না।

বার্থা আমার গায়ে হেলান দিয়ে ইয়াটের ডেকে শুয়ে আছে। চারিদিকে রোদে ভেসে যাচ্ছে। আমি চার সপ্তাহ এই বিলাসবহুল ইয়াটে কাটিয়ে ফিরছি।

বার্থা কুড়ি হাজার ডলারেই ইয়াটটা ভাড়া করতে পেরেছে। তবে নাবিক, পানীয় এবং পাচকের জন্য আরো অনেক পড়বে। তা যখন জানলাম তখন বুঝলাম, ঐ সবুজ নোটগুলো আর কিছুই রইলো না। সব শেষ।

এতে মন খারাপ হলো ঠিকই। সঙ্গে সঙ্গে আবার বুড়ো বাবার কথা মনে পড়লো। বলতো, যদি টাকা থাকে তাহলে কখনো কিপ্টের মত জীবনধারণ করবে না।

তাই আমি মনে মনে বলে উঠি, বাবার কথাই ঠিক। নইলে টাকা কিসের জন্য?

আমরা কাম্যান আইল্যান্ড, বারমুডা, দা বাহামা এবং মার্টিনিকুই ঘুরেছি। সেই সঙ্গে সাঁতার কেটেছি। ভালো খাবার খেয়েছি। রোজ চার বোতল করে স্যাম্পেন উড়িয়েছি। সেই সঙ্গে রাম দিয়ে পাঞ্চ করে খেয়েছি। তাতে বার্থা আরো সেক্সি হয়ে উঠেছিল। এছাড়া, আমরা ভ্রমণরত অন্য ইয়াটের টুরিস্টদের আপ্যায়িত করেছি।

আমি জানি, কিছু চিরদিন অবশিষ্ট থাকে। শুধু মজা লুটে যাও। যাকু এখন আমরা প্যারাডাইস সিটির দিকে চলেছি। আজ বিকেলে পেঁছে যাবো।

—তুমি গুছিয়ে নিয়েছো বার্থা? আমি ওর দিকে তাকাই।

—ও কথা বলো না, বার্থা প্রবলভাবে মাথা নাড়ে। এভাবে ঘোরা শেষ হবে তা এখনই জানিও না।

—আমার ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য, কিন্তু বার্থা, গুছিয়ে নেওয়া ছাড়া উপায় নেই। বলে আমি বার্থাকে ছেড়ে উঠে দাঁড়াই। আমি প্রথম গোছগাছ করছি। তুমি পরে।

—তুমি যাও দেখি! বার্থা একটু রেগে যায়।

আমি কেবিনে এসে চারদিকে তাকাই। এখানের সর্বত্র যেন একটা মিষ্টি-

ধোঁয়া ছড়িয়ে রয়েছে, যা এ মুহূর্তে আমায় বিহ্বল করে তুলেছে। তারপর আশাহতভাবে সুটকেশটা তুলে এনে বিছানার উপর রাখি।

তারপর দরজায় একটা টোকা পড়ে। এরপর ইয়াটের প্রধান স্টুয়ার্ট-কাম-বার্টলার—কাম ভালেট এসে হাজির।

আমি স্টুয়ার্টের দিকে তাকাই। লোকটা লম্বা তবে রোগা। লোকটা আমাদের দিকে সর্বক্ষণ নজর রেখেছে, যাতে সামান্য ত্রুটি পর্যন্ত না হয়।

স্যার, আপনার সুটকেশটা গুছিয়ে দিলে খুশী হবো, আর আজ বিকেলে যে আমরা পেঁছে যাবো তা যেন এখনো বিশ্বাস করতে পারছি না।

—আমারও ঠিক তোমার মতন একই অবস্থা। ঠিক আছে গুছিয়ে দাও। মিসেস এণ্ডারসনেরটাও দিও।

ভদ্রতার খাতিরে আমরা স্বামী স্ত্রীর পরিচয় দিয়েছি। তবে নাবিক, ক্যাপ্টেন ইতালিরা বোধ হয় আমাদের পরিচয়টা বিশ্বাস করেনি। অবশ্য তাতে কিছু যায় আসে না।

তারপর স্টুয়ার্ট আমার দিকে তাকিয়ে একটা খাম আমার দিকে এগিয়ে দেয়, স্যার, এতে হিসাব আছে।

—ইয়াট তীরে ভিড়বার আগে এটা আমাদের শেষ করতে হয়। এটা আমাদের নিয়ম।

—নিশ্চয়ই আমি মাথা নাড়ি। এ ব্যাপারটা ঠিক করছি।

—আচ্ছা, আর স্যার, মোট বিলের শতকরা পঁচিশ ভাগ নাবিকেরা পেয়ে থাকে এবং এটা আমি আপনার তরফে করতে পারলে খুশী হবো।

—পঁচিশ ভাগ?

তারপর স্টুয়ার্ট বিনয় প্রকাশ করে বলে, ওটাকে আপনি ইচ্ছে করলে বাড়াতে পারেন।

—আচ্ছা। আচ্ছা, আমি স্টুয়ার্টকে অতিক্রম করে সেলুনে প্রবেশ করি আমার মুখ ডেকের দিকে।

আমি বিলটা খাম থেকে বার করি। তাতে মোট ছত্রিশ হাজার ডলারের হিসেব দেওয়া আছে। এছাড়া, স্টুয়ার্ট পেনসিল দিয়ে আরো ন-হাজার ডলার লিখেছে। অর্থাৎ মোট পঁয়তাল্লিশ হাজার ডলারে দাঁড়ালো।

আমি আস্তে আস্তে নিশ্বাস নিতে থাকি। তারপর হিসেবের দিকে চোখ বোলাই। এবং একটা পেনসিল বার করে হিসেব করতে থাকি।

একটু পরে বুঝতে পারি, আমার কাছে আরো দু-হাজার তিনশো ডলার থাকবে। অথচ তার চার সপ্তাহ আগে পঞ্চাশ হাজার ডলার আর হ্যামেলেরটাও ছিল।

আমি ডেকে ফিরে আসি। চারদিক রোদে ভেসে যাচ্ছে। বার্থা এক পেগ

স্যাম্পেন শেষ করে এক পেগ চালাচ্ছে।

—খুব তাড়াতাড়ি দেখছি! বার্থা আমার দিকে তাকায়। আবার যেন বলো না তোমার গোছানো হয়নি।

—স্টুয়ার্টকে বলো তোমার আমার দুটোই গুছিয়ে দেবে।

—তা যাই বলো বার্ট! কী সুন্দর জীবন! বার্থার চোখে যেন গোলাপী নেশা।

—হ্যাঁ, কিন্তু শেষ হয়ে আসছে।

তারপর আমি বার্থার দিকে বিলটা এগিয়ে দিই। বার্থা কিছুক্ষণ বিলটার দিকে তাকিয়ে আমায় ফেরত দিয়ে বলে, সত্যি, অনেক হয়ে গেছে তো! কিন্তু আমার স্বপ্নটা যেন ভাঙতে চাই না।

—এটা আমাকে আবার গরীব করে তুললো!

—এ কথা ভেবো না। তোমার এখনো চাকরি রয়েছে।

—হ্যাঁ, তা অবশ্য ঠিক।

বার্থা আমায় এক পেগ স্যাম্পেন ঢেলে দিয়ে আমায় মৃদু চাপড় মারতে মারতে উৎসাহিত করতে থাকে। বলে, বার্ট, মুখটা এমন কালো করো না! টাকা হলো গিয়ে খরচের জন্য।

আমি এ কথার জবাব না দিয়ে বার্থার পাশে বসি। ভাবি, পঞ্চাশ হাজার ডলার বলতে গেলে শেষ। এই টাকাটা ডিয়াজ দেবার সময় শাসাতেও ছাড়েনি। ফের ওকে চাপ দিলে বিপদের মুখে পড়তে হবে তাও বলেছে।

তারপর আমি ভাবি, আমি কী বোকা? পঞ্চাশ হাজার ডলারেই রাজি হয়ে গেলাম। ডিয়াজকে চাপ দিলাম না। এই সাপটাকে কী আমি ভয় পাই?

ইতিমধ্যে বার্থা আমায় বলে, বার্ট, তুমি কোন বিষাক্ত পোকার ঢাকনা খুলেছো?

—যা বলেছি তার চেয়েও আরো কিছু খারাপ হতে পারে।

—তুমি মুখে বলছো সাংঘাতিক খারাপ, অথচ তোমায় পঞ্চাশ হাজার ডলার দিয়ে মুখ বন্ধ করে দিল!

হ্যাঁ, তা তুমি বলতে পারো। সত্যি, আরো বেশী চাওয়া উচিত ছিল। কিছুটা বোকামি করে ফেলেছি।

তুমি আরো বোকামি করেছো।

তুমি ডিয়াজের কাছে গিয়ে খুব ভুল করেছো। তোমার ন্যান্সির উপর চাপ দেওয়া উচিত ছিল।

আমি বার্থার দিকে তাকিয়ে বলি, তুমি জানো না তুমি কী বলছো।

আমি এজেন্সীর হয়ে কাজ করছি। সরাসরি তার কাছে যাওয়া যায় না।

তুমি যখন তার সম্বন্ধে অনেক আজেবাজে ব্যাপার জানতে পেরেছো তখন তার কাছে সরাসরি চাপ দিলে এর চেয়ে অনেক টাকা বেরিয়ে আসতো।

এখানেই তুমি একটা মস্ত ভুল করেছো। মনে রেখো সে রাল হ্যামেলের স্ত্রী।

বার্থা, পুরো ঘটনা তুমি জানো না।

বার্থা একটা সিগারেট ধরিয়ে বলে, ঘটনাটা বলো শুনি।

তুমি এর মধ্যে নিজেকে জড়িও না।

বলতে যখন বলছি তখন বলো! বার্থা আমার দিকে একটু কঠোর ভাবে তাকায়।

তুমি বলেই বলছি, এ সব থেকে দূরে থাকো।

বিপদের কথা বলো নাতো। বলো, তাড়াতাড়ি বলো।

শোন, আমি বার্থাকে সমস্ত ঘটনা বলে খানিকটা হাল্কা বোধ করছি।

সব শুনে বার্থা বললো, তুমি নিশ্চিত যে, ন্যান্সিই লুসিয়া প্রোফারি, যে দু' দুটো খুনের দায়ে জড়িত?

হ্যাঁ, এতে আমার মনে আর কোন সন্দেহ নেই।

আমার কথা শুনে বার্থা অশান্তভাবে চুলে হাত বোলাতে থাকে। কখনো বা চোখ বন্ধ করছে বা খুলছে। তারপর বলে, বার্ট, তুমি একটা দারুণ কাজ করেছো।

তবে তুমিও একটা কথা ভুলে যেও না।

ন্যান্সি আমায় জেলে পাঠাতে পারে।

তাই তুমি বুঝি পঞ্চাশ হাজার ডলারে রাজি হয়ে গেলে?

আমি একশো হাজার নিতে পারলাম, কিন্তু ডিয়াজের টেবিলে ঐ সবুজ নোটগুলো দেখে আমি যেন কেমন দিশেহারা হয়ে পড়ি।

তাছাড়া, ন্যান্সিকে আমি চাপ দিতে পারতাম, কিন্তু ঐ ডিয়াজ লোকটা সাংঘাতিক। ডিয়াজও বললো, এর বেশী ওর দেবার ক্ষমতা নেই।

আমি আবার বলছি, পঞ্চাশ হাজার ডলার নিয়ে তুমি ভুল করেছো। তুমি চাপ দিতে পারতে। তাহলে ডিয়াজ তোমায় কিছুই করতে পারতো না। কারণ তুমি সেলভির কাছে রিপোর্ট পাঠিয়ে দিয়েছো। এবং তুমি ওকে অতি সহজেই বড়শিতে গাঁথতে পারতে।

বার্থার কথা শুনে আমার কপাল থেকে ঘাম ঝরতে থাকে। ভাবি, সত্যি, আমি কিছুটা বোকামী করে ফেলেছি।

এতে তুমি ভেঙে পড়ো না, বার্থা আমার হাতে হাত রাখে। তোমার হাতে এখনো একটা বঁড়শি আছে, যা দিয়ে তুমি একটা বিরাট মাছ গাঁথতে পারো।

তারপর আমি সমুদ্রের দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে বার্থার দিকে তাকিয়ে বলি, আমারও এসব চিন্তা আছে। আমি পঞ্চাশ হাজার ডলার পেয়েছিলাম। তা দিয়ে আমরা আনন্দ ফূর্তি করেছি এবং খরচও হয়ে গেছে। আমি সোমবার থেকে আবার কাজে জয়েন করছি, এবং আমরা আগের মতন আবার ডবল বেডের বিছানায় শুয়ে তারপর আমি বার্থাকে আদর করতে করতে বলি, তুমি কোন হুক আর বড় মাছের কথা বলছিলে?

আমার কথা শুনে বার্থা মোটেই খুশী হলো না। উল্টে রাগতভাবে বললো, এক এক সময় ভাবি, সত্যি, তোমার মাথাটা পরীক্ষা করিয়ে নেওয়া দরকার। তুমি কেন ন্যান্সির কাছে গেলে না! আর তুমি যখন জানতে পেরেছিলে, সে প্রোফারির কাছে গেছিল এখন তুমি তাকে অনায়াসে বেকায়দায় ফেলতে পারতে এবং ডিয়াজের কাছে তোমার যাবার কোন প্রয়োজন ছিল না।

সেটা এখন বুঝতে পারছি। ভেবেছিলাম, মৃদু চাপ দিলেই......। কিন্তু কিছু তো পেয়েছি।

হ্যাঁ তা পেয়েছ বই কী! কিন্তু তার কী-ই বা অবশিষ্ট আছে!

তা ঠিকই।। তা বেবী, তুমি কোন বঁড়শি আর মাছের কথা বলছো? এই ব্যাপারে একটু আলোকপাত করে দেখি!

রাস হ্যামেল। তার কাছে তোমার প্রথম যাওয়া উচিত ছিল। তুমি কী এটা ভেবে দেখনি?

এখনো বলছি বার্ট, তার সম্বন্ধে নতুন করে ভাবো। তার বই বাজারে দারুণ কাটতি। পয়সা লুটছে দু'হাতে। আর ন্যান্সিকে সে বিয়ে করেছে এবং তার দিকে দারুণভাবে ঝুঁকে আছে। তার উপর এটা তার আবার দ্বিতীয় বিয়ে।

বার্থা আরো বলে, তার প্রথমা স্ত্রী ব্যাভীচারিনী। তার উপর সে যদি জানতে পারে, ন্যান্সি ইতালির সন্ত্রাসবাদী দলে রয়েছে এবং দুটো খুনের দায়ে পুলিশ তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। এসব কথা বললে তার মনে কী প্রতিক্রিয়া হবে বুঝতে পারছো!

তুমি কথা বলতে পারো ঠিকই, আমি বলি। আরো কী বলবে বলো? এবং তোমার কথার মধ্যে যথেষ্ট যুক্তিও আছে।

হ্যামেল একজন বিশ্ববিখ্যাত লেখক। প্রথমটা শুনে রেগে-মেগে কাত হয়ে পড়লেও পরে তোমার কাছে সে মাথা নত করতে বাধ্য। কারণ স্ক্যান্ডেল প্রেসে ছড়িয়ে পড়তে সে নিশ্চয়ই দেবে না। আর ইতালির জেল থেকেও সে তার স্ত্রীকে বাঁচাতে চাইবে। সুতরাং এর বিনিময়ে অনেক—অনেক কিছু দিতে সে রাজি থাকবে।

—কিন্তু হ্যামেল যদি শোনে, তার আগে ন্যান্সি প্রোকারিকে বিয়ে করেছে, তখন ?

—তা হ্যামেল জানবে কী করে ! শুধু ইতালির পুলিশ বলছে, তাই না ?

—হ্যাঁ, আর তা যদি করে না থাকে তাহলে ইতালির পুলিশই বা বলতে যাবে কেন !

—ছাড়ো এসব কথা ! বার্থা আগের মত রেগে যায়। তুমি আসল কথা থেকে অনেক দূরে সরে যাচ্ছো। আমি বাজি ধরে বলতে পারি, ঐসব কথা হ্যামেল শুনলে তোমায় টাকা দিতে বাধ্য হবে। আর ন্যান্সি তাকে চিট করছে শুনলেও······ ।

এসব কথা শুনে আমি বেশ উত্তেজিত বোধ করি। ভাবি, হ্যামেল নিশ্চয়ই এই ঠকাবার কথা লোকদের জানতে দিতে চাইবে না। সুতরাং আমি এ ব্যাপারে বার্থার সঙ্গে একটা বাজি ধরতে পারি।

আর বার্ট, এ মাছটাকে ভালো করে বঁড়শিতে গাঁথো। কিছুতেই লাফিয়ে দিতে যেও না। গেলে শুধু আঙুল কামড়াবে, আফসোসের অন্ত থাকবে না। আর এই বুড়ো মাছ তোমায় অন্ততঃ এক মিলিয়ান ডলার দেবে।

তুমি আমার কথামত কাজ করে যাও, তাহলেই বুঝবে কথাটা যা তা নয়। আর তখনই আমার কথা সত্যি না মিথ্যে বুঝতে পারবে। এবং ঐ লোকটা টাকার পাহাড়ে চেপে বসে আছে। ওর কাছে এক মিলিয়ান কিছু নয়। হাতের ময়লা।

কিন্তু বেবী, এ কথা শুনে হ্যামেল রেগে মেগে যদি পুলিশ ডাকে, তখন আমার অবস্থা কী হবে, তা কী একবার ভেবে দেখেছো !

দেখেছি তাহলে ন্যান্সির কী অবস্থা হবে ! তুমি হ্যামেলের কাছে এবং ওখানে গিয়ে তোমার কথাগুলো জিনের পেটির মত বেচে দিয়ে।

ভাবি, সত্যি, বার্থার কথাগুলো ফেলনা নয়। এক মিলিয়ান ডলার পেলেও পেতে পারি। কথাগুলো অনেক দামে বেচতে পারে।

আমি ফিরে এসেছি। অ্যাপার্টমেন্টে পা দিয়ে প্রথমেই হাওয়ার্ড সেলভিকে ফোন করি। বলি, ছুটি থেকে ফিরে এসেছি। এবং কাজে লেগেছি। আর খামটা ভালো করে রাখো। এবার প্রতি সপ্তাহে তোমায় জানাবো বেঁচে আছি কী না !

—তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে, তুমি দারুণ একটা শক্তিশালী দলের সঙ্গে লড়ে চলেছো। আর তুমি কী মনে করছো, এটা একটা বিপদজনক ব্যাপার ?

—না। তবে কোন ঝুঁকি নিতে চাইছি না। ঠিক আছে সেলভি, বলে আমি রিসিভার নামিয়ে রাখি।

তারপর সোফায় ফিরে এসে গ্লাসে স্কচ ঢালি। ভাবি, চার সপ্তাহ আমি প্যারাডাইস সিটির বাইরে ছিলাম। এর মাঝে কী ঘটেছে না ঘটেছে তা আমি জানো জানি না। এখনো হতে পারে প্রোক্তারি ধরা পড়েছে। কোল্ড-ওয়েল জানতে পেরেছে ন্যান্সি কে? এ রকম আরো কত কী ঘটনা ঘটতে পারে।

তারপর আমি নিজেই নিজেকে গালাগালি করে বলি, এ সব যদি ঘটে থাকে তারপর আমি হ্যামেলের কান কামড়াতে গেলে ·····।

আরো ভাবতে থাকি, কপালে ঘাম ফুটে উঠেছে। আমি যেন স্পষ্ট জেলের দরজার শব্দ শুনতে পাচ্ছি।

এরপর ভাবি, 'প্যারাডাইস হ্যারল্ড পত্রিকার' মাধ্যমে এসব তাড়াতাড়ি জানা দরকার। তারপর আমি দেয়াল ঘড়ির দিকে তাকাই। সময় সাড়ে চল্লিশ।

ভাবি, এ সময় ফেনি ডিউটিতে রয়েছে স্কচ শেষ করে ম্যাসায় নিয়ে বেরিয়ে পড়ি।

—বাঃ, গায়ের রং তো বেশ পুড়িয়ে এনেছো! আমি ফেনির অফিসে ঢুকতে ও আমার দিকে তাকিয়ে চকচকে চোখে বলে ওঠে। সময়টা বেশ ভালো ভাবে কেটেছে, তাই না?

তা তুমি বলতে পারো, আমি চেয়ারে বসে হাতটা ডেস্কে রেখে ফেনির দিকে দুষ্টুমির হাসি হেসে বলি, সময়টা বড্ড তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে গেল। তুমি কবে ছুটিতে যাচ্ছো?

সামনের মাসে আমায় একবার জার্জিয়া যেতে হবে। বাড়ির ব্যাপারে।

হ্যাঁ, তা আমি জানি। এখানকার নতুন খবর কী? কোন রোমাঞ্চকর ঘটনা ঘটেছে?

সে রকম কিছু নয়। এক গাদা বড়লোক বাইরে ছুটি কাটাতে গিয়ে এখন বাড়িতে ফিরে এসেছে। না, এ ছাড়া তোমায় আর কোন খবর দিতে পারছি না।

কোন অপরাধের ঘটনা?

কয়েকটা ছিনতাইয়ের ঘটনা ছিল। তারা সব হাতেনাতে ধরা পড়েছে। ওগুলো ছিল হিপি। ওরা একটা নাচ ঘরের ক্যাশ লুট করতে গেছিল। আর তার দু'মিনিট পরেই……। আর কিছু নেই।

আমি একটা স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়লাম। ভাবি, প্রোক্তারি ধরা পড়লে ফেনি ঠিক আমায় বলতো।

তবু আমি নিজেকে নিশ্চিত করার জন্য বলি, তাহলে প্যারাডাইস সিটি আগের মতনই আছে?

হ্যাঁ, তবে গত রাতে হিট-এন্ড-রান গাড়ির ধাক্কায় পেনি হাইবি প্রাণ

হারায়।

অ্যাটর্নির স্ত্রী? ভাবি, ফোনির ভুলও হতে পারে।

হুঁ। একটা মাতাল তার গাড়িকে ওভারটেক করতে গিয়ে দুর্ঘটনা বাঁধিয়ে বসে। দু'জন তা দেখেছে। তারা বলেছে, নিয়ম না মেনে বেপরোয়া ভাবে চালাতে গিয়েই…।

এটা একটা খারাপ খবর।

হ্যাঁ, আর হাসপাতালে যাবার পথে পেনি হাইবির মৃত্যু হয়।

ড্রাইভার ধরা পড়ে নি?

—দু'জন সাক্ষীর কেউ নম্বরটা লক্ষ্য করেনি। একজন বলেছে, গাড়ির রং নীল। আবার অন্যজন বলেছে। সবুজ।

ভাবি, ন্যান্সির অন্তরঙ্গ এবং ঘনিষ্ট বন্ধু ছিল পেনি হাইবি। তারপর ফোনিকে জিজ্ঞেস করি, এটা কী শুধু একটা দুর্ঘটনা, নাএর পেছনে অন্য কিছু লুকিয়ে আছে?

—আমরা এ ব্যাপারে অনেক কিছু লিখেছি, ফোনি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়। দেখবে নাকি?

—না, ঠিক আছে! তারপর ঘড়ির দিকে তাকাই। সোমবার থেকে আবার কাজ।

—আমাদের সবারই তো সেই একই কথা, তারপর আমি যখন দরজার কাছে গেছি তখন ফোনি বললো। একটা কালো বাচ্চা ছেলে বন্দরে মাছ ধরতে গিয়ে মারা যায়। এ ব্যাপারে তোমার জানার নিশ্চয়ই কোন আগ্রহ নেই।

কোন্ বাচ্চা ছেলেটা? আমি সঙ্গে সঙ্গে ফোনির দিকে ঘুরে তাকাই।

ঐ বন্দরের একটা ছেলে। জলে পুলিশ খুঁজে পেয়েছে। পা পিছলে পড়ে সম্ভবত মাথাটা ফেটে গেছে। নাম জিম্বো রসালিওলা।

আমার যা জানার তা জানা হয়ে গেছে। জিম্বো জয়ের ভাই। কিন্তু পা পিছলে পড়ে…।

তারপর জিজ্ঞেস করি, এটা কখন ঘটেছে?

—গত রাতে।

—ধন্যবাদ ফোনি, চলি, এসে ম্যাসারে বসি।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস, দুটো মৃত্যুর ব্যাপারেই ন্যান্সি এবং গ্রোফারির হাত রয়েছে। এসব কথা আমি আনমনা হয়ে ভাবছি।

পেনি হাইবি হয়তো ন্যান্সির আসল পরিচয়টা জানতে পেরেছিল। ফলে তাকে নির্মমভাবে সরে যেতে হলো। অথচ দু'জন ঘনিষ্ট বন্ধু ছিল। তারপর ন্যান্সির হয়ে গ্রোফারি…।

আর জিম্বোর ব্যাপারে আমার মনে পড়ে, জয়কে আমি বার বার সাবধান

করে দিয়ে বলেছিলাম, ডিয়াজের কাছ থেকে দূরে সরে থাকবে। তখন জয় আমাকে হেসে আমার কথায় সায় জানিয়েছিল। কিন্তু পরে···। আর কিংবা হয়তো ডিয়াজের খুব কাছে পৌঁছ । যেমন পৌঁছল টম আর পেটে।

তারপর আমার মনে পড়ে, এখনি একবার জয়ের সঙ্গে আমার দেখা করা দরকার । এরপর আমি গাড়ি চালিয়ে বন্দরের দিকে এগিয়ে যাই। এবং এখানে গাড়ি পার্ক করে লবস্টার কোর্টের দিকে তাড়াতাড়ি হাঁটতে থাকি।

ওখানে পৌঁছে দেখি, রাস্তায় একপাদা ছেলে ফুটবল খেলছে এবং খেলার মাঝে একবার আমার দিকে তাকালো।

আমি যখন জয়ের বাড়ির দিকে এগিয়ে যেতে থাকি তখন একটা ছেলে বললো, হে মিঃ ।

আমি ছেলেটির দিকে ঘুরে তাকাই। ছেলেটির বয়স ন'বছর হবে। পরণে নোংরা পোশাক।

সে আমার কাছে এসে বললো, জয়কে খুঁজে কোন লাভ হবে না। সে এখানে নেই।

—কোথায় গেছে ?

—তা আমি আমি জানি না।

আমি ওর দিকে এক ডলারের একটা বিল এগিয়ে দিয়ে বলি, বলো, কোথায় গেছে ?

তারপর সে লোভীর মত বিলটার দিকে তাকিয়ে বলে, আপনি মিঃ এণ্ডারসন তাই না ?

—সে কোথায় গেছে তা আমায় বলে যায়নি। কিন্তু আপনাকে বলতে বলেছে, লোকটা এখনো এখানে রয়েছে।

—তুমি জানো না সে কোথায় গেছে ? আমার সঙ্গে তার দেখা হওয়া খুবই প্রয়োজন বলেই ছেলেটির দিকে আমি আর এক ডলারের একটা বিল এগিয়ে দিই।

—আমি জানি না। ও বাসে করে যেন কোথায় গেছে। এবং সঙ্গে একটা সুটকেশ নিয়ে গেছে।

কোথাকার বাসে ?

দা কি ওয়েস্টের বাসে।

ঠিক আছে। আর শোন, তোমার সঙ্গে যদি তার দেখা হয় আমায় ফোন করতে বলবে।

ছেলেটা বিলটা পকেটে পুরতে পুরতে মাথা নাড়ে, আচ্ছা স্যার।

আমি অ্যাপার্টমেণ্টে ফিরে এসেছি। খুব চিন্তিত এবং নিরাশ বোধ করছি।

ভাবি, কি ভাবে রাতটা কাটাবো। তারপর আমি গাড়ি করে বার্থার উদ্দেশ্যে রওনা হই।

—আরে কী ব্যাপার? বার্থা সদর দরজা খুলতে খুলতে আমায় দেখে বলে, তা তোমার কাছে কী আছে? আর একবারে অ্যাপার্টমেন্টে হাজির।

বার্থা বরাবরই অগোছালো। খাটের উপর আধ খোলা অবস্থায় একটা স্যুটকেশ পড়ে রয়েছে। উপরে একগাদা জামা কাপড়।

—বেবী, এর কিছু ফেলে দাও, আমি বলি। আমরা এখন খেতে বেরিয়ে পড়বো। আর তোমার সঙ্গে আমার কিছু জরুরী আলোচনাও আছে।

আমার কথা শুনে বার্থা হেসে পাশের ঘরে গেল। ওটা ওর শোবার ঘর। এবং মিনিট দশেকের মধ্যে সে সুন্দরভাবে সেজে বেরিয়ে এলো, যা একমাত্র ওই পারে।

—কিছু ঘটেছে? বার্থা জানতে চায়।

—হ্যাঁ। চলো, এখন আমরা 'চিজ লুইসে' যাই। সেখানে গিয়ে কথা হবেখন। তাছাড়া, আমার একজন শোবার পার্টনার দরকার।

—পার্টনার? শোবার জন্য? বার্থা মিটিমিটি হাসে।

—এটা কোন একটা সমস্যাই নয়, বার্থা আমার হাতের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে দেয়।

আমি ভাবি, অন্যবার বার্থা গাড়িতে ওঠার আগে জানতে চায়, কোথায় যাবো, কি খাবো ইত্যাদি। কিন্তু আজ কিছুই জিজ্ঞেস করলো না। আর ও হয়তো ভাবছে, আমি এক মিলিয়ানের মালিক হতে যাচ্ছি।

তারপর আমরা একটা ছোট রেস্তোরায় ঢুকলাম। রেস্তোরার অর্ধেক খালি। এবং চেয়ারে বসে কাঁকড়া আর মাংসের অর্ডার দিয়ে বার্থাকে খবরটা জানলাম।

—এটা একটা দুর্ঘটনা হলেও হতে পারে। বার্থা মন্তব্য করে।

—না, না, বার্থা। হাইবি গত রাতের আগের রাতে, আর জিম্বো গত রাতে মারা গেছে। ডিয়াজরা বড় সাংঘাতিক লোক।

—তারা তোমার কিছু করতে পারবে না

—তা আমি অবশ্য ভাবি না।

আমি এখনো হ্যামেজের সঙ্গে কথা বলে উঠবার মত সুযোগ পাইনি।

সুযোগ করে নিতে হয়।

কিন্তু সেই সুযোগই তো পাচ্ছি না।

অ্যাটর্নির স্ত্রী পেনি হাইবি মারা গেল, আমি শান্তভাবে বলি, তাই অনুকূল পরিবেশ না হলে···।

বার্থা কাঁকড়ায় কামড় দিয়ে বলে, এটাকে তুমি অনুকূল পরিবেশ বলছো

না কেন ?

না, আমি এখন ওখানে যেতে চাই না, বলে আমি প্যারাডাইস সিটির কথা জানাই।

উঃ, বড়লোকেরা কী-ভাবেই না আছে !

আমি কয়েকদিন অপেক্ষা করে হ্যামেলকে টেলিফোন করবো এবং কিছু লিখতে চাই না। আর লিখলে সেটা প্রমাণ হিসেবে থেকে যাবে।

বার্থা খেয়ে চলেছে, কিন্তু তাকে যথেষ্ট চিন্তিত দেখাচ্ছে। তারপর সে প্লেটের উপর থেকে মুখ তুলে আমার দিকে তাকিয়ে বললো, পোনি হাইবির অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় যেও।

ওখানে গিয়ে আমি কী করবো !

এজেন্সী হাইবির হয়ে কোন কাজ করেনি ?

হ্যাঁ, তা করেছে বই কী ! এবং অনেকেই।

এটা চিন্তা করো, আর তুমি যাচ্ছো এজেন্সীর তরফে তাকে শেষ বিদায় জানাতে।

তুমি কী ভাবছো, হ্যামেল ওখানে থাকবে ?

শিওর, আমি বলছি না হ্যামেল ওখানে যাবে। যদি যায় তাহলে তাকে বলবে এবং একটা দিনও স্থির করবে।

বার্থা একটু থেমে আবার বলে, চেস্টা করে দেখ না ! এবং চেস্টা ছাড়া আর কী !

ভাবি, বার্থা মন্দ বলেনি। এটা টেলিফোন করার চেয়ে অনেক ভালো। আর টেলিফোনে সব কথা কী হয় !

তারপর বার্থাকে বলি, কোথায় অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া হবে তা আমি জানি না।

তুমি একজন ডিটেকটিভ। এটা তোমার পক্ষে খুঁজে বার করতে কতক্ষণ !

কেমী তার ডেস্কে বসে আছে। টেবিলের উপর চিঠির পাহাড়। আমায় দেখে একটু হাসলো। বললো, গত কাল দুপুরে সোলি হারচেনহিমার এসেছিল।

কি ব্যাপারে তা আমি জানি না। আমি চিককে দিয়েছিলাম। কিন্তু সে তোমাকেই চায়।

এটা সত্যি একটা সুখবর, আর সে আমাকে চাইবেই। কারণ আমি শিক্ষিত এবং সুপুরুষ। ঠিক আছে, আমি ওখানে যাবো। আর এ খবরটার জন্য তোমায় ধন্যবাদ।

সোলির সব কাজ প্রতি বছরই এজেন্সী পায় এবং এটাই এজেন্সীর সবচেয়ে সহজ কাজ। আমি বুঝতে পারি না, সোলি কেন এজেন্সীকে খবর দেয়। অবশ্য ওর অনেক টাকা আছে। ওখানে গিয়ে শুধু বসে থাকো এবং ভালো ভালো

খাবার ধ্বংস করো।

সোলি সর্বদা ভাবে, তাকে কেউ খুন করার মতলবে আছে। পুলিশের প্রধান টেকেল পর্যন্ত তাকে এ ব্যাপারে বুঝিয়ে উঠতে পারেনি। তবে সে তার শত্রুদেরও নাম বলেনি। এবং আপার্টমেন্টেতে কেউ তার ক্ষতি করবে না। তবুও দু' জন বডি গার্ড নিযুক্ত করেছে। গতবার এইরকম একজন গার্ড ছুটিতে যেতে এজেন্সীকে একজন উপযুক্ত লোক দিতে বলা হয়েছিল। তখন এজেন্সী আমায় এখানে পাঠিয়েছিল।

এ কাজটাও ছুটির সামিল: কাজটা কিছুই নয়। শুধু বাড়ির চারদিকে ঘুরে বেড়ানো। সন্ধ্যায় টি. ভি. দেখা আর দারুণ দারুণ খাবার খাওয়া, যা জার্ভিস পরিবেশন করে। তবে এ কাজটার একমাত্র অসুবিধে হলো, ঐ বুড়োটা মদ খাওয়া একেবারে পছন্দ করে না। তবুও এখানে মদ খেতে কোন অসুবিধে হয় না।

তারপর কেরী বলে, সোলি তার বাড়ি বদলেছে।

প্যারাডাইস ল্যারগোতে আছে এবং সেখানে গত তিন মাস হল গেছে। আর তুমি গিয়ে সেখানেই রিপোর্ট করবে।

ভাবি, সঙ্গে সঙ্গে একটা সুযোগ এসে গেল এবং এটা হ্যামেলের বাড়ির কাছেই। এবং হ্যামেলের সঙ্গে দেখা করতেও সুবিধে হবে।

ইতিমধ্যে আমি ফেনির কাছে ফোন করে জেনে নিয়েছি, পোল হাইবির শেষকৃত্য কোথায় হচ্ছে এবং সেটা হবে সকাল সাড়ে দশটার সময়। আর সোলির ওখানে যেতে হবে দুপুরে। সুতরাং হাতে কিছু সময় পাওয়া যাবে।

আমি কবরস্থানে গিয়ে হ্যামেলের দেখা পেলাম। ভাবি বার্থার কথাই ঠিক হলো। ওছাড়া, প্রায় তিনশোর মত লোক এখানে এসেছে।

আমি নিজেকে শোকাচ্ছন্ন করে রাখলাম, কিন্তু আমার দৃষ্টি হ্যামেলের দিকে।

হ্যামেল আর ন্যানসি দু'জনেই কালো পোশাক পরে এসেছে। এবং হ্যামেল বাঁ হাত দিয়ে বিপর্যস্ত ন্যানসিকে ধরে রয়েছে।

কিছুটা ভিড় পাতলা হয়ে যেতে আমি ন্যান্সির দিকে তাকাই। তাকে এখন ভূতের মত দেখাচ্ছে। চোখ মুখ ফ্যাকাশে। চোখ যেন ভেতরে ঢুকে গেছে এবং চোখের জলে তার মুখ বার বার ভেসে যাচ্ছে।

আমি ভাবি, এটা একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট করার মত সময় নয়। তারপর আমি যখন চলে আসছি তখন দেখি, ন্যান্সি কান্নায় ভেঙে পড়েছে। এবং হ্যামেল তাকে টেনে গাড়ির দিকে নিয়ে যাচ্ছে।

কিছু লোক চলা এবং গাড়ী যাবার শব্দ হচ্ছে। তারপর কে যেন আমার নাম ধরে ডেকে উঠলো, মিঃ বার্ট এন্ডারসন।

ঘুরে তাকাতে দেখি, সে আমার খুবই পরিচিত এবং সে হলো মেল পামার।

বড় দুঃখজনক ব্যাপার, পামার বলে। কিন্তু তার মুখটা দেখে মনে হলো সে এইমাত্র একটা একশো ডলারের বিল তুলে নিতে সক্ষম হয়েছে।

তারপর পামার আরো বলে, আমাদের সবারই বড় অল্প সময় বাঁচতে হয়। বড় বাজে।

আমি মাথা নাড়ি, হ্যাঁ।

—এটা মিঃ হ্যামেলের পক্ষেও একটা দুঃসংবাদ। তবে তিনি তাঁর বইটা শেষ করতে পেরেছেন। পামার হাসিতে গদ গদ। এরকম বই আর আগে লেখা হয়নি।

—ঠিক বলেছেন। তবে মিঃ হ্যামেল মিসেস্ হ্যামেলকে নিয়ে বড় চিন্তিত হয়ে পড়েছেন। মিসেস্ হ্যামেল বেশ ভেঙে পড়েছেন।

—হ্যাঁ, ঠিক বলেছেন, তারপর পামার বিদায় নেয়।

পামার চলে যেতে আমি আস্তে আস্তে ম্যাসারের দিকে এগিয়ে যাই। কিছুটা বিভ্রান্ত। ন্যান্সিই লুসিয়া এ কথাটা ঠিক, কিন্তু এখন তার দুঃখটা লোক দেখানো নয়। তবে এ ধরণের মেয়েদের দুঃখপ্রকাশ ঠিক ভাবে মেনে নেওয়া যায় না। কারণ সে একটা মেয়ে খুনে। আর তার ব্যাপারে পেনি হার্টবি আগ্রহ প্রকাশ করায় নিহত হয়েছে।

তারপর আমি ম্যাসারের কাছে এসে দেখি, ডিটেকটিভ টম লেপস্কি গাড়ীতে বসে রয়েছে। তার টুপিটা চোখের দিকে নেমে এসেছে। তার পাতলা ঠোঁটে জ্বলন্ত সিগারেট।

কোন বিপদ? আমি একটু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করি।

টম আমার কথা শুনে টুপিটা চোখের উপর থেকে সরিয়ে বলে, এখানে আসার পিছনে কী কারণ?

হাতে সময় ছিল, চলে এলাম, বলতে বলতে আমি গাড়িতে গিয়ে বসি। তাছাড়া, হার্টবি একজন আমাদের ক্লায়েন্ট। আর এজেন্সীর পক্ষ থেকে কর্নেল আমায় এখানে পাঠিয়েছে।

তারপর আমি গাড়ি স্টার্ট দিতে দিতে বলি, এবার আমার একটা কথার জবাব দেবে? তুমি এখানে কী করতে এসেছো?

গন্ধ পেয়ে এসেছি।

আমার মনে হয় না, ড্রাইভারটা মাতাল ছিল, আর বুঝতেই তো পারছো তোমার আমার ধান্দা এক।

হ্যাঁ, তা বলতে পারো।

তবে এখনো আমরা নিশ্চিত নয় যে, এটা একটা মার্ডার। আমরা একটা নতুন সাক্ষী পেয়েছি।

আর্নি থেসোর।

যেখানে মিসেস্ হাইবি দেখা করতে গেছিল ও সেখানেই থাকে। এটা অবশ্য রেকর্ডে নেই। তবে থেসোরকে চাপ দিয়ে যাবো যতক্ষণ পর্যন্ত আরো অনেক কিছু বার করতে না পারছি।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এটা কোন মাতালের কাজ নয়, টম কথাটা আবার বলে। থেসোর জানলা দিয়ে দেখেছে, গাড়িটা রাস্তার একপাশে দাঁড়িয়ে ছিল। তারপর পেনি হাইবি আসা মাত্র ঐ দাঁড়িয়ে থাকা গাড়িটা চলতে শুরু করে দেয় এবং এসে সোজা তাকে ধাক্কা মারে। আর ব্যাপারটা এত তাড়াতাড়ি ঘটে গেল যে পেনি হাইবি কিছু বুঝবার আগেই সব শেষ।

কে পেনি হাইবিকে এভাবে হত্যা করতে করতে পারে?

সেটাই তো এখন একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

থেসোরের, বিবরণের সঙ্গে অন্য দু'জন সাক্ষীর রিপোর্ট আদৌ মিলছে না। একেবারে আলাদা।

আচ্ছা, থেসোর গাড়ির নম্বরটা কী লক্ষ্য করেছে?

হ্যাঁ, আর গাড়ির বিবরণও দিয়েছে।

গাড়ির মালিক হ্যারি ডেলিস। কোর্টের একজন রিপোর্টার, আর তার গাড়িটা চুরি গেছিল ঘটনার দিন রাতে। গাড়িটার অবস্থা খুবই সঙ্গীন। আর একটা খবর হলো, সেই দুর্ঘটনার সময় গাড়ির ড্রাইভার কালো ছিল।

—কালো আদমী?

ভাবি, তাহলে কী ও জোন্স হতে পারে? আমি দারুণভাবে চিন্তা করতে থাকি। তারপর?

—আর কিছুই না। এই পর্যন্ত। কিন্তু আমরা অনুসন্ধান চালিয়ে যাচ্ছি। অথচ আমরা বুঝতে পারছি না, পেনি হাইবির মত একজন সুন্দরী মহিলাকে কেন এভাবে দুর্ঘটনার খপ্পরে পড়তে হলো।

আমি ঘামতে শুরু করে দিয়েছি এবং টমকে বলতে পারি কে একাজ করেছে। তবে এসব ব্যাপারে খবরাখবর দিতে গেলে আমি নিজেই বিপদে জড়িয়ে পড়বো।

তারপর আমি বলি, নিশ্চয়ই আটর্নি হাইবির কোন শত্রু ছিল?

—আমারাও প্রথমটা তাই ভেবেছিলাম, কিন্তু পরে দেখেছি, হাইবি একজন নির্দোষ মানুষ। তার কোন শত্রু থাকতেই পারে না। আমরা তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছি।

তারপর টম একটা সিগারেটে ধরিয়ে বলে, এ ব্যাপারে তুমি কী ভাবছো?

যাক্, সে কথা। ছুটি কেমন কাটালে ?

—দারুণ! আমার মেয়ে-বন্ধু বিনে পয়সায় একটা ইয়াট যোগাড় করেছিল। তাই তোফা মজা লুটেছি। এরপর ভাবি, বিনে পয়সায়? আজ আমি বলতে গেলে কপর্দক শূন্য।

আমার কথা শুনে টম মাথা নাড়িয়ে বলে, হ্যাঁ, তোমার মেয়ে বন্ধুটি সত্যিই দারুণ! ও হ্যাঁ, তোমার আর একটা কথা বলা হয়নি।

একটা কালো ছেলে ধাক্কা খেয়ে প্রাণ হারিয়েছে। সেটা তুমি শুনেছো ?

এবার আমি এমন একটা ভান করে বললাম, এসব আমি কিছুই জানি না। তা কোন্ কালো ছেলেটা বলত ?

—টমির ভাই জিম্বো। মনে পড়েছে তো? যে টমিকে পেটের সঙ্গে গুলি করে মেরেছে।

তাকে মাথায় আঘাত করে বন্দরে ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়েছে। কেউ তা দেখেনি। তারপর টম চিন্তিত মুখে আমার দিকে তাকিয়ে আরো বলে, বার্ট, এখানে কিছু একটা ঘটেছে। এর আগে কোল্ডওয়েল প্রোফারির ব্যাপারে খোঁজ পেয়েছে। তারপর তিন তিনটে খুন হলো। হয়তো আরো হবে। কিন্তু আমি একটা কথা ভেবে পাচ্ছি না, প্রোফারি ইতালিয় সন্ত্রাসবাদী হয়ে এখানে কেন মদোমাতাল পেটে, দুটো কালো ছেলে এবং পেনি হাইবিকে খুন করবে?

—সত্যি, এটা একটা সমস্যার কথা, বলে আমি ঘড়ির দিকে তাকাই। আমার এখন যেতে হবে, বুকতেই তো পারছো।

এ প্রশ্নের জবাব আমি নিজেই দিই, আবার সোলির চাকরিটা পেয়েছি, আর তোমায় কী পথে কোথাও নামিয়ে দেবো ?

না, সঙ্গে আমার গাড়ি আছে তারপর টম বলে, সেই বুড়োর চাকরিটা? ওখানে কিসের জন্য গার্ড চায় ?

—চেয়ে আমাদের জন্য ভালোই করে।

—আর শোন বার্ট, তুমি যদি এ ব্যাপারে কিছু জানতে পারো, তাহলে আমাদের জানিও। আমরা তোমার সাহায্য চাই। এ কথা বলে টম তার গাড়ির দিকে এগিয়ে যায়।

আমি রুমাল দিয়ে ঘামে ভরা মুখটা মুছি আর ভাবি, আমি যদি ওদের বলতাম, প্রোফারি কোথায় লুকিয়ে আছে তাহলে এই চারজন মারা যেত না। অথচ তা করার আমার কোন উপায় নেই। আমি ইতিমধ্যে পঞ্চাশ হাজার ডলার নিয়ে বসে আছি। উপরন্তু আরো এক মিলিয়ান ডলার পাবার আশায় রয়েছি।

তারপর আমি নিজেই নিজের মনে বলি, বার্ট, এখন তোমার এসব ভাববার সময় নয়। এক মিলিয়ান ডলার আদায় করার আগে অন্যদের ভাবনা তোমার

না ভাবলেও চলবে। আর তোমার সেই বুড়ো বাবা কী বলে গেছে—মুখ বন্ধ করে থাকা সব চেয়ে বুদ্ধিমানের কাজ। বোবার কোন শত্রু নেই।

আবার নিজেই বলি, একটু স্মার্ট হও বার্ট।

আমি এবারের ফুলের গন্ধ পিছনে ফেলে গাড়ি করে সামনের রাস্তা ধরে এগিয়ে চলি এবং একসময় প্যারাডাইস ল্যারগোতে এসে থামি।

মাইক ফ্লাগহার্টি গার্ড হাউস থেকে বেরিয়ে এসে আমায় সাদর আহ্বান জানিয়ে বলে, তুমি তাহলে গার্ডের চাকরিটা পেয়েছো? শুধু আমাকে বলা হয়েছে, পার্নেল এজেন্সী থেকে একজন গার্ড আসছে। ভাই, তুমি সত্যি একটা ভাল কাজ পেয়েছো।

—তা আমি জানি, আর ঐ বুড়োকে কোথায় পাবো?

হ্যামেলের বাড়ীর বিপরীত দিকে, আর মিসেস্ হ্যামেলের জন্য আমার দুঃখ হয়। সে তার প্রিয় বন্ধুকে মটর দুর্ঘটনায় হারিয়েছে। একটু আগে সে অন্তোষ্টিক্রিয়া থেকে ফিরেছে, তার অবস্থা শোচনীয়। ডাঃ হার্চকে ডাকা হয়েছে। সে মিনিট পাঁচেক আগে এসেছে। আমি লেডীকে পছন্দ করি। সত্যি, সে ভালো।

—হ্যাঁ, আমি মাথা নাড়ি এবং ভাবি, যদি ওকে ন্যান্সির প্রকৃত পরিচয় বলি, তাহলে ওর মনের মধ্যে কী প্রতিক্রিয়া হবে। তারপর বলি, মাইক, আমার এখন ভেতরে যাওয়া দরকার। আর দেরী করা উচিত নয়।

তারপর মাইক পুলটা তুলে দিলে আমি হ্যামেলের বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াই। এই বাড়ির ঠিক উল্টোদিকে একটা বড় দরজা, আমি সেই বাড়ির বেলটা বাজাই, তারপর দরজাটা খুলে যায়।

দরজা খুলে দাঁড়ালো কার্ল স্মিথ। ওর সঙ্গে আমি আগের বার কাজ করেছি। তারপর আমরা দু'জনে করমর্দন করি।

—বার্ট! তোমায় দেখে খুশী হলাম, কার্ল বলে, এবং আমি আশা করেছিলাম, এজেন্সী যেন তোমায় পাঠায়।

আমি কার্লের দিকে তাকাই। কার্লের লম্বা ধরণের চেহারা। রং উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ। অল্প বয়স।

—তা ঐ বুড়োটা কেমন আছে? আমি জিজ্ঞেস করি।

—আগের মতন। কোন ঘটনাই ঘটছে না। তা তুমি লাঞ্চ সেরে আসোনি তো?

—না।

—হ্যাঁ, সেই ভালো, আর দশ মিনিটের মধ্যেই এখানে লাঞ্চ শুরু হবে।

—জার্ভিস তোমার সঙ্গে আছে তো?

—হ্যাঁ, ও রাঁধেও আগের মত ভালো।

তারপর গাড়িটা একটা সেডের তলায় রেখে আমরা দু'জন একটা কটেজের দিকে এগিয়ে যেতে থাকি। এর পিছনে অন্দর মহল। ওটা একটা বিরাট বাড়ি। শুনেছি, ঐ বাড়িতে কম করে ষোলটা শোবার ঘর রয়েছে।

আমরা দু'জনে এখানে এক সঙ্গে কাজ করবো, বলে কার্ল কটেজটা দেখায়। এখানে কোন ঝামেলা নেই। স্রেফ বসে থাকো আর মজা করে খাও। ল্যারগোতো কাউকে বিনা অনুমতিতে ঢুকতে দেওয়া হয় না। ঐ বুড়োটা এটা বুঝতে পারছে না। বুঝলে আমাদের চাকরিটা থাকতো না।

তারপর কার্ল বলে, তোমার ডিউটি হলো আজ দুপুর থেকে মাঝ রাত পর্যন্ত, এরপর আমার। এইভাবে চলবে।

ঠিক আছে।

এরপর আমরা একটা কটেজে প্রবেশ করলাম। প্রথমে একটা বড় ঘর। উপর তলায় দুটো শোবার ঘর এবং বাথরুম। বসবার ঘরটা লাউঞ্জিং চেয়ার এবং টি. ভি. সেট দিয়ে সাজানো।

আমি এ সবের দিকে তাকিয়ে বলি, একটা জিনিস নেই।

কার্ল আমার কথাটা বুঝতে পেরে ডেস্কের কাছে গিয়ে এক বোতল স্কচ বার করে। তারপর কাপবোর্ডের কাছে গিয়ে একটা ছোট্ট রেফ্রিজারেটার দেখায়।

নিজেরাই নিজেদের দেখতে হবে, কার্ল বলে। একটু স্কচ চলবে নাকি?

আমি সায় জানিয়ে জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়াই এবং এখান থেকে আমার দৃষ্টি যায় বন্ধ দরজার দিকে। আমি হ্যামেলের বাড়ির উপরটা দেখতে পাচ্ছি। ঐ বাড়িতে ঢোকার মুখে একটা বড় গাছ আছে। তার অসংখ্য শাখা। ভাবি, ঐ গাছে চড়লে আমি হ্যামেলের বাড়ি এবং বাগান দুই দেখতে পাবো।

তারপর কার্লের দিকে ঘুরে তাকাতে সে আমার দিকে পানীয় এগিয়ে দিল। তাতে চুমুক দিয়ে ভাবি, কার্ডগুলো আমি ভালোই পেয়েছি বলতে হবে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

কার্লের লাঞ্চ খাবার পর সে চলে যায় এবং আমি সেই গাছটাই এসে বসি। এখান থেকে আমি বাড়ি এবং দরজা দেখতে পাচ্ছি। ফলে বেশ স্বচ্ছন্দ বোধ করছি।

এখন আমার চিন্তা হ্যামেলকে ঘিরে, আর আমি জানতে পেরেছি, সে তার নতুন বইটা শেষ করতে পেরেছে এবং তাতে সে কম করে এগারো মিলিয়ান ডলার পাবে। পাথার এসব কথা আমায় জানিয়েছে।

এখন যদি আমি হ্যামেলকে কামড় বসাই, তাহলে সে কখনো দারিদ্র্যের কথা তুলবে না। তবে ন্যান্সি মুষড়ে পড়েছে। এখন চাপ দেওয়া ঠিক প্রকৃত সময় নয়। অথচ মনের দিক দিয়ে ঠিক আবার সায় পাচ্ছি না। কারণ টাকার দারুণ দরকার।

আবার ভাবি, টাকার কথা বলে হ্যামেলকে চাপ দিলে দেবে, না আবার পুলিশ ডাকবে? এটা তো ব্ল্যাকমেল ছাড়া কিছুই নয়। ফলে একটা অস্থিরতা আমায় পেয়ে বসে।

দূর! এ সব কথা ছেড়ে দিয়ে আমি বার্থার কথা ভাবি এবং একটা সুখানুভূতি অনুভব করতে থাকি। তবে আমি তাকে বঞ্চিত করেছি। তাকে আমি এক মিলিয়ান ডলারের স্বপ্ন দেখিয়েছি। এবং যতক্ষণ না পর্যন্ত আমার স্বপ্ন বাস্তবে পরিণত হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত সে আমায় অব্যাহতি দেবে না।

আমি রঙীন ছবির মত এক মিলিয়ান ডলারের স্বপ্ন দেখতে থাকি, আর ভাবি, টাকাটা পেলে আমি কখনো কিপ্টের মত খরচ করবো না। তবে কিছু সঞ্চয় রাখবো আমার বৃদ্ধ বয়সের জন্য এবং ঐ আয়ে বাঁচবো।

কিন্তু তারপর ভাবি, ঐ পঞ্চাশ হাজার ডলার পেয়ে আমি কী করতে পেরেছি! ও তো বলতে গেলে এক ফুৎকারে চলে গেল। না, টাকা আমার কাছে থাকতে চায় না।

এ সব কথা ভাবতে ভাবতে বড় বোর ফিল করছি। তারপর গাছটা থেকে নেমে বাগানে হাঁটতে থাকি। ফুল, সুন্দর লন, কাটা গাছ ইত্যাদি চারদিকে ছড়ানো।

একটা চীনা মালী ওই বাগানটা দেখাশুনা করে। ওর লম্বা দাড়ি দেখে মনে হয় যেন, বেগোনিয়া ফুলের বিছানা। ও আমায় দেখে ওর দাঁড়িতে হাত

ঘোরাতে থাকে।

তারপর একটা বড় সুইমিং পুলের কাছে এসে দাঁড়াই। এটা যেন আমায় কাছে টানতে চাইছে। আর ভাবি, এটা কী কখনো ঐ বুড়োটা ব্যবহার করেছে? তাতে আমার মনে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। নামলে নিশ্চয়ই ভাববে, কাটা ঝোপঝাড়ের আড়াল থেকে কেউ বেরিয়ে এসে তাকে ডুবিয়ে মারবে।

এরপর আমি জার্ভিসকে দেখতে পাই। সে আমার দিকে এগিয়ে আসছে। ওকে দেখে মনে হয়, 'গণ উইথ দা উইণ্ড' বইয়ের পাতা থেকে উঠে এসেছে। ও সত্যি একজন সম্ভ্রান্ত নিগ্রো।

জার্ভিস লম্বা। পাতলা চেহারা, পরনে সাদা পোশাক। বড় বড় চোখ, সাদা জ্র যুগল।

জার্ভিস আমায় স্কারলেট ও-হারার মত একজন দারুণ লেখক মনে করে। তাছাড়া, আগের বার যখন নানারকম অপরাধমূলক কাহিনী বলেছি, তখন সে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকতো আর অবাক হয়ে শুনতো। তার মধ্যে অনেকটা বানানো গল্প ছিল। কিন্তু ওর চোখ মুখ দেখে মনে হতো, ও আমায় দারুণ সাহসী বলে ভাবতো। এবং এর মধ্যে মিথ্যের কোন স্থান ছিল না। তার বদলে সে আমায় দারুণ দারুণ খাবার খেতে দিত। আর মাঝে মাঝে তার মালিকের কাছ থেকে সিগার ঝেড়ে এনে আমায় দিত।

জার্ভিস আমায় দেখে হেসে বললো, মিঃ এণ্ডারসন, আপনাকে দেখে আমার দারুণ ভালো লাগছে। আমি আপনাকেই চেয়েছিলাম, কিন্তু কেরী বলছিল, আপনি ছুটি থেকে ফেরেননি। যাক, আপনি এসে ভালোই করেছেন! তা ছুটি ভালো কাটিয়েছেন তো?

—হ্যাঁ, তারপর কটেজের দিকে যেতে যেতে জার্ভিসকে ইয়াট এবং বার্থার কথা বললাম। আর বার্থার প্রসঙ্গে জানলাম, সে এখন সে এখন 'সি-ই এ' কাজ পেয়েছে।

—বলেন কী! জার্ভিস হাঁ। আর আমি যখন এসব গুল গাপ্পা মারি তখন বার্থার কথা টানি। আর তখন বার্থার ভূমিকাও যেন মাটা হারির মত হয়ে ওঠে।

তারপর কটেজের কাছে এসে দাঁড়াতে জার্ভিস আমার বর্তমান ক্রিয়া কলাপের উপর একের পর এক প্রশ্ন করে যেতে থাকে, তা সংক্ষেপে বলার পর জেমস হেডলী চেজের সম্প্রতি পড়া একটা থ্রিলারের গল্প বললাম, যাতে নিজেই যেন নায়কের ভূমিকা নিলাম।

এরপর এক ঘণ্টা পরে যখন শেষ করলাম তখন জার্ভিস অনিচ্ছা সত্ত্বেও যেতে যেতে বললো এখন আমায় স্যারকে চা দিতে হবে। তাছাড়া, ওয়াশিংটন শিম্বকে ডিনারে সাড়ে আটটার সময় খেতে বলেছি। আশা করি, তখন আপনি

আমাদের সঙ্গে থাকবেন।

—নিশ্চয়ই, আর ওয়াশিংটন স্মিথকে।

—মিঃ হ্যামেলের বাটলার। তখন তার ছুটি। সে খুব ভালো কথা বলতে পারেও বেশ। এবং আমি ডিনারের ব্যবস্থা কটেজেই করবো, যাতে আপনি ওখানে বসে সব লক্ষ্য রাখতে পারেন।

তারপর জার্ভিস চলে যেতে আমি সেই গেটের বড় গাছটার কাছে গিয়ে দাঁড়াই। এই গাছটা বাড়িটাকে আড়াল করে আছে। এবং আমি গাছে উঠে হ্যামেলের বাড়ির দিকে তাকাই। একটা মোটা ডালে হেলান দিয়ে বসে দেখতে পাই, হ্যামেলের বিশাল বাড়ি। একটা 'ফেরারী' এবং একটা 'ফোর্ড' স্টেশন ওয়াগান' দাঁড়িয়ে আছে।

এখানে সব চুপচাপ। প্রাণের কোন সাড়া নেই। এবং এখানে ঘণ্টা দুই কাটিয়েও কাউকে দেখতে পেলাম না। মনে হয়, যেন কেউ বাড়িতে থাকে না। একটা ভুতুড়ে বাড়ি।

সাতটার সময় জার্ভিস হ্যামেলের বাটলার স্মিথের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিয়ে বলে, মিঃ জবসন ছুটিতে যাওয়ায় মিঃ এণ্ডারসন এসেছেন।

আমি স্মিথের দিকে তাকাই। অল্প বয়স। নিগ্রো। পরনে সাদা পোশাক।

জার্ভিস মার্টিনি ঢালতে আমি বলি, মদের ব্যবস্থা হবে তা আমি ভাবিনি।

জার্ভিস হেসে বলে, একটা পুরনো কথা আছে, চোখ অনেক সময় সহ্য করতে না চাইলেও মন চায়।

আমি জার্ভিসের কথায় হেসে জানিয়ে স্মিথের দিকে তাকিয়ে বলি, আমি মিসেস্ হাইবির অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় গেছিলাম। দেখলাম, মিসেস্ হ্যামেল দারুণভাবে ভেঙে পড়েছেন। এখন তিনি কেমন আছেন?

—এখন ভালো।

—আর মিঃ হ্যামেল? তার সঙ্গে আগে একবার আমার দেখা হয়েছিল। তখন উনি বলেছিলেন, আমার কথা তাঁর বইতে লিখবেন।

স্মিথ একটু চিন্তিতভাবে বলে, আমি মিঃ হ্যামেলের ব্যাপারে বেশ চিন্তিত।

—কেন?

—দ্বিতীয় বিয়েটা তাঁর মোটেই সুখের হয়নি।

আমি এই বাড়িতে পনেরো বছর আছি। তিনি মিসেস গ্লোরিয়াকে বিয়ে করে দারুণ ভুল করেছেন। কোন মেয়ে ছেলে যে এমন হয় তা আমার জানা ছিল না। ঐ ডিভোর্সের পর মিঃ হ্যামেল ভেঙে পড়েন।

স্মিথ আবার বলে, তারপর ভেবেছিলাম, মিসেস্ ন্যান্সিকে বিয়ে করে

সুখী হবেন। কিন্তু হ্যামেল অসুখী হয়ে গেলেন। কেন বুঝতে পারছি না। মিসেস্ ন্যান্সি দারুণ ভালো মানুষ।

ও:কে আমি গ্লোরিয়ার কথা বলতে পারতাম। গ্লোরিয়া আমার কথা প্রসঙ্গে বলেছিল। হ্যামেল বই লেখে ভালোই, কিন্তু বিছানায় সে মোটেই ভালো নয়। মেয়েদের কামনা বাসনা মেটাতে সে পুরোমাত্রায় অক্ষম।

শুধু বলি, মিঃ হ্যামেল বই লিখে ভালো টাকাই রোজগার করেন। আর একজন মানুষ তো সব পায় না।

—হাঁ ঠিকই। কাল তিনি হলিউড যাচ্ছেন ছবির ব্যাপারে। এই ছবি তাকে অনেক টাকা দিচ্ছে। আর তিনি বেশ দয়ালু। প্রায়ই আমাকে এবং আমার স্ত্রীকে কিছু দেন।

—অন্যরা কেমন পায়?

—আমাদের তো আর কোন কর্মচারী নেই।

মিঃ হ্যামেল খুব সাধারণ ভাবে জীবন যাপন করেন। তিনি খুব কমই পার্টি দেন। লোক দিয়ে খাবার সব আনান। আর এখানে সত্যিই ভালো আছি এবং কোন ব্যাপারে আমাকে বা আমার স্ত্রীকে জবাব দিতে হয় না।

—মিসেস হ্যামেলও বোধহয় হলিউড যাচ্ছেন? গেলে তাঁর মনটা খানিকটা ভালো থাকবে।

—না, মিসেস্ হ্যামেল এখানেই থাকবেন, স্মিথ মাথা নাড়ে। আর মিঃ হ্যামেল ওখানে তিন চার দিনের জন্য যাচ্ছেন। এবং মিসেস্ হ্যামেল গেলে হয়তো সিনেমার লোকদের সঙ্গে ভালোভাবে মিশতে পারতেন না। ওরা অন্য ধরণের লোক।

জার্ভিসের এ সব ব্যাপারে আগ্রহ নেই। সে আমার দিকে তাকিয়ে বলে, মিঃ এন্ডারসন, যে দুটো কালো ছেলে নিহত হয়েছে, তাদের ব্যাপারে কিছু বলুন। আর আমার বদ্ধমূল ধারণা, ওসব সম্বন্ধে আপনি নতুন কিছু বলতে পারবেন।

—পুলিশ এ ব্যাপারে সঠিকভাবে কিছু বলতে পারছে না। আমি বলেই ভাবি। সত্যি, কথা যদি ওদের বলি তাহলে ওদের চোখগুলো হয়তো ঠিক বেরিয়ে আসবে। তবে তোমাদের আমি এজেন্সীর হয়ে শেষ যে রহস্যের সন্ধান করেছি তার লোমহর্ষক বিবরণ দিতে পারি। বলে আমরা একটা মিথ্যে কাহিনীর অবতারণা করলাম, যা শুনে জার্ভিস উঠতে চাইছিল না, আর স্মিথও বাড়ি না গেলে তার স্ত্রী ভাববে, এমন একটা মনোভাব প্রকাশ করে অনিচ্ছা সত্ত্বেও গেল।

ওদিকে জার্ভিস যাবার সময় বলে গেল, গৌথ গিয়ে বুড়ো জানিয়েছে কী না! তারপর ওরা চলে যেতে ভাবি, স্মিথের কাছ থেকে অনেক কিছু জানলাম।

তার কথায় নিশ্চিত হলাম, আর যে কথা গ্লোরিয়াও আমায় বলেছিল, হ্যামেল পুরুষত্বহীন। আর জানলাম, হ্যামেল তিন চার দিনের জন্য হলিউড যাচ্ছে এবং ন্যান্সি এখানেই থাকছে। আর হ্যামেল চলে গেলে আমি সময় পাচ্ছি। এবং এ সময় বার্থাকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারবো।

দুপুরটা বাজে কাটলো। আমি বিশ্রাম নিচ্ছি ; এখন চিন্তা আমার টাকার দিকে। এবং ভাবছি, এক মিলিয়ান ডলার আমি কি ভাবে পাচ্ছি।

ইতিমধ্যে কার্ল আমায় রিলিফ দিতে এলো। বললো, আমার মনে হয়, তুমি ব্যস্ত ছিলে ?

সত্যি, একটা ভালো ডিনার খেলাম ! আর ভাগ্য এমন একটা চাকরি পেয়েছিলাম বলে।

তারপর আমি শুতে যেতে টেলিফোনটা বেজে উঠলো। এরপর খানিকটা চিন্তা করে রিসিভারটা তুলে নিলাম, হ্যালো !

বার্ট ! বার্থার গলা যেন আমার কানে এসে হাতুড়ির মত ঘা মারলো।

হাই বেবী ! নিজেকে সংযত করে বলি।

খবর কী ?

কিসের ? যদি ও আমি বুঝতে পারছি, বার্থা কিসের ইঙ্গিত করছে।

তুমি তার সঙ্গে দেখা করেছো ?

এখানে নেই।

হলিউডে গেছে।

এত অধৈর্য হবার কিছু নেই। আমি বেশ শক্ত হাতেই ··· ! আর ফিরছে তিন চার দিনের মধ্যে।

—যাক্, যা ভালো হয় তাই করো। আর শোন, আমি আমার অ্যাপার্টমেন্ট এবং ফার্নিচার সব বেচে দিয়েছি, তাই বার্ট, ও ফিরে আসা মাত্রই কাসড় বসাও।

কে এসব নোংরা জায়গায় থাকতে চায় ! আরে যেখানে আমরা এক মিলিয়ান ডলারের মালিক হতে যাচ্ছি। আর একটা ভালো দাম পেলাম, তাই সব বেচে দিয়েছি।

—খুব ভালো করেছো। ঠিক আছে, তিন চার দিন যা হোক একটা করে ফেলবো।

—হ্যাঁ, তাই করো, বলে বার্থা রিসিভার নামিয়ে রাখে।

মাঝ রাতের কিছু আগে প্যারাডাইস ল্যাগোতে পৌঁছে আমি রাতের ডিউটি শুরু করবো। আমি হাঁটতে হাঁটতে মাইককে হ্যামেলের খবর জিজ্ঞেস

করি। মিসেস্ হ্যামেল কেমন আছে। বলে ওর দিকে একটা সিগারেট এগিয়ে দিই।

—ডাক্তারকে আজো ডাকা হয়েছিল, আর মিঃ হ্যামেল সিনেমার ব্যাপারে আজ হলিউড চলে গেছেন।

এটাই আমি জানতে চাইছিলাম, হ্যামেল হলিউড গেছে কি না। এরপর কার্ল আমায় রিলিফ দিতে এলো। আর দেখি, আমার জন্য একগাদা স্যাণ্ডউইচ রেখে গেছে।

ড্রয়ারে এক বোতল স্কচ রয়েছে, কার্ল বলে। ওটার সাহায্য নিও।

তারপর কার্ল চলে যেতে আমি কিছু স্যাণ্ডউইচ এবং কয়েক পেগ স্কচ খেয়ে হাঁটতে হাঁটতে বড় গাছটার কাছে এসে দাঁড়াই এবং উঠে পড়ি। এরপর ঘন্টা খানেক অন্ধকারে হ্যামেলের ডুবে থাকা বাড়িটা দেখে বিছানায় এসে গা ছেড়ে দিই।

এরপর পাঁচটার সময় বিছানা ছেড়ে উঠে দাড়ি কামিয়ে, চান করে বাগানে এসে ঘুরতে থাকি, যাতে নিজেকে দারুণ প্রহরী হিসেবে প্রতিপন্ন করতে পারি। তারপর আটটার সময় জার্ভিস একরাশ খাবার নিয়ে এলো—কফি, মাংসের চপ, ওমলেট ইত্যাদি।

যখন আমি খেতে শুরু করেছি তখন জার্ভিস বললো, কাল দুপুরে আবার মিসেস্কে লাঞ্চ-এ বলেছি।

তার পরের দিন দুপুরে কার্ল আমায় রিলিফ দিতে এলো। এরপর আমি সাঁতার কেটে অ্যাপার্টমেন্টে গিয়ে ছ'টা পর্যন্ত ঘুমোলাম। ঘুম থেকে উঠে বার্থাকে ছাড়াই একটা বারে গিয়ে খাবার এবং কিছু পানীয় নিলাম। আর যখন গাড়িতে স্টার্ট দিতে যাবো তখন গ্লোরিয়া কোর্টকে আমার দিকে আসতে দেখলাম।

—আরে! তুমি যে বসন্তের ফুল হয়ে উঠেছো, গ্লোরিয়া আমার দিকে একটু ঝুঁকে বলে। আর সে কিণ্ডারগার্টেনের মত পোশাক পরে নিজেকে খুব আকর্ষণীয় করে তুলেছে।

—সবে খেতে যাচ্ছিলাম। তা তোমার বন্ধুর কী কোন পরিবর্তন ঘটেছে? আর একা একা খেতে একবারে ভালো লাগে না।

আমার কথার জবাব না দিয়ে গ্লোরিয়া গাড়ির দরজা খুলে ভেতরে প্রবেশ করে বলে, কোথায় নিয়ে যাবে বলতো?

—তুমি কী সি-ফুড পছন্দ করো?

—আমি মাংস পছন্দ করি। কাছেই একটা রেস্টুরেন্ট আছে। বিফ পাওয়া যাবে। জানো তো?

ভাবি, ঠিক বার্থার মত কথা বলে, আর ঐ রেস্তোরাঁর খাবারের দাম দিতে

প্যারে শুধু জেলের দেশের দেখয়া।

তাই বলি, ওর চেয়ে সস্তা একটা জায়গা চিনি সেখানে চলো।

আমার কথা শুনে গ্লোরিয়া হাসে, তাই চলো। বলে আমার হাঁটুর উপর হাত রাখে। আর তোমার গাড়িটা কিন্তু চমৎকার।

আমি গ্লোরিয়ার হাতটা আস্তে সরিয়ে দিয়ে বলি, বেবী, এখন নয় পরে।

আমি গাড়ি চালিয়ে সেই রেস্তোরাঁয় এলাম। এটা প্যারাডাইস অ্যাভেনিউ থেকে অনেকটা দূরে। রেস্তোরাঁর ভেতরে প্রবেশ করে দেখি, বাঁশীর বাজনা চলেছে আর ওয়েটার যেন বুল ফাইটারের ড্রেস পরেছে।

তারপর আমরা এক জায়গায় বসে পড়লাম এবং যখন খাবারের অর্ডার দিয়ে গ্লোরিয়ার দিকে তাকালাম তখন সে দারুণ মন নিয়ে বললো, এতদিন কোথায় ছিল? অ্যালামেডা বারের পর আর তোমায় দেখিনি।

এখানে আছি। তা তুমি ওখানে কী করো? বার দেখাশুনা কর নাকি?

শুধু শনিবার। আর তুমি?

মাঝে মাঝে হরিণ ধরতে চেষ্টা করি, ধরিও। আবার হারিয়ে যায়। তা ডিয়াজের খবর কী?

হাঁ, তোমার নাম যেন কী?

বার্ট এন্ডারসন।

ডিয়াজ থেকে দূরে থাকো।

একথা আমি আগেও শুনেছি।

তারপর টুকরো টুকরো মাংসের খাবার এলো এবং আমরা খেতে শুরু করেছি। আমি এক সময় বলি, যদি সে খারাপ হয় তাহলে তোমার মত সুন্দরী মেয়ে তার খপ্পরে পড়লো কী করে।

—কে বললো আমি ভালো! গ্লোরিয়ার মুখ দিয়ে একটা চাপা নিশ্বাস বেরিয়ে আসে। আর তুমি ঠিকই বলেছো। আমার সঙ্গে যখনই কোন লোকের দেখা হয় সবাই ঠিক তোমার মতন একই কথা বলে। আমি এর উত্তর খুঁজে পাই না। আসলে আমি ডিয়াজের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছি, যেমন পড়েছিলাম হ্যাঙ্কের সঙ্গে। তোমাকে যদি বলতে হয় আমি কত জনের সঙ্গে উপভোগ করেছি তাহলে এ রাত ফুরিয়ে যাবে।

এখন থাক্। মাংসটা কেমন লাগছে?

ভালো, গ্লোরিয়া আবার খেতে শুরু করে।

গ্লোরিয়া খেয়ে চললো। এরপর একরাশ কলা খেলো। আর আমি শুধু কফিতে চুমুক দিই। আর যখন খাওয়ার কিছু থাকলো না তখন ও চেয়ারে গা ছেড়ে দেয়।

এবার যাওয়া যাক, গ্লোরিয়া বলে। তোমাকে আমি একটা কাজের সন্ধান দেবো। তা তোমার ডায়রিতে লিখে রাখতে হবে।

ডায়েরি আমি রাখি না, বলে আমি রেস্তোরাঁর বিল মিটিয়ে দিলাম।

রাখা উচিত, বলে গ্লোরিয়া আমার হাত ধরে রেস্তোরাঁর বাইরে আসতে থাকে।

টেলিফোনের আওয়াজ আমার ঘুম থেকে তুলে দিল। আমি ঘড়ির দিকে তাকাই। সময় এখন সকাল দশটা পাঁচ।

আমার গত রাতের কথা মনে পড়ে যায়। আমি গ্লোরিয়ার দিকে তাকাই। আধ শোওয়া অবস্থায় আমার পাশে বসে আছে। তবে নগ্ন দেহ।

গ্লোরিয়া আমার চোখে চোখ ভাসিয়ে বলে সবে দশটা।

আমার বার্থার কথা মনে পড়ে। ওই আমার প্রথম ওঠার আর আমি বুঁকি নিয়ে প্রথম গ্লোরিয়াকে আমার অ্যাপার্টমেন্টে নিয়ে এসেছি। ভাবি, এনে ঠকিনি। ওর উষ্ণ সান্নিধ্য আমার মদ না খাইয়ে ও যেন মাতাল করে দিয়েছে।

আমি এর আগে অনেককে নিয়ে বিছানায় শুয়েছি, কিন্তু গ্লোরিয়া তার ব্যতিক্রম। ওর তুলনা ও নিজেই বিছানায় ওর জুড়ি মেলা ভার।

তারপর এক সময় টেলিফোনের রিং থেমে যেতে গ্লোরিয়া বলে, আশা করি রাতটা ভালোই লেগেছে।

এখন কফি পেলে আরো ভালো লাগবে।

আমারও দরকার। বলে গ্লোরিয়া উলঙ্গ অবস্থায় কিচেনের দিকে চলে যায় এবং ওর নিতম্ব আন্দোলনের প্রশংসা না করে পারি না।

একটু পরে গ্লোরিয়া কড়া কফি নিয়ে ফিরলো এবং আমরা দু'জনে খেতে থাকি। তারপর আর এক কাপ। এবার তাতে ব্রান্ডি মেশাই। তাতে যেন আরো মাথা খুলে যায়।

আমি গ্লোরিয়ার দিকে তাকাই। সে আমার কাছে স্থির হয়ে বসে আছে। ভাবি, ওকে আমার কাজে লাগাতে হবে। এ মুহূর্তে ওর কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করতে চেষ্টা করবো।

কাজে নেমে পড়ি। বাঁ হাত দিয়ে গ্লোরিয়াকে কাছে টেনে আদর করতে করতে বলি। আমায় ডিরাজ সম্বন্ধে কিছু বলো, আর তুমি কেনই বা ডিরাজ সম্বন্ধে আগ্রহ হারিয়েছো।

যে সব জিনিস অ্যালাঝোড়া-রাতে চলে তা আমার আদৌ পছন্দ নয়।

ডিরাজ খাঁচায় বন্দী সাপের চেয়েও সাংঘাতিক। ও আমায় ভয় দেখাচ্ছে।

যে এ সম্বন্ধে বলছে বা আগ্রহ প্রকাশ করছে, তাকে চিরতরের জন্য এ দুনিয়া থেকে সরে যেতে হচ্ছে।

যেমন পেটে ?

আর ঐ দুটো কালো ছেলেও। আমি এসব বলতে চাই না। কিন্তু ডিয়াজ যেভাবে চলেছে, সেটা মোটেই ভাল নয়।

সে যাই বলো ! কাজ হাসিল করার জন্য আমি গ্লোরিয়াকে সমর্থন করি। ওখানে আরো কিছু হচ্ছে, তাই না ?

ডিয়াজ ওদের লোকদের লুকিয়ে রেখেছে।

উপরের তলায়।

কে কে তোমার কি জানা আছে ?

—আমি চিনি না এবং তাদের আমি চিনতেও চাই না ! গ্লোরিয়া কফিতে চুমুক দেয়। বার্ট, আমি এখান থেকে চলে যেতে চাই। যাবার সময় হয়েছে। আমি ফিস্কো চলে যাবো। সেখানে একজন আমায় যেতে বলেছে। তবে বলেছে যেন একবার খালি হাতে তার কাছে না যাই।

বার্ট, তুমি আমায় দশ হাজার ডলার দিতে পারো ?

দশ হাজার ? অসম্ভব।

অসম্ভব। কেন ?

আমার কাছে মাত্র দু'হাজার ডলার রয়েছে।

মিথ্যে কথা বলো না ! গ্লোরিয়া চোখ মুখ সহসা কঠিন হয়ে ওঠে।

তুমি কিসে জানলে যে আমি মিথ্যে কথা বলছি।

আমি জানি, ডিয়াজ তোমার মুখ বন্ধ করার জন্য তোমায় পঞ্চাশ হাজার ডলার দিয়েছি। তা আমি দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে শুনেছি। আজ তার থেকে মাত্র দশ হাজার চাইছি।

হঠাৎ আমার খেয়াল হলো, আমার পরণে কিছুই নেই এবং গত রাতের মিষ্টি ছোঁয়ায় বেশ মিলিয়ে গেছে। তারপর আমি বিছানা ছেড়ে বাথরুমে গেলাম। দাড়ি কামালাম। চান করলাম। অনেক সময় নিচ্ছি। ভাবি, গ্লোরিয়ার মত মেয়ে যখন এভাবে তাকিয়ে কঠোর ভাবে কথা বলে তখন তাদের ব্যাপারে বেশ ভালো করে চিন্তা করতে হয়।

তারপর আমি যখন শোবার ঘরে ফিরে এলাম তখন গ্লোরিয়া পোশাক পরে নিয়েছে। ও এখন জানলার কাছে দাঁড়িয়ে। হাতে জলন্ত সিগারেট। সিগারেটের ধোঁয়া ওর কোঁকড়ানো চুলের পাশ থেকে উপরে উঠে আসছে।

এরপর জামাকাপড় পরে পুলিশ স্পেশ্যাল রিভলবারটা আনতে গেলাম। রিভলবারটা পেরেক আটকানো থাকে। কিন্তু সেটা নেই।

বার্ট তোমার একে অন্যেদের চেয়ে আলাদাভাবে দেখা উচিত, আমি আবার মনে মনে বলে উঠি।

বার্ট ! আমার দিকে তাকাও, গ্লোরিয়া কর্কশ কণ্ঠে বলে, কিন্তু তার

চোখ দুটো বরফের মত ঠাণ্ডা।

তুমি আমাকে গুলি চালাতে পারো না, তাই না?

তুমি আমায় না দিলেই গুলি চালাতে আমি বাধ্য হবো, আর গ্লোরিয়া কথাটা এমনভাবে বললো যেন ও এখনই গুলি চালিয়ে বসতে পারে।

আমি আর কোন জবাব না দিয়ে কিছুটা সাবধানতা অবলম্বন করে খাটে এসে বসি।

তুমি ডিয়াজের কাছে চাপ দিয়ে পঞ্চাশ হাজার ডলার বাগিয়েছ। আর আমি তার থেকে মাত্র দশ হাজার চাইছি।

আমার মুখ দিয়ে একটা দীর্ঘ নিশ্বাস বেরিয়ে আসে, বেবী, আমি তোমায় দিতাম, যদি না খরচ করে বসতাম।

আমাকে বুদ্ধু বানাবার আদৌ চেষ্টা করবে না। কেউ কখনো পাঁচ সপ্তাহে এত টাকা খরচ করতে পারে?

তোমার কথাই ঠিক। কেউ পারে না একমাত্র আমি ছাড়া। টাকা খরচ করার জন্য আমি সুন্দর পুতুলদের বেছে নিই। আর তুমিই বলো, আমি কালো হয়ে আসিনি? নিশ্চয়ই কয়লা খনিতে কাজ করিনি?

আমি এখান থেকে চলে যাবার জন্য কিছু টাকা চাই, গ্লোরিয়ার সেই একই কথা। তবে এখন রিভলবারটা নামিয়ে রাখে। আর তুমি কখনো এতগুলো টাকা খরচ করতে পারো না। ওর মুখে একটা সন্দেহের ছায়া।

গ্লোরিয়ার মুখের ভাব দেখে আমি স্বস্তি বোধ করি। ভাবি, আমি হয়তো বিপদমুক্ত। তারপর বলি, তুমি যদি আমার কথা বিশ্বাস না করো তাহলে তোমায় আমি ব্যাঙ্কে নিয়ে যেতে পারি।

চুপ করো। বলে গ্লোরিয়া গর্জে ওঠে রিভলবারটা খাটের উপর ছুঁড়ে ফেলে পিছন ফিরে তাকায়।

গ্লোরিয়া রিভলবারটা ফেলে দিতে আমি সঙ্গে সঙ্গে সেটা কুড়িয়ে নিয়ে পকেটে রাখি এবং স্বস্তির নিশ্বাস ফেলি।

গ্লোরিয়া সহসা আমার দিকে ঘুরে তাকিয়ে বলে, আমি এখন কী করবো? কিছু টাকা না পেলে সে আমায় কিছুতেই পার্টনারশিপে নেবে না। বার্ট,

তুমি আমায় কিছু টাকার ব্যবস্থা করে দাও। শেষের দিকে গ্লোরিয়া অনেক নরম হয়ে আসে।

দেখি, তোমার জন্য কী করতে পারি! আমি ভেবে বলি। তুমি তো ডিয়াজের কাছ থেকে তোয়াজ করে কিছু বার করতে পারো।

গ্লোরিয়া খাটে বসে বললো, ডিয়াজ আমায় টাকা দিতে যাবে কেন?

কারণ আমি একটা বিষধর পোকার ঢাকনা খুলেছি, যাতে সে টাকা দিতে বাধ্য। অন্তত আমার মুখ বন্ধ করার জন্য।

যেটা তুমি জানো এবং ডিয়াজ যাদের লুকিয়ে রেখেছে।

মানে তুমি সেই লোকটা আর একটা মেয়ের কথা বলছো?

তুমি কোন মেয়েটার কথা বলছো?

ঐ লোকটার সঙ্গে একটা মেয়ে আছে।

তুমি ঠিক দেখেছো?

তোমার ভুলও তো হতে পারে।

না। কারণ আমি ওদের কথা বলতেও শুনেছি।

সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে পড়ে যায়, পাইরেটস দ্বীপের ঐ বাড়িতে দুটো বিছানার কথা। এবং একটা টেবিলে মেয়েদের ব্যবহারের কিছু জিনিস-পত্রও দেখছি। তাতে আমি ভেবেছিলাম, ওগুলো হয়তো ন্যান্সি ব্যবহার করে, যখন প্রোফারির সঙ্গে দেখা করতে যায়।

তুমি নিশ্চিত যে, ওখানে একটা মেয়ে আছে? আমি বলি।

হ্যাঁ, তারপরই গ্লোরিয়া আমায় প্রশ্ন করে। আর এর মধ্যে গোলমালের কী আছে বলো?

যাক্ ওকথা, আমি চেপে যাই। তোমার তো মেক্সিকোতে যাবার জন্য দশ হাজার ডলার চাই, তাই না?

তুমি কী বলো? গ্লোরিয়া ঝংকার দিয়ে উঠে মেঝেতে পা ঘষতে থাকে। সে কথা তোমায় আমি আগে বলিনি?

বেবী, ঐ টাকাটা তুমি উপার্জন করতে পারো।

কী ভাবে?

আমি জানতে চাই, প্যালোমেডা বারে কী হয়ে চলেছে এবং ঐ লোকটা আর মেয়েটার ব্যাপারে খবরা-খবর চাই, যাদের ডিয়াজ লুকিয়ে রেখেছে, আশা করি তুমি এ ব্যাপারে আমায় সব জানাবে।

তুমি কী ভাবো আমি মাতাল? গ্লোরিয়ার গলা চিড় খেয়ে যায়।

এতে মাতালের কী আছে?

আছে বই কী! গ্লোরিয়ার এখনো যথেষ্ট উত্তাপ।

তুমি কী চাও, আমি পেটে আর ঐ কালো দুটো ছেলের মত খুন হয়ে যাই! এসব আমার দ্বারা হবে না।

হবে বই কী! আমি শান্ত গলায় বলি। তোমায় এখন কিছুই করতে হবে না।

তবু তো সামান্য কিছু করতে হবে, আর সেটাই···।

আরে আমার কথা শোন না! আমি গ্লোরিয়াকে বোঝাতে চেষ্টা করি।

বলো শুনি, গ্লোরিয়ার মুখ দিয়ে একটা চাপা হতাশার নিশ্বাস বেরিয়ে

আসে তা আমার নজর এড়ায় না।

তোমায় আমি একটা টেপ রেকর্ডার দেবো। তা নিয়ে তুমি ওদের কথা তুলে আনবে, এবং আজ থেকে এক সপ্তাহ পরে আমি তোমায় দশ হাজার ডলার দেবো। বলো, বুদ্ধিটা কেমন ?

কথা বলেই আমি ভেবে রেখেছি, গ্লোরিয়া আমায় টাকার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করবে টাকাটা কোত্থেকে পাবে। আমি ভাবি, হ্যামেলের কাছ থেকে এক মিলিয়ান পেলে তা গ্লোরিয়াকে দশ হাজার দেওয়া কিছুই নয়। আর যদি টেপের মাধ্যমে জানতে পারি, ভিয়াজ পেটে, টম এবং জিপ্পোকে খুন করেছে, তাহলে ওকে আমি ছেড়ে কথা বলবো না।

দশ হাজার ডলার দেবে ? গ্লোরিয়া আমার দিকে তাকিয়ে বলে মিথ্যে কথা বলছো।

একটু আগে তুমিই তো বলেছো, মাত্র দু'হাজার ডলার পড়ে রয়েছে আর সেই মানুষ কী না এক সপ্তাহের মধ্যে ..।

আমার ধারণাই ঠিক হলো। আমি গ্লোরিয়ার দিকে হেসে বলি, এখন আমার কাছে টাকা নেই ঠিকই, কিন্তু এক সপ্তাহের মধ্যে এসে যাবে ?

—এসে যাবে ? গ্লোরিয়া আমার শেষের কথাটা পুনরাবৃত্তি করে দাঁত কড়মড় করে বলে আকাশ থেকে আনবে নাকি ?

—বললাম তো পেয়ে যাবে।

ভিয়াজের কাছ থেকে পঞ্চাশ হাজার পেয়ে তা থেকে পাঁচ হাজার ডলার দিয়ে আমার এক বন্ধুর কাছ থেকে শেয়ার কিনেছি, আমি মিথ্যের আশ্রয় নিই। আমি কুড়ি হাজার ডলার পাবো। এতে আমার পাঁচ হাজার খরচ হয়েছে। আর তোমায় দশ দিলেও আমার পাঁচ থাকবে।

—আমি কী করে বুঝবো যে, টাকাটা তুমি আমায় দেবে। গ্লোরিয়ার জেরার শেষ নেই। আসলে সে নিশ্চিন্ত হয়ে নিতে চায়। এক সময় সে প্রচুর পেয়েছে। বিলাস বৈভবের মাঝে দিন কাটিয়েছে। এখন সে স্পষ্ট বুঝতে পারছে, ওর পায়ের তলার মাটি আলগা হয়ে গেছে। তাই ডুবে যাবার আগে একবার শেষবারের মত বাঁচবার চেষ্টা করছে।

—আমি বাবার নামে দিব্যি করে বলছি।

—আমি কী করে জানবো যে, তোমার বাবা মারা গেছে ?

ভগবানের কাছে জিজ্ঞেস করলেই জানতে পারবে !

—ঠিক আছে, তুমি যদি টাকাটা না দাও, তাহলে তোমার সংসারের সোনা-দানা থেকে টাকা দিতে তুমি বাধ্য থাকবে।

স্মিথ আমার আর জার্ভিসের সঙ্গে লাঞ্চ সারতে এলো। সে বললো, মিঃ

হ্যামেল তাকে ফোন করেছেন, তিনি আজ সন্ধ্যে নাগাদ ফিরছেন।

কেন?

পরিচালক হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ায় এক সপ্তাহের জন্য মিটিং পিছিয়ে গেছে।

ও। তা মিসেস্ হ্যামেল কেমন আছেন?

তিনি এখন ভালোই আছেন, স্মিথ মুরগীর ঠ্যাং প্লেট থেকে তুলে নিতে নিতে বলে। আর মিঃ হ্যামেল চলে যাবার পরই তিনি বাড়ি থেকে বেরিয়ে যান। এর মধ্যে তিনি একদিন ইয়াটে করেও ঘুরে এসেছেন। সূর্য আর সমুদ্র তাকে দ্রুত সারিয়ে তুলবে।

আমরা যখন খাচ্ছিলাম তখন হঠাৎ একটা গাড়ির শব্দ হতে স্মিথ বললো, মিসেস্ হ্যামেল ফিরলেন! তাঁর গাড়ির আওয়াজ আমার কাছে খুবই পরিচিত। আমি এখন যাই।

স্মিথ, মিসেস্ হ্যামেলের হয়তো লাঞ্চের সময় তোমার প্রয়োজন হবে, জার্ভিস বলে। কিন্তু স্পেশ্যাল সালাডটা একটু খেয়ে যাও।

ঠিক বলেছো, স্মিথ আবার চেয়ারে বসে। আমার খবর মিসেস্ হ্যামেল আজ এখানে লাঞ্চ সারবেন।

তারপর লাঞ্চ শেষ করে আমি গেটের কাছের সেই বিরাট গাছটায় গিয়ে চড়ি। দেখতে পাই, বাড়িটার সামনে 'ফেরারীটা' দাঁড়িয়ে আছে। সদর দরজাটা খোলা আমি অপেক্ষা করতে থাকি।

এর পাঁচ মিনিট পরে ন্যান্সি বেরিয়ে এলো। পরণে গাঢ় নীল রঙের হাইনেক সোয়েটার, চুলে লাল ফিতে বাঁধা। চোখ কালো সান গ্লাসে ঢাকা।

ন্যান্সি দরজার, দিকে এগিয়ে যেতে দরজাটা আবার আপনা আপনি খুলে যায়। তারপর সে গাড়ি করে বেরিয়ে পড়ে।

আমি গাছ থেকে নেমে কটেজে এসে দেখি, স্মিথ এখনো যায়নি। আমায় দেখে বললো, বোধহয় মিসেস্ হ্যামেল কিছু নিতে ভুলে গেছিলেন।

হ্যাঁ, মেয়েরা এ রকম ভোলে বই কী! বলেই ভাবি, হ্যামেল সাতটার সময় ফিরবে। তখন ন্যান্সিকে হয়তো দেখা যাবে।

তারপর জার্ভিসের অনুরোধে আরো কিছু খেতে হলো। এরপর স্মিথ তিনটে নাগাদ চলে গেলে আমি কিছুটা বিশ্রাম নিলাম।

এখন সাতটা বাজে। জার্ভিস ডিনারের তদারকে ব্যস্ত। আমি ইতিমধ্যে আবার সেই গাছটায় উঠেছি। কিন্তু 'ফেরারী'? কিছুক্ষণ ধৈর্য্য ধরে অপেক্ষা করার পর একটা ট্যাক্সি আসতে দেখলাম।

হ্যামেল ট্যাক্সি থেকে গাড়ির ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে পকেট থেকে একটা চাবি

ধার করে দরজা খোলে এবং ভেতরে প্রবেশ করে। কিন্তু দরজা খোলাই রইলো।

আমি বাড়ির দিকে তাকাই। হ্যামেল হয়তো অবাক হবে এই ভেবে যে ন্যান্সি তাকে অভ্যর্থনা করতে এলো না। আর ভাবি, ন্যান্সি গেছেই বা কোথায়? সে বাড়িতে নেই প্রায় দু'ঘণ্টার উপর।

তারপর আমি কটেজে ফিরে আসতে জার্ভিস বললো, আমি আপনাকে ডাকতে যাচ্ছিলাম এবং আশা করি, এখানকার খাবার আপনার ভালো লাগছে।

নিশ্চয়ই, আর খেতে খেতে ভাবি। এইভাবে খেয়ে দেয়ে যদি বাকী জীবনটা কাটাতে পারতাম তাহলে বেশ হতো। তারপর খাওয়া দাওয়ার পাট চুকতে আমি জার্ভিসকে একটা উত্তেজনাপূর্ণ গল্প বললাম।

এখন ন'টা বাজে। নেপোলিয়ান ব্রান্ডির সঙ্গে কফি মিশিয়ে নিয়ে একটু একটু করে পান করছি। আর ঠিক তখনই একটা ঘটনা ঘটলো। তার জন্য একবারে প্রস্তুত ছিলাম না, ফলে হকচকিয়ে গেলাম। একটা গুলির শব্দের আওয়াজ চারদিকে ছড়িয়ে পড়লো।

সঙ্গে সঙ্গে আমি কফির কাপ রেখে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ালাম। শব্দটা রাস্তার দিক থেকে এসেছে। আমি সেদিকে এগিয়ে যাই।

তাড়াতাড়ি গেটের কাছে এসে দাঁড়াই, আর আমি নিশ্চিত যে, গুলির আওয়াজ হ্যামেলের বাড়ি থেকে এসেছে। এরপর রাস্তাটা পার হয়ে হ্যামেলের বাড়ির দরজাটা খুলি। বাড়ির দিকে যেতে থাকি।

আমি দরজার কাছে পৌঁছতে স্মিথকে দেখতে পেলাম। সে কাঁপছে। তার মুখের রং সীসার মতন।

—মিঃ এন্ডারসন!

—একটু সহজ হও স্মিথ, আমি স্মিথকে ধরি।

—মিঃ হ্যামেল···স্টাডি রুমে...··· ।

স্মিথকে একটা চেয়ারে বসিয়ে আমি লরির দিকে এগিয়ে যাই। সেখানে আমি একটা নিগ্রো ছেলেকে বসে থাকতে দেখলাম। তার মুখটা অ্যাপ্রন দিয়ে ঢাকা। সে মুখ দিয়ে একটা চাপা গোঙানির শব্দ করছে।

তারপর আমি হ্যামেলের স্টাডি রুমের দিকে এগিয়ে যাই। স্টাডি রুমের দরজা খোলা। এখান থেকে গুলির ধোঁয়ার গন্ধ ভেসে আছে।

আমি বড় ঘরটার কাছে এসে দাঁড়াই। সেদিন আমি আর হ্যামেল এখানে বসে কত কথা বলেছি।

হ্যামেল আমার দিকে যেন তাকিয়ে বসে আছে। তার মাথা ডেস্কে সামান্য ঝুঁকে পড়েছে। তার চোখ আধ বোজা। রক্ত তার ডান দিকের মুখ থেকে বেরিয়ে আসছে।

আমি অনেকক্ষণ ধরে হ্যামেলের দিকে তাকিয়ে রইলাম এবং বুঝতে পারলাম, কিন্তু সেই আর এক মিলিয়ন ডলারের মালিক হতে পারলাম না। বার্থার কথা মনে পড়ে।

তারপর মাথা থেকে এ চিন্তা নামিয়ে ঘরের চারদিকে তাকাতে থাকি। সামনে একটা ডেস্ক। তার সামনে একটা চেয়ার। চেয়ারের উপর ৬'৩৫ ব্যারেটা পিস্তল।

আমি পিস্তলটার দিকে তাকাই, কিন্তু ধরি না।

ঘরে এয়ারকণ্ডিসন চলছে। জানলা বন্ধ। তারপর আমার চোখ গিয়ে পড়ে ডেস্কের দিকে। সেখানে একটা আই বি এম টাইপরাইটার। তার উপর একটা কাগজ চাপানো রয়েছে।

আমি ঝুঁকে পড়ে কাগজটা পড়তে থাকি। তাতে লেখা রয়েছে—

আমি স্ত্রীলোকের প্রয়োজনে আসি না। আমি
দু'জন স্ত্রীলোকের জীবন নষ্ট করেছি।

আমি চিঠির দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে মৃত মানুষটার দিকে তাকাই। বলি, তুমি এভাবে নিজে শেষ হয়ে গেলে। তোমার অনেক সর্বনাশ হতে চলেছে।

—মিঃ এণ্ডারসন।

কে যেন আমার নাম ধরে ডেকে উঠলো। আমি পিছন ফিরে তাকাতে স্মিথকে দেখতে পেলাম।

আমি স্মিথের দিকে তাকিয়ে বলি, মিঃ হ্যামেল মারা গেছেন। এখানকার কোন জিনিস ছুঁয়ো না।

তারপর আমি দরজাটা বন্ধ করে বলি, মিসেস্ হ্যামেল কোথায়?

স্মিথ আমার কথার জবাব না দিয়ে আঁতকে ওঠে, মারা গেছেন? আমাদের আর কোন প্রয়োজনে আসবে না?

—এত নার্ভাস হয়ে পড়ো না, আমি স্মিথের কাঁধে হাত রাখি। মিসেস্ হ্যামেল কোথায়?

—আমি জানি না। তবে এখনো তিনি ফেরেননি।

সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে পড়ে, ন্যানসি যদি এখানে আমায় দেখে তাহলে আমায় চিনে ফেলবে এবং ভাবতে ছাড়বে না যে, আমি তাকে পঞ্চাশ হাজার ডলারের জন্য মোক্ষম চাল চেলেছিলুম। আর তার স্বামী মারা যেতে হয়তো আমায় সন্দেহ করতে পারে।

আমি যেতে যেতে স্মিথের দিকে তাকিয়ে বলি, স্মিথ, ভালো করে শোন। আমি গিয়ে এসব ঘটনা জানাচ্ছি। মিসেস্ হ্যামেলকে এখানে আসতে দিও না। তুমি এখানে অপেক্ষা করো, বুঝলে?

তারপর স্মিথ আমার কথায় মাথা নাড়তে আমি এখান থেকে দ্রুত সরে গেলাম এবং কটেজে ফিরে আসতে দেখি, জার্ভিস আমার জন্য অপেক্ষা করছে।

আর তার দু'চোখে যেন একরাশ প্রশ্ন ছড়িয়ে রয়েছে।

জার্ভিসকে সংক্ষেপে হ্যামেলের মৃত্যু সংবাদ জানিয়ে টেলিফোনের কাছে গিয়ে দাঁড়াই। ভাবি, প্রথমে হ্যামেলের সেক্রেটারী পামারকে খবরটা জানানো দরকার। তারপর পুলিশকে।

এরপর জার্ভিসের দিকে তাকিয়ে বলি। একটা টেলিফোন গাইড ডাইরেক্টরী আনতে পারো?

তারপর জার্ভিস একটা স্থানীয় টেলিফোন গাইড আমার দিকে এগিয়ে দেয়। তাতে আমি পামারের বাড়ির নম্বরটা পেয়ে যাই। ভাবি, এখন সে আবার বাড়িতে থাকলে হয়।

—হ্যালো! মিঃ এন্ডারসন, পামার বলে, আমি আপনার ফোন আশা করছিলাম।

—এইমাত্র রাস হ্যামেল নিজেকে গুলি করেছেন। তিনি এখন মৃত। আর মিসেস্ হ্যামেল বাড়িতে নেই। টাইপরাইটারের উপর একটা চিঠি রয়েছে। তাতে মৃত্যুর কারণ লেখা, যেটা প্রেস খুব পছন্দ করবে। এখন পুলিশকে খবর দেওয়া উচিত।

—আমি বিশ্বাস করি না, পামার ভেঙে পড়ে।

—সত্যি, তিনি মারা গেছেন এতটা নার্ভাস হয়ে পড়বেন না। ফোন ছেড়ে দিচ্ছি।

আমি রিসিভার নামিয়ে রেখে অন্ধকারের মাঝে বেরিয়ে আসি, আর ঠিক তখনই 'ফেরারীর' শব্দ পেলাম। বুঝলাম, ন্যান্সি ফিরেছে। এবং আরো নিশ্চিন্ত হবার জন্য তাড়াতাড়ি গাছে চড়লাম।

আমি গাছে উঠে দেখতে পাই, আমার ধারণাই ঠিক। ন্যান্সি 'ফেরারী' থেকে নামছে। তারপর সে আস্তে আস্তে সদর দরজার দিকে এগিয়ে যেতে থাকে। এবং সেখানে আলো থাকায় তাকে দেখতে আমার কোন অসুবিধে হচ্ছে না।

দেখতে পাই, স্মিথ দরজা খুলে দিতে ন্যান্সি ভেতরে প্রবেশ করে, আমার দৃষ্টির বাইরে চলে যায়। আবার দরজা বন্ধ হলো।

ভাবি, এখন স্মিথ ন্যান্সিকে খবরটা জানালে তার মধ্যে কী প্রতিক্রিয়া হবে? সে কী সত্যি হ্যামেলকে ভালবাসতো? না কী শুধু ইতালীর পুলিশের হাত থেকে রেহাই পাবার জন্যই তাকে বিয়ে করেছিল?

তারপর আমার মাথায় একটা চিন্তা এলো। ভাবি, হ্যামেল কেন এভাবে বোকার মত আত্মহত্যা করতে গেল? ন্যান্সি এখন তার সমস্ত সম্পত্তির অধিকারিণী হলো। সমস্ত বইয়ের কপি রাইট এবং ছবি থেকে যে টাকা আসবে তারও মালিক হবে। ফলে সে এখন প্রচুর টাকার অধিকারী হয়ে গেল।

এরপর আমার প্রোফারির কথা মনে পড়ে। জন্ কোল্ডওয়েল ওর সম্বন্ধে আমায় জানিয়েছে, প্রোফারি ইউনাইটেড স্টেটস থেকে এখানে এসেছে হত্যাকারী সংঘের হয়ে টাকার প্রয়োজনে। আর ন্যান্সি তার স্ত্রী। ফলে রেড ব্রিগেডের জন্য প্রচুর টাকা সংগ্রহ করতে পারবে।

তারপর আমি গাছ থেকে নেমে কটেজে ফিরে আসি এবং টেলিফোন বাজছে শুনে দৌড়ে গিয়ে রিসিভারটা তুলে নিই, হ্যালো!

—মিঃ এণ্ডারসন, জার্ভিস বলে। সোলি সাহেব গুলির শব্দ শুনে দারুণ নার্ভাস হয়ে পড়েছেন। আমি তাঁর কাছে রয়েছি। আর আপনি গেটে পাহারায় থাকছেন তো? আমি তাঁকে এই আত্মহত্যার খবর জানিয়েছি। কিন্তু তিনি বিশ্বাস করতে চাইছেন না। বলছেন, এখানে দারুণ গণ্ডোগোল শুরু হয়েছে।

—ঠিক আছে, আর তাকে বলে দিও চিন্তার কোন কারণ নেই। গেট দিয়ে কেউ ঢুকতে পারবে না।

—আচ্ছা, আর এ কথাটা শুনে তিনি কিছুটা নিশ্চিন্ত হবেন।

তারপর রিসিভার নামিয়ে রাখতে রাখতে ভাবি, এখন পামার হয়তো সিকিউরিটি পার হয়ে আসতে চাইবে। তাই আমি মাইককে গার্ডরুমে ফোন করে দিই। সমস্ত ঘটনা জানিয়ে তাকে বলি, আমি মিঃ পামারকে ঘটনাটা জানিয়ে দিয়েছি। তিনি হয়তো যে কোন মুহূর্তে আসতে পারেন। তাঁকে যেতে দিও। আর পুলিশও আসবে। তাদেরও…।

ঠিক আছে।

তারপর আমি রিসিভার নামিয়ে রেখে গেটে এসে অপেক্ষা করতে থাকি, আর ভাবি, আমার এক মিলিয়ান ডলারের মালিক হবার আশা চিরতরের জন্য গেল। এরপর ডলার সম্বন্ধে নতুন ভাবে চিন্তা করতে গিয়ে আরো নিরাশার মাঝে ভেঙে পড়লাম। মুখ দিয়ে একটা অস্পষ্ট শব্দ বেরিয়ে এলো—সোনার হরিণ!

যাক, এখন প্রায় এগারোটা বাজে। পুলিশ এসে হাজির। টম এবং ম্যাক গাড়ি থেকে নামলো। ওদের দেখে আমি এগিয়ে যাই।

টম আমার দিকে তাকিয়ে বললো, এখানে কী সব হয়েছে?

—আমি তখন সোলির পাহারায় ব্যস্ত ছিলাম। তখন একটা গুলির শব্দ শুনতে পাই, এবং গিয়ে দেখি, হ্যামেল শেষ। সঙ্গে সঙ্গে পামারকে জানিয়ে আবার ডিউটিতে ফিরে গেছি।

—তারা কেন তোমায় আমাদের জানাতে বলেনি?

—সেটা পামার জানে। হয়তো আত্মহত্যার চিঠিটা ক্ষতিকারক হতে পারে। আর এতে অনেক টাকার ব্যাপার জড়িত।

—কোন আত্মহত্যার চিঠি ?

—যে চিঠিতে হ্যামেল তার পৃষ্ঠপোষকহীনের কথা জানিয়েছে, আর সেটা প্রেসের পক্ষে খুব লোভনীয় হবে, এবং একজন প্রথম সারির লেখক ধরেছিল।

—তুমি সেখানে গেছিলে ?

—হ্যাঁ।

—কোন জিনিস ধরেছো ?

—এ রকম একটা বোকার মত প্রশ্ন করবে কেন ? আর মিসেস্ হ্যামেল হাঁটে করে বেরিয়েছিল। আর ফিরেছে আধঘণ্টা আগে।

—ঠিক আছে, তোমার সঙ্গে পরে কথা বলবো।

তারপর প্রায় মাঝ রাতে কার্ল আমায় রিলিফ দিতে এসে বললো, মাইক বলেছে, এখানে খুব উত্তেজনা ছড়িয়ে রয়েছে।

- তা তুমি বলতে পারো, আর বুড়োর তা শুনে প্রাণ যায় যায়।

—তার মানে আমায় এখন সারা রাত জেগে কাটাতে হবে।

—হ্যাঁ, তা করতে হবে বই কী !

—আবার বন্দরে আর একটা ঘটনা ঘটেছে।

—কোথায় বন্দরে একটা ধোঁয়া বোম ছুঁড়েছে।

তখন আমি অ্যাকাবোডা বারে স্ন্যাক কিনতে গেছিলাম, আর তার দু' সেকেণ্ডের মধ্যে সবাই পালিয়ে গেল।

এতে আমি ততটা আগ্রহ প্রকাশ করি না। বলি, আমি এখন বাড়ি যাবো। সকালে আবার দেখা হবে। সজাগ থেকো।

আর পুলিশ আমার কথা জিজ্ঞেস করলে বলে দিও, আমি বাড়িতে আছি।

তারা তোমার খোঁজ করবে কেন ?

বলতে পারো, বড়লোকেরা এভাবে মারা যায় কেন ?

এখন রাত দেড়টা। লাউঞ্জিং চেয়ারে বসে স্কচ ঢালি। ভাবি, বার্থাকে খবরটা জানাবো নাকি ? আর আমার মনে হয় না, বার্থা তার অ্যাপার্টমেন্ট আর ফার্নিচার বেচে দিয়েছে। আর যদি তা করে থাকে ? তার উপর যদি শোনে এক মিলিয়ান ডলার আমার হাতের বাইরে, তাহলে সে আর আমার মুখ কোনদিন দেখবে না।

হঠাৎ টেলিফোনটা বেজে উঠতে আমি প্রথমেই বার্থার কথা ভাবি। কারণ বার্থাকে এখন আমার সবচেয়ে বেশী ভয়। তারপর কিছুটা ইতস্তত করে রিসিভারটা তুলে নিই, হ্যালো !

আমি জয়ের গলা বুঝতে পেরেও বলি, তুমি তো জয় ?

হ্যাঁ, মিঃ এন্ডারসন।

আমি তোমার সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টায় ছিলাম এবং তোমাকে বলার ছিল, জিংগোর কথা শুনে আমি কী দুঃখ পেয়েছি! তা তুমি কোথা থেকে ফোন করছো?

জয় আমার কথার জবাব না দিয়ে বললো, ঐ লোকটা সকালে অ্যালামোডা বার থেকে চলে গেছে। আমি আপনাকে অনেকক্ষণ ধরে চেষ্টার পর এই পেলাম।

মানে যে লোকটা ওখানে লুকিয়ে ছিল?

হ্যাঁ, তাকে আমি যেতে দেখেছি। দেখলাম, কে যেন একজন উপর থেকে কী ছুঁড়লো। তারপর জায়গাটা ধোঁয়ায় ভরে যায়। সেখানে এখন উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছে। যখন সবাই পালাচ্ছে তখন দাড়িওয়ালা লোকটা দৌড়ে এসে একটা দাঁড় করানো 'ফেরারী' গাড়িতে উঠলো।

কে গাড়ি চালাচ্ছিল?

একজন মহিলা। সে গাড়ি চালিয়ে চলে গেল তা আমি ছাড়া আর কেউ দেখতে পায়নি। কারণ তখন সবাই পালাতে ব্যস্ত।

তখন জয়, ক'টা বাজে?

এগারোটা চল্লিশ।

সেই মহিলা পরনে কী লাল স্কার্ট আর চোখে সানগ্লাস ছিল?

হ্যাঁ।

ঠিক আছে, আর শোন জয়...।

তারপর লাইনটা জ্যাম হয়ে যায়। এরপর কয়েকবার 'হ্যালো! হ্যালো!' করে রিসিভারটা নামিয়ে রাখি।

এরপর আমি ঘরে ইতস্তত ভাবে কার্পেটের উপর পায়চারি করতে থাকি। ভাবি, হ্যামেল হলিউড যাবার পরই ন্যান্সি বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লো। তারপর ন্যান্সি দুপুরের কিছু পরে পাঁচ মিনিটের জন্য এসে আবার বেরিয়ে গেল। কেন? কেন?...।

আমি একটা সিগারেট ধরাই, তবে কী ন্যান্সি প্রোফারিকে আনতে গেছিল, যে 'ফেরারীতে' লুকিয়ে ঐ বাড়িতে প্রবেশ করেছে। আর ও ক্লাগহার্ট ন্যান্সির চালাকি ধরতে পারেনি।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস, প্রোফারি এ বাড়ির কোথাও লুকিয়ে আছে এবং সে এসেছে হ্যামেল আসার পরই। আর আত্মহত্যা? তা হ্যামেল করেনি, আমি সিগারেটটা ছুঁড়ে ফেলে দিই। প্রোফারি তাকে হত্যা করেছে।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

আমি বসে বসে ভাবছি, হ্যামেল খুব বড়লোক। তার সঙ্গে ন্যান্সির (লুসিয়া প্রোকারির) রোমে দেখা। তাকে ভালোবেসে ফেলে। সে তখন জানতো না, তার বিরুদ্ধে দুটো খুনের ঝামেলা ঝুলছে।

ইতিমধ্যে ন্যান্সি তার চুলে কলপ লাগিয়ে কালো করে ফেলছে এবং চোখের বড় সান গ্লাস ব্যবহার করছে।

তবুও ন্যান্সি বুঝতে পারলো। পুলিশের চোখকে ফাঁকি দিতে পারলেও তার এখান থেকে সরে পড়া দরকার। কিন্তু কীভাবে? তারপর সে হ্যামেলকে বিয়ে করে। ফলে ইতালি থেকে পালিয়ে আসতে তার কোন অসুবিধে হলো না।

প্রোকারিকেও পুলিশ খুঁজছে। কারণ সে হত্যাকারী সংঘের হয়ে টাকা যোগাড় করছে, আর ন্যান্সী বিধবা হলেও হ্যামেলের বিরাট সম্পত্তির মালিক হতে পেরেছে। সে টাকা পেলে সংঘের কাজে লাগবে।

তারপর প্রোকারি ন্যান্সির সাহায্যে আমেরিকা চলে আসে এবং পাইরেটস দ্বীপে গিয়ে আত্মগোপন করে। আর ন্যান্সির কাছ থেকে সে জানতে পারে, হ্যামেল নির্জীব।

এরপর এরা দুজনে ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে থাকে। তারপর তারা দুমাস অপেক্ষা করার পর অপারেশনে নেমে পড়ে এবং তারা চেয়েছিল, হ্যামেল তার বইটা শেষ করুক। তাহলে তাদের হাতে প্রচুর অর্থ এসে যাবে। আর শেষ করার সঙ্গে সঙ্গে তারা তৎপর হয়ে উঠলো।

ন্যান্সি জানতো, ও'ফ্লাগহার্টি'র চোখকে ফাঁকি দিতে পারবে না। তাই 'ফেরারীর' ঢঙে প্রোকারিকে লুকিয়ে এনে ও বাড়িতে তুলেছে। ফলে ও বোকা বোনেছে।

তারপর পুলিশ যখন অনুসন্ধান পর্ব চালালো তখন তারা নিশ্চিত হলো, এটার কোন বাইরের লোক জড়িত নয়। ন্যান্সি তখন ইয়াটে ছিল। আর স্মিথ এবং তার স্ত্রী সন্দেহের বাইরে। তাহলে কী আত্মহত্যা?

আমি একরকম নিশ্চিত যে, ন্যান্সি প্রোকারিকে এনে ঐ বাড়িতে তুলেছে। প্রোকারিই হ্যামেলকে হত্যা করেছে। আর ঘটনাটা দাঁড় করিয়েছে আত্মহত্যার মতন।

এসব কথা ভাবার পর আমার শরীরে একটা শিহরণ অনুভব করি, আর

ভাবি, প্রোফারি ঐ বাড়ির কোথাও না কোথাও লুকিয়ে আছে। ন্যান্সির সাহায্য ছাড়া সে প্যারাডাইস ল্যারগো থেকে বেরুতে পারবে না। আর পুলিশের কাছেও তাকে জবাবদিহি করতে হবে।

ভাবি, এখন আমি কী করবো? পুলিশ ডাকবো? বলবো, প্রোফারি ঐ বাড়িতে লুকিয়ে আছে? কিন্তু তারপর?

এসব থেকে দূরে থাকো বার্ট, আমি নিজেই নিজেকে বলি। তুমি মুখ খুললে বিপদে পড়ে যাবে। সুতরাং এড়িয়ে যাওয়াই এ ক্ষেত্রে বুদ্ধিমানের কাজ।

তারপর আমি শুতে যাই। তবু কী আমি ভাবনার হাত থেকে রেহাই পাই! ভাবি, প্রোফারি কী করছে? আর ন্যান্সি? পুলিশ? শেষ পর্যন্ত এর কোন সঠিক উত্তরই খুঁজে পেলাম না। আমি ঘুমিয়ে পড়ি।

টেলিফোনের শব্দে আমার ঘুম ভেঙে যায়। বিরক্তির সঙ্গে ঘড়ির দিকে তাকাই। এখন সময় দশটা বেজেছে। তারপর বিছানা ছেড়ে উঠে রিসিভারটা তুলে নিই, হ্যালো!

বার্ট! বার্থার গলা ভেসে আসে। তুমি আজকের কাগজটা দেখেছো? হ্যামেল নিজেই নিজেকে গুলি করেছে।

—আমি জানি, বলেই ভাবি। এখন বার্থার মনের কী প্রতিক্রিয়া!

—তুমি হ্যামেলের সঙ্গে কথা বলেছিলে?

—বেবী, বিশ্বাস করো ...।

—আগে তুমি আমার কথার জবাব দাও?

সুযোগ পেয়েও হেলায় হারালে, বলেই বার্থা মুখ দিয়ে একটা শব্দ করলো যেটা একটা বোতলে বোলতাকে পুরে রাখলে হয়।

তা তুমি বল ত পারো।

আর তোমায় একটা খবর দিই।

আমি বিয়ে করছি।

তুমি তাকে বিয়ে করবে ঠিক করেছো?

হ্যাঁ, আর কেনই বা করবো না! তাকে বিয়ে করলে একটা ইয়াট, একটা সুন্দর বাড়ি, প্রচুর ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স, একগাদা চাকর-বাকর ইত্যাদি নিয়ে সুখে থাকতে পারবো।

কিন্তু পুরুষত্বহীন একটা লোককে বিয়ে করে তুমি কী পাবে?

একটা গাধাকে বিয়ে করার চেয়ে তাকে বিয়ে করা অনেক ভালো।

তাহলে এগিয়ে যাও। তাকে বিয়ে করে সুখী হও।

আর তাকে বিয়ে করে আমি সম্পূর্ণ পাল্টে যাবো। সুতরাং তোমাকে

চিরদিনের জন্য বিদায়। আর বার্ট, তুমি বলতে পারবে না যে, তোমাকে আমি সুযোগ দিইনি। বলে সে লাইন কেটে দেয়।

রিসিভার নামিয়ে রেখে আবার বিছানায় ফিরে গেলাম। এবং নিজেকে খুব অসহায় বোধ হচ্ছে। তবু নিজেকে আবার সজাগ করার চেষ্টা করি। ভাবি, আরো কত সুন্দর সুন্দর পুরুষ রয়েছে। পরিবর্তনই তো বৈচিত্র আনে — আর একে কাল তাকে। সেইসঙ্গে একটা নতুন উত্তেজনার স্বাদ গ্রহণ করা যায়। আর মার্থা একটা পুরুষত্বহীনকে বিয়ে করে সম্পূর্ণ পাল্টে যাবে! এ কথা ভাবলেও হাসি পায়।

আমি এসব কথা ভাবতে ভাবতে আবার ঘুমিয়ে পড়ি।

ডিনার টেবিলে একটু দেরী করে এসেছি। টেবিল থেকে 'প্যারাডাইস সিটি হ্যারল্ড' পত্রিকাটি তুলে নিলাম। হ্যামেল আত্মহত্যার খবর প্রথম পাতায় বড় বড় অক্ষরে রয়েছে। কিন্তু সেখানে আত্মহত্যার কোন কথা লেখা হয়নি।

আমার মনে হয়, এটা পামারের কারসাজি! তাতে লেখা রয়েছে—হ্যামেল দারুণ পরিশ্রম করতেন, এবং এক সময় একটু নিরাশ হয়ে পড়েছিলেন। তার ফলেই এ মৃত্যু।

এই মৃত্যু সংবাদে মিসেস্ হ্যামেল দারুণভাবে ভেঙে পড়েছে এবং সেক্রেটারী পামার প্রেস এবং টি. ভি. সাংবাদিকদের সঙ্গে এ প্রসঙ্গে কথা বলেছে। কিন্তু মিসেস্ হ্যামেলকে কারুর সঙ্গে কথা বলতে দেওয়া হয়নি।

তারপর ডিনার থেকে উঠে আমি একটা রেস্তোরাঁর গিয়ে বসলাম। সবাই হ্যামেলকে নিয়ে আলোচনা করছে। তার মধ্যে একজন ভদ্রমহিলার গলা শোনা গেল। সে বলে উঠলো, যে এরকম লেখে, বিশেষ করে শোবার ঘরের দৃশ্যগুলো যেভাবে বর্ণনা করে, তাতে সে বোধহয় বাস্তব জীবনেও দারুণ!

আমার ঐ মহিলার ভুল ভেঙে দিতে ইচ্ছে করে, কিন্তু কিছু বলি না। তবে ভাবি, তোমার ধারণা কী ভুল! তারপর আমি হ্যামেলের কথা ভাবি। তাকে আমি ভালোবাসতাম, এবং তার এই অপমৃত্যুর জন্য আমি দুঃখিত।

তারপর এগারোটা কুড়ির সময় আমি গাড়ি চালিয়ে প্যারাডাইস ল্যারগোতে চলে এলাম এবং যখন আমি পুলের কাছে চলে এলাম তখন প্রায় এক ডজন লোককে সেখানে দেখলাম। তারা পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে কথা বলছে আর ধূমপান করছে।

আমায় দেখে ও' ফ্ল্যাহার্টি গার্ড হাউস থেকে বেরিয়ে আসে এবং পোলটা তুলে দিতে আমি সোজা গেটের দিকে এগিয়ে যাই।

আমি গাড়ি থেকে নামতে কার্ল বললো, ছোকরাটা দারুণ ভয় পেয়েছে।

সারাক্ষণ জার্ভিসকে বিছানার পাশে রেখেছে। আর আমারও অনেক ধকল গেছে। যাক্, চলি।

তারপর কটেজে ফিরে আসতে আমি এক প্যাকেট স্যান্ডউইচ দেখতে পেলাম। এগুলো যেন আমার জন্য অপেক্ষা করছে। এরপর স্যান্ডউইচে

কামড় দিয়ে ভাবি, রাস্তায় কী সব হয়ে চলেছে? পামার কী এখনো ওখানে রয়েছে? না চলে গেছে?

হঠাৎ দেখি, জার্ভিস ক্লান্ত পায়ে আমার কাছে এসে বললো, মিঃ এন্ডারসন আপনার সঙ্গে কথা না বলে কিছুতেই থাকতে পারছি না। আমি সারাক্ষণ সাহেবের বিছানার পাশে ছিলাম। এখন ঘুমোচ্ছেন।

—তা আজ কী রান্না করেছো?

জার্ভিস আমার কথার উত্তর না দিয়ে বললো, ওদিকে স্মিথ এবং তার স্ত্রীকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।

আমি এ কথা শুনে ততটা অবাক হোলাম না। কারণ প্রোফারি ও বাড়িতে এসেছে। তারা প্রোফারি সম্বন্ধে বেশী আগ্রহ প্রকাশ করতে পারে। তাই…।

তবু আমি বিস্ময়ের ভাব প্রকাশ করে বলি, তাড়িয়ে দিয়েছে?

—হ্যাঁ। এটা খুব দুঃখের। মিঃ পামার এখুনি ওদের চলে যেতে বলেছেন। ওদের কোন সময় দেওয়া হয়নি। বিছানা-পত্তর বাঁধো এবং রওনা দাও। পনেরো বছর চাকরির কী সুন্দর পরিণতি। তবে ওদের এক বছরের মাইনে দিয়েছে। আর মিঃ পামার বলেছেন, ওদের মিসেস্ হ্যামেল আর চাইছেন না। তিনি আগে খুব ভালো ছিলেন। তিনি খুব শক পেয়েছেন।

—মিসেস্ হ্যামেল কেমন আছেন?

এখন ওরা আর ন্যান্সি হ্যামেলকে ভালো বলছে না এবং যাবার সময় দেখা পর্যন্ত করেনি। ওরা এত রেগে গেছে।

—তাহলে এখন বাড়িটার কে দেখাশুনা করবে? আমি আর একটা স্যান্ডউইচে কামড় বসিয়ে বলি।

—তা আমি বুঝতে পারছি না। তবে স্মিথ নাকি পামারকে বলেছেন, মিসেস্ হ্যামেল এ বাড়ি ছেড়ে চলে যাবার আগে জোস জোন্স দেখাশুনা করবে এবং মিসেস্ হ্যামেলের ইচ্ছে মিঃ হ্যামেলের কাজটা হয়ে গেলে এসব বেচে দেবেন।

মনে মনে ভাবি, জোস জোন্স? তারপর বলি, মিঃ পামার কী এখনো ওখানে রয়েছেন?

—না, পুলিশ চলে যাবার পর তিনিও চলে গেছেন।

আমার যা জানার তা জানা হয়ে গেছে। তারপর জার্ভিস চলে যেতে আমি হাঁটতে হাঁটতে গেটের কাছে সেই বড় গাছটায় উঠি।

বিল্ডিং হয়ে আলো রয়েছে। পর্দার আড়ালে হয়তো ন্যান্সি আর গ্রোফারি বসে প্ল্যান করছে, এবং টাকাটা পেলে তারা কীভাবে পালাবে।

এভাবে একঘণ্টা পার হয়ে গেল, কিছুই ঘটলো না। কোন ঘরের আলো জ্বলছে নিবছে।

হঠাৎ আমি একটা গাড়ির শব্দ পেলাম। সঙ্গে সঙ্গে সোজা হয়ে বসি। এখান থেকে গাড়িটা দেখতে পাচ্ছি।

গাড়ি থেকে জোন্স বেরিয়ে এসে লাল বোতাম টিপে অপেক্ষা করতে থাকে। এরপর গেটটা খুলে যেতে সে গাড়ি চালিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ে। ও চলে যেতে গেটটা আবার আপনা আপনি বন্ধ হয়ে যায়।

জোন্স সদর দরজা দিয়ে ঢুকতে গ্রোফারিকে দেখা গেল। তাকে এক নজর দেখেই আমি চিনতে পারলাম। চওড়া কাঁধ। গোল মুখ।

হঠাৎ জোন্স গ্রোফারির দিকে ত কিয়ে চেঁচিয়ে বললো, লাইটটা কে আবার জ্বালালো!

সঙ্গে সঙ্গে আলো নিবে গেল। তারপর খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে কটেজে ফিরে এলাম এবং চেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে স্কচের বোতলে চুমুক দিতে দিতে হঠাৎ একটা কথা আমার মাথায় এলো। আমি এখন একান্তভাবে টাকার কথা চিন্তা করছি। আবার এক মিলিয়ান ডলারের চিন্তা আমার মাথায় এলো। এবং মনে মনে বলি, ঠিকমত কার্ড ফেলতে পারলে বাজিমাৎ করতে পারবো।

তারপর রাস্তার দিকে যেতে যেতে ভাবি, দুজন সন্ত্রাসবাদী হ্যামেলের বাড়িতে লুকিয়ে আছে। তার মধ্যে একজন হ্যামেলের বিরাট সম্পত্তির অধিকারী হবে। কত টাকার মালিক হবে সে সম্বন্ধে আমার ধারণা না থাকলেও বইয়ের জন্য এগারো মিলিয়ান ডলার, আর অন্য সব মিলিয়ে অন্তত কুড়ি মিলিয়ান ডলার হবে।

ভাবি, যারা কম করে কুড়ি মিলিয়ান ডলারের মালিক, তারা কী না আমায় মাত্র পঞ্চাশ হাজার ডলার দিয়ে মুখ বন্ধ করে দিয়েছে! সত্যি, কী বোকা আমি।

সঙ্গে সঙ্গে আমার আবার ডিয়াঙ্কের সাবধানবাণীর কথা মনে পড়লো—তুমি ফের যদি এসে টাকার জন্য চাপ দাও, তাহলে এর পরিণাম বিষময় হবে এবং এটা মনে রাখলে খুশী হবো।

আবার ভাবি, আমি কী বোকা! একটা গ্রীস মাখানো বল দেখে কী ভয়টাই না পেয়ে গেলাম!

কটেজে ফিরে আসি। ডেস্কে টাইপরাইটার এবং কিছু কাগজ রয়েছে। ভাবি, আমার নিরাপত্তার জন্য আগে কিছু করা দরকার। আমি ডুবলিকেট টাইপ করি এবং এটা ওদের জানাতে চাই—ন্যান্সি কীভাবে গ্রোফারিকে এনে হ্যামেলের বাড়িতে লুকিয়ে রেখেছে। হ্যামেল মারা যাবার আগে সে ইয়াট নিয়ে

বেরিয়েছিল অর্থাৎ একটা অজুহাত খাড়া করার জন্য এবং প্রোফারির হ্যামেলের আত্মহত্যার কারণ দেখিয়ে নিজে কীভাবে হ্যামেলকে হত্যা করেছে। সে আর ন্যান্সি এখানে ওখানে রয়েছে এবং এটা প্রেসের হাতে দেওয়া দরকার।

প্রথম কপিটা একটা খামে পুরে হাওয়ার্ড সেলাভির উদ্দেশ্য করে লিখলাম, সে যদি আমার কাছে থেকে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে কিছু শুনতে না পায়, তাহলে সে যেন এই খামটা পুলিশ প্রধান টেবেলের হাতে দেয়। আর দ্বিতীয় কপিটা আর একটা খামে রাখলাম।

তারপর লাউঞ্জিং চেয়ারে বসে আরাম করে শকচে চুমুক দিচ্ছি এবং চিন্তায় যখন স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছলাম তখন ভাবি এই এক মিলিয়ান ডলার পেয়ে আমি কী করবো!

হঠাৎ আমার বার্থার কথা মনে হলো। ভাবি, ওকে ফোন করে বলি, ঐ নপুংশক লোকটাকে বিয়ে করো না। আর তুমি আমাকে ছাড়া থাকতে পারবে না। এবং তুমি আমাকে ছেড়ে যাবে তাও আমি চাই না।

সেদিনের ঐ কথা এবং আরো ভাববার পর বার্থাকে নির্বাসন দিলাম। ভাবি, এক মিলিয়ান ডলারের মালিক হলে নিত্য নতুন পাখি এসে আমার কাছে ভিড় করবে। এই চিন্তায় বেশ উম্মাদনা বোধ করতে থাকি।

ভাবি, কী সুন্দর সব স্বপ্ন! অপূর্ব।

তার পরের দিন কার্ল আমায় রিলিফ দিতে এলে আমি গাড়ি চালিয়ে ট্রুম্যান বিল্ডিং-এ হাজির হই এবং সেখানে গিয়ে সেলাভির ইঁদুরমুখো মেয়েটার কাছে গিয়ে স্টেটমেণ্টটা দিয়ে বললাম, সেলাভির লেটারহেডে এর একটা রিসিট দাও এবং তাকে সই করিয়ে স্টেটমেণ্টটা আলমারিতে রেখে দেবে।

—আচ্ছা, সে সায় জানিয়ে চলে যায়।

তারপর সে ফিরে এসে আমার হাতে রিসিটটা দিতে তার উদ্দেশ্যে একটা চুমু ছুড়ে দিয়ে বলি, তোমার কাজ দারুণ!

এরপর আমি অ্যামেলিয়া রোনসনের কাছে যাই। এই মাঝারী বয়েসী ভদ্রমহিলা দ্বিতীয় সেক্রেটারী। তাকে একটা রেস্তোরাঁয় বসিয়ে খাইয়ে নানা তথ্য সংগ্রহ করে সোল ফিঙ্কেনস্টেইনের অফিসে যাই। ওর সঙ্গে দেখা পেতে আমার কিছু অসুবিধে হলো। বড় ব্যস্ত। সে 'এস এফ' নামে শহরে পরিচিত। সে লোককে টাকা বাড়াতে সাহায্য করে। পেসিফিক পোস্টে তার এই ব্যাপারে সবচেয়ে নাম। তাছাড়া, প্রতি মাসে এজেন্সীর তরফ থেকে দামী দামী খাবার পায় এবং আমরা তার বিনিময়ে জানতে চাই, কে কে টাকা ধার নিয়েছে বা দিচ্ছে না। এবং তাতে সেই বা কী অ্যাকশন নিচ্ছে।

আমি সোলকে এক মিলিয়ান ডলারের লোনের কথা বললাম। তা শুনে সে বললো, কোন অসুবিধে হবে না। অসুবিধে যারা অল্প নেয়। আর এক

মিলিয়ানের ক্ষেত্রে শতকরা পঁচিশ ভাগ আদায়কারী হিসেবে চার্জ করে থাকি। এবং খারাপ লোকের ক্ষেত্রেও আমরা ঝুঁকি নিই।

এ কথায় আমি মানে বুঝলাম। তারপর আরো নানারকম খবরা-খবর নিয়ে বন্দরে হাজির হই।

বন্দরে এসে দেখি, টুরিস্টরা ঘুরে বেড়াচ্ছে। জেন্ডারা তাদের মাল বেচার জন্য বেশী ডিসকাউন্ট ঘোষণা করছে, এবং মাছ ধরার নৌকোগুলো এখনো বোঝাই হয়নি।

আমার ডিয়াজের কথা মনে পড়ে, একটা সাংঘাতিক লোক। তবে এবার আমি তাকে বাগে পেয়েছি, যাতে সে আমায় বেকায়দায় না ফেলতে পারে।

তারপর আমি পিস্তলটা পকেট থেকে বার করে জ্যাকেটের মধ্যে রাখি। এরপর গাড়িটা পার্ক করে অ্যালামেডা বারের দিকে যাই।

অ্যালামেডা বারে প্রবেশ করতে মোটা বারকিপারটা আমায় দেখে হেসে এগিয়ে আসে। বারে বেশ ভিড়। ছিনতাইকারী এবং মাছের কারবারীরা বার জমিয়ে বসেছে।

আমি বারকিপরকে জিজ্ঞেস করি, ডিয়াজ কোথায় ?

দাঁড়ান, বলে সে টেলিফোনের দিকে এগিয়ে যায়।

ও যখন ফোন করছে তখন বুঝলাম ডিয়াজ অফিসে আছে। তাই আমি ডিয়াজের অফিসে গিয়ে হাজির হই।

ডিয়াজ একটা ডেস্কের পেছনে বসে আছে। দাঁতে একটা সিগার চেপে ধরে আছে। আমি যেতে দেখি, সে রিভলবারটা নামিয়ে রাখলো। চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ।

—কেমন আছো ? আমি ডিয়াজের দিকে তাকাই। আমাকে চিনতে পারছো তো ?

আমি কথা শেষ করে একটা চেয়ারে বসি। সামনে ডেস্ক। ডিয়াজের দিকে বন্ধুত্ব ভাব নিয়ে তাকাই।

—আমি তোমাকে আমার থেকে দূরে থাকতে বলেছিলাম না ! ডিয়াজ কথাটা আস্তে বললেও সে যেন সাপের মত হিস হিস করে উঠলো।

—সময় পাল্টাচ্ছে, আমি বলি, পরশু আজ নয়।

ডিয়াজ সিগারের ছাই মেঝেতে ঝেড়ে মুখটা ভাবলেশহীন করে বলে, তুমি কী চাও ?

—তোমাকে আমি নতুন পার্টনার করতে চাই।

—তুমি ? ডিয়াজ চোখ কুঁচকে আমার দিকে তাকায়।

—হ্যাঁ, আমি।

—তুমি তোমার জায়গায় ফিরে যাও, বলে ডিয়াজ পকেট থেকে রিভলবার

বার করে।

তা দেখে আমি হাসতে হাসতে বলি, তুমি আমায় অফিসের মধ্যে কিছুতেই হত্যা করবে না। আর তুমি এখন হলে গিয়ে আমার নতুন পার্টনার। তুমি কী কুড়ি মিলিয়ান ডলার হারাতে চাও! তা আমি বিশ্বাস করি না।

ডিয়াজের চোখ স্বাভাবিক হয়ে আসে এবং রিভালবার নামিয়ে বলে, তুমি আমায় ব্ল্যাকমেল করতে এসেছো?

একটা মিথ্যেবাদী। নিজেই নিজেকে বলি এবং এটা খুব সহজে হওয়া যায়।

তাই বলি, এবার যা বলি শোন। আমি অনেক কিছুই জানি, কিন্তু তুমি সে সব কিছুই জানো না। আর প্রোফারি একটা ধারণা পোষণ করে। অবশ্য জানি না কেন। লুসিয়া ওরফে ন্যান্সি, যে দুটো খুন করেছে। আর প্রোফারি সন্ত্রাসবাদী দলের একজন। আর সেই হ্যামেণ্ডকে হত্যা করেছে প্রচুর মিলিয়ান পাবে বলে।

আমি একটু থেমে আবার বলি, আমি এসব জেনে যখন ন্যান্সিকে চাপ দিলাম তখন তুমি ন্যান্সির এজেন্ট হিসেবে মাত্র আমায় পঞ্চাশ হাজার ডলার দিয়ে মিটিয়ে দিলে। আর এখন সে টাকার আমার আর কিছুই নেই।

তারপর আমি ব্যাগ থেকে স্টেটমেণ্ট বার করে ডিয়াজের সামনে রাখি এবং সোলির রিপোর্টটাও। বলি, এদিকে দেখো। এসব ছাপানো।

আমি ডিয়াজের দিকে তাকাই। দেখতে পাই, এক ধরণের উত্তেজনায় তার মুখ ঘামে ভিজে উঠেছে এবং সে দুটো জিনিসই পড়ছে।

—এগিয়ে যাও এবং আমাকে হত্যা করো, আমি ডিয়াজের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসি। তারপর বলি, সই করলে সবুজ ডলার নিয়ে সুখে দিন কাটাতে পারবে এবং তুমিও বারের অবস্থা ফেরাতে সক্ষম হবে।

ডিয়াজ ডেস্কের উপর রিভালবার রেখে আমার দিকে তাকায়। তার চোখ দুটো হায়নার মত জ্বলজ্বল করছে।

—আমি লোভী নই, আমি বলি, তবে এ মুহূর্তে আমি মিলিয়ান ডলার চাই। তুমি ওদের কাছ থেকে অনেক নিয়েছো। নইলে তোমার কী এমন স্বার্থ যে নিজের চরম বিপদ জেনেও এমন সাংঘাতিক লোককে আশ্রয় দিয়েছ। আর অনেক বোর্ডার মত সেও একজন বোর্ডারের বশে আমায় বোকা বানাতে চেষ্টা করবে না।

একটু থেমে আবার বলি, তোমার কাছে, এক মিলিয়ান আদায় করবো আমি ফাইন হিসাবে। কারণ তুমি আমায় ঠকিয়েছো বলে। আর তোমার কাছে আছেও অনেক। তাই আমার ঐ টাকাটা চাইই চাই।

ডিয়াজ আমার দিকে এখনো সেইভাবে তাকিয়ে আছে! আমি তা ভ্রূক্ষেপ

না করে বলি, আমার কাছে আরো অনেক খবরা-খবর আছে। তিন মাসের মধ্যে ছ্যামেলের সম্পাদক হিসেব নিজেই হয়ে যাচ্ছে। ন্যান্সি বিরাট সম্পত্তির মালিক হচ্ছে। তা ধরো, কুড়ি মিলিয়ান তো নিশ্চয়ই। এ ছাড়া বইয়ের রয়াল্টি আছে। তা অন্তত প্রতি বছর পাবেই!

ডিরাক হাঁ, না না কিছুই বলছে না। যেমন বসেছিল, ঠিক তেমনি ভাবেই বসে আছে।

আবার বলি, আমি এক মিলিয়ান চাই। এটা কোন সমস্যাই নয়। সোলির সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। তুমি সই করে দিলেই সে আমায় এক মিলিয়ান দেবে শতকরা পঁচিশ ভাগ সুদ হিসাবে। আর তুমি যদি না দাও তাহলে তার লোকেরা তোমায় রেহাই দেবে না। এবং তুমি পেয়েছোও প্রচুর। আর পাবেও অনেক। তাই এটা তোমার কাছে কোন সমস্যাই নয়।

ডিরাক এখন আমার দিকে এমন ভাবে তাকালো যেন সে একটা সাপ এবং কোথায় একটা বেজিকে চেপে ধরতে পেরেছে।

তবুও আমি স্বাভাবিক ভাবে বলি, এটা আমি বন্ধুত্বপূর্ণভাবে করতে চাইছি। বলেই আমি ব্যাগ থেকে এস এফ-এর লোনের ফর্মটা ডিরাকের সামনে রাখি।

—আমি সই করবো না, বলে কিন্তু ডিরাক ঝুঁকে ফর্মটা দেখতে থাকে। না, না, কখনোই করবো না। তুমি কী ভাবো, আমি একটা মাতাল?

—সই না করলে তোমার কিন্তু সেই দশা হবে, আর ঐ মিলিয়ান গুলোতে তুমি যাই যাই করতে চাও এবং তোমার যারও কুড়ি বছর পিছিয়ে থাকুক। এখন তুমি যা বোঝ।

ডিরাক ওখানেই বসে আছে। তার মুখ থমথমে। আমি ভাবি, ডিরাক হয়তো এস. এফ-র কথা ভাবছে। এস. এফ-র টাকা আদায় করার কায়দা অভিনব। আর ডিরাক যদি সই না করে, তাহলে সারাজীবন তাকে খুঁড়ে থাকতে হবে।

আমি ধৈর্য হারিয়ে ফেলি। ধমকের সুরে বলি, সই করো। নইলে এখনি গিয়ে পুলিশকে জানাবো।

—পুলিশ? ডিরাক চিবিয়ে কথা বলে।

—তার পরিণাম কী হবে তা কী একবারও ভেবেছো? না ভাবোনি। তাহলে কখনো এ ধরনের কথা বলতে পারতে না।

ভেবেছি, তাহলে কী ভেবেছি শোন। তুমি পুলিশে খবর দিলে আমার বছর তিনেক জেল হবে। আর তুমি বেশ কিছু অর্থের বিনিময়ে গ্রোফারির মতন একজন সাংবাদিক সন্ত্রাসবাদীকে লুকিয়ে রাখার অপরাধে তোমার অন্তত কুড়ি বছর জেল হবে।

আমার কথা শুনে ডিয়াজ একটু নড়ে চড়ে বসলো, কিন্তু মুখে কিছুই বললো না। কপালের ঘাম মুছলো।

—তোমার কাছে আমি আর আসবো না, আমি ডিয়াজকে আগ্রহ জাগাই। সোলিদ টাকাটা দিলে আমি এ শহর ছেড়ে চিরতরের জন্য চলে যাবো! আর তুমি মিলিয়ান ডলার নিয়ে সুন্দরভাবে জীবন কাটাবে।

আমি ভাবি, যেখান থেকে চলে এসেছি সেখান থেকে ফেরা আমার পক্ষে আর কিছুতেই সম্ভব নয়। এক মিলিয়ান যেন হাতছানি দিয়ে কাছে ডাকছে! তবে এ কথা ঠিক, আমি পুলিশকে খবর দেব না।

সহসা দেখি, ডিয়াজ কাঁপা হাতে পেনটা তুলে নিয়েছে। আমি তাকে লক্ষ্য করছি। আমার সেইসঙ্গে উত্তেজনা বাড়ছে। আমি নিশ্বাসের শব্দ যেন শুনতে পাচ্ছি। ভাবি, তাহলে এক মিলিয়ান ডলার আমার হবে। আর আমি যেন ডলার আসার শব্দ শুনতে পাচ্ছি।

কিন্তু দৃশ্যপটের পরিবর্তন ঘটলো। হঠাৎই একটা কাণ্ড ঘটে গেল, যার জন্য আমি বা ডিয়াজ কেউই প্রস্তুত ছিলাম না। এবং ঘটেও গেল খুব দ্রুতভাবে।

হঠাৎ একটা ছেলে ঘরে ঢুকে বললো, ডিয়াজ! তুমি আমার ভাইকে খুন করেছো। এখন আমি তোমায় ছাড়বো না। তোমায় আমি খুন করবো।

আমি সঙ্গে সঙ্গে পিছন ফিরে তাকাই! জয় দরজার কাছে দাঁড়িয়ে। তার হাতে উদ্যত রিভলবার '৩৮! এবং সেটা ডিয়াজের দিকে তাক করে রয়েছে!

—জয়! এ কাজ করো না, আমি চেঁচিয়ে বলি।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে রিভলবার গর্জে উঠলো। আমি ডিয়াজের দিকে তাকাই। তার মুখ রক্তে ভরে ওঠে। এবং সে সেখানেই বসে রইলো। পেনটা তার হাতে ধরা রয়েছে। কিন্তু ফর্মে সই করেনি।

আমি সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে ডিয়াজের হাত থেকে ফর্ম এবং সোলিদ রিসিপ্টটা নিয়ে পকেটে রেখে জয়ের দিকে তাকাই। ভাবি, এবারও মিলিয়ান ডলারের মালিক হতে পারলাম না। ডলার শুধু আমায় আশায় আশায় ছুটিয়ে মারছে। ও যেন একটা সোনার হরিণ।

আমি জয়ের দিকে জ্বলন্ত ক্রোধে তাকিয়ে আছি। ওকে এ মুহূর্তে কিছুতেই ক্ষমা করতে পারছি না। ওই আমার মিলিয়ান ডলারের মালিক হতে দিলো না। ও আমার বাড়া ভাতে ছাই দিল। তাই আমার এখন সমস্ত রাগ গিয়ে জয়ের উপর পড়ল।

অথচ জয় মিটি মিটি হাসছে। ওর হাসি দেখে আমার শরীর জ্বলে যাচ্ছে। এবং ওর খুশী দেখে আমার মনে হচ্ছে। ও যেন জন্মদিনে একটা ভালো উপহার পেয়েছে।

—মিঃ এন্ডারসন, যে আমার লোককে খুন করেছে, আমিও তাকে বা তাদের সেই অবস্থা করে ছাড়বো !

—জয়, এখুনি এখান থেকে পালাও, আমি ওকে চাপা কণ্ঠে বলি।

— হ্যাঁ মিঃ এন্ডারসন, জয় হেসে আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে থাকে।

তখনো জয় খুব একটা দূরে যেতে পারেনি। আর ঠিক তখনই চিৎকার শোনা গেল, তারপরই জয় বিপদে পড়লো।

তিনটে মেক্সিকান হৈ হৈ করতে করতে অফিস ঘরে ঢোকে এবং জয়কে ধরে সেখানে নিয়ে আসে। আর ইতিমধ্যে একটা মেক্সিকান জয়ের হাত থেকে রিভলবারটা ছিনিয়ে নেয়।

অফিসে লোক ভর্তি। সবার দৃষ্টি এখন ডিয়াজের দিকে। আর তখন আমি চুপিসারে সবার অলক্ষ্যে ওখান থেকে সরে পড়ি।

কিন্তু জয়ের চিৎকার বাইরে থেকে শুনতে পাই, আমি ওকে খুন করেছি ! খুন করেছি ! টম আমার কথা শুনতে পাচ্ছো। জিপো আমার কথা শুনতে পাচ্ছো !

তারপর আমি এখান থেকে বেরিয়ে দ্রুত ম্যাসারের দিকে এগিয়ে যাই এবং গাড়ি স্টার্ট করে দিই। আর ঠিক তখনই যেন বাতাসের বুক চিরে পুলিশের সাইরেন বেজে উঠলো।

আমি অ্যাপার্টমেন্টে ফিরে এসে নিরাশায় কাছে ভেঙে পড়ি। সেই সঙ্গে একরাশ ভয়ও আমাকে পেয়ে বসে। ভাবি, পুলিশ এসে আবার আমায় গ্রেফতার করবে না তো !

আমি অশান্তভাবে ঘরে পায়চারি করতে থাকি। আর ভাবি, অ্যালামোডা বারে কেউ আমার নাম জানে না। আর আমি যে ওখান থেকে সরে পড়েছি তা কেউ দেখেনি। তবে জয় হাতে নাতে ধরা পড়েছে। পুলিশের চাপে আমার নাম যদি করে বসে, তখন ?

তবু আমি মনে মনে বলি, বার্ট সহজ হও। এতে এত চিন্তার কী আছে ? জয় কখনো এ কাজ করতে পারে না। সে বাচ্চা হলেও ওসব বিষয়ে যথেষ্ট বুদ্ধি ধরে।

তারপর পায়চারি থামিয়ে পুরো এক গ্লাস পানীয় খেয়ে ফেললাম। তবু তৃষ্ণার্ত বোধ করছি। আবার এক গ্লাস ভর্তি করলাম।

ভাবি, ডিয়াজ মারা যেতে ন্যান্সি এবং গ্রোফারি আরো খুশী হবে। সেই সঙ্গে জোন্সও। আর ডলারের জন্য ওই সব সাংঘাতিক লোকের কাছে চাপ দেওয়া সম্ভব হবে না। এবং সেটা করলে শুধু বোকামির কাজ হবে।

আবার কতগুলো ভাবনা আমার চিন্তিত করে তোলে। মিলিয়ান ডলারের মালিক আর এ জীবনে হওয়া সম্ভব হলো না! তারা চিরতরের জন্য টা টা বাই বাই করে চলে গেছে। আর তার বদলে পুলিশ না এসে আমার ঘাড় চেপে ধরে। যদি কপাল ভালো হয় তবেই রেহাই পাবো। আর এখন থেকে সস্তা দরের মেয়ে নিয়ে ফুর্তি করার কথা ভাববো।

কিন্তু কর্নেল? সে যদি এসব আঁচ করে অথবা আমায় অন্য কোন কারণে অবসর নিতে বলে তখন? অথবা যদি বলে অন্য কোন শহরে গিয়ে থাকো! আর সে এ সব কথা বলা মানে আস্তে আস্তে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাওয়া।

আমি গ্লাসে চুমুক দিয়ে ভাবি, আমি কী সত্যি দারুণভাবে ভেঙে পড়ছি।

আমি চেয়ারে বসে আছি, আর চিন্তা ভাবনা করতে পারছি না। শুধু পান করে যাচ্ছি। আর মনটা ধীরে ধীরে অন্ধকারের মাঝে তলিয়ে যাচ্ছে। ভাবি, ছ' ঘণ্টা পরে আমায় ডিউটিতে যেতে হবে।

হঠাৎ টেলিফোনটা বেজে উঠলো। তবু আমি টেলিফোনটা ধরি না। ওটা বেজেই চললো। শুধু আমি গ্লাসে চুমুক দিতে থাকি।

ভাবি, বার্থাও তো ফোন করতে পারে। তবে আমি এখন ওকে নিয়ে ভাবতে চাই না। আর আমি তো এখন তার কাছে একটা গাধা বই তো কিছুই নয়। ঐ পুরুষত্বহীন লোকটার অর্থ তাকে আমার সম্বন্ধে এ সব ভাবতে সাহায্য করেছে। তাই ফোন বেজে চলুক।

এক সময় ফোনটা থেমে যায় এবং ক্ষুধার্ত মনে হয়। কিচেনে গিয়ে রেফ্রিজারেটার খুলে দেখি, কিছুই খাবার নেই। শুধু এক বোতল স্কচ রয়েছে।

তারপর চেয়ারে ফিরে এসে চোখ বুজি। সময় অতিবাহিত হয়ে যাচ্ছে। ভাবি, আমি ম্যাসারে বসে আছি। আর আমার ব্যাভিচারী একটু আগে ফিরলো, যে একটু আগে উষ্ণ সান্নিধ্য উপভোগ করে উঠে এলে ভাবি, এই কী আমার ভবিষ্যৎ?

হঠাৎ সদর দরজার বেলটা বেজে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে আমি ভয়ে কঁকিয়ে যায়। সারা শরীরে একটা আতঙ্কজনিত শিহরণ অনুভব করতে থাকি। ভাবি পুলিশ নাকি? হলেও আশ্চর্য হবার কিছুই নেই। কারণ আমি তো পাপী, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

আমি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াই। চেয়ারে বসে থাকতে থাকতে একটু তন্দ্রার মত এসেছিল। ফলে এখন আমার কিছুটা ভদ্রস্থ দেখাচ্ছে। আর আমি হাতঘড়ির দিকে তাকাই। এখন সময় রাত এগারোটা পাঁচ।

আমার হৃৎপিণ্ড কাঁপিয়ে বেলটা আবার বেজে উঠলো। তারপর চুল আঁচড়ে গায়ে একটা জ্যাকেট জড়িয়ে বারান্দার দিকে এগিয়ে যাই।

আমার বুকের কম্পন ক্রমশঃ বেড়ে চলেছে। আসলে আমি এক ধরণের ভয়ে কে'পে কে'পে উঠছি। তবুও এ সময় মাথা ঠিক রেখে ভেবে নিই টমের সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের কীভাবে মোকাবিলা করবো।

তৃতীয়বার বেলটা বেজে উঠলো। তারপর একরাশ অস্বস্তি নিয়ে দরজা খুললাম। সঙ্গে সঙ্গে আমার আর অস্বস্তি রইলো না। দরজার বাইরে গ্লোরিয়া দাঁড়িয়ে আছে।

গ্লোরিয়া আমায় মৃদু ধাক্কা দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করলো এবং লিভিং রুমের দিকে এগিয়ে যায়।

গ্লোরিয়াকে দেখে আমার এক ফ্যাসাদ। কারণ ওকে আমি টেপের বিনিময়ে দশ হাজার ডলার দেবো কথা দিয়েছিলাম। ভাবি, উঃ, আজ একের পর এক কী বিপদেই না পড়ছি! এখনো রাতের অনেক বাকী। এরপর আরো কত কী ঘটবে কে জানে!

তারপর ক্লান্ত পা দুটোকে কোনরকমে টেনে নিয়ে লিভিং রুমে এলাম, শোন বেবী,...।

—তুমি থামবে! গ্লোরিয়া ধমকে উঠে আমার কথার মাঝে থামিয়ে দেয়। তুমি আমার কথা শুনবে?

গ্লোরিয়া আমায় এমনভাবে থামিয়ে দিল যে তাতে আমি কিছুটা দিশেহারা হয়ে পড়ি। এরা এক ধরণের মেয়ে মানুষ, যাদের পুরুষরাও সমীহ করে চলে। তবু নিজেকে স্বাভাবিক করে বলি, একটু পানীয় দেবো?

গ্লোরিয়া আমার দিকে এমনভাবে তাকালো যে স্কচের দিকে হাত বাড়িয়েও টেনে নিলাম এবং ওর কাছাকাছি একটা লাউঞ্জিং চেয়ারে বসি।

তারপর বলি, বলো, তুমি কী বলবে?

তুমি আমায় টেপ রেকর্ডারটা দিয়েছিলে, তা আমি ডিরাজের অফিসে লাগিয়ে দিয়েছি এবং শুনেছিও। এতদিনে আমার মরে যাবার কথা ছিল।

—মানে?

—ডিরাজ আমায় হত্যা করার প্ল্যান করেছিল। সে আমার মাথায় আঘাত করে বন্দরে ফেলে দিয়েছিল। বলে গ্লোরিয়া খিল খিল করে হেসে ওঠে এ হাসি বোধহয় হায়নাও হাসতে পারবে না। তারপর সে হাসি থামিয়ে বলে, দেখো, ভাগ্যের কী নির্মম পরিহাস, আমি বেঁচে গেলাম, আর সে মরে গেল।

তারপর গ্লোরিয়া বলে, তোমার ঐ টেপের জন্য আমি জীবন বাঁচাতে পেরেছি। এখন তুমি ন্যান্সির জীবন বাঁচাও।

—ন্যান্সির?

—কী বলছো কী?

—ঠিকই বলছি।

—তোমার কথার মাথা মুণ্ডু আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।

—আমার কথা শুনলেই তুমি বুঝতে পারবে।

—গত দু'রাত ধরে আমি প্রোফারি আর ভিয়াজের কথাবার্তা শুনেছি এবং তাতে আমি বুঝতে পেরেছি, ন্যান্সির একজন বোন জমজ আছে।

- কে সে?

—লুসিয়া।

লুসিয়ার সহসা আবির্ভাব আমি যেন ধৈর্য হারিয়ে ফেলি এবং সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়লো, পাইরেটেস আয়ল্যান্ডের দুটো বিছানার কথা। আর সেদিন ইয়াটে যে মহিলা দেখেছি। সে তাহলে ন্যান্সি নয়, লুসিয়া।

সহসা আমি সজাগ হয়ে উঠি। বলি, একটু থাকো।

আমার কথায় কান না দিয়ে গ্লোরিয়া বলে, আমি ওদের কথাবার্তা শুনে বুঝতে পেরেছি, ওরা কী দারুণ চালাক!

—কেন?

পোল হাইবি বুঝতে পেরেছিল, লুসিয়া ন্যান্সিকে সর্বনাশের মুখে টেনে নিয়ে যাচ্ছে।

—এরপর লুসিয়া ন্যান্সিকে ফোন করে অ্যালামোডা বারে নিয়ে আসে।

—ন্যান্সি গেল?

—হ্যাঁ। কারণ, বোনের কথা সে ঠেকতে পারেনি, কিন্তু গিয়ে সে বিপদে জড়িয়ে পড়লো।

—ন্যান্সি ওখানে যাবার সঙ্গে সঙ্গে ওরা ন্যান্সিকে একটা ঘরে আটকে রাখে এবং ওর জামাকাপড় লুসিয়া পরে নেয়। এবং প্রোফারিকে ট্যাঙ্কের মধ্যে লুকিয়ে ন্যান্সির গাড়ি ব্যবহার করে হ্যামেলের বাড়িতে প্রবেশ করে।

তারা আদৌ বুঝতে পারেনি। তারপর প্রোফারিকে বাড়িতে রেখে লুসিয়া ইয়াটে করে বেরিয়ে পড়ে। আর ঠিক তারপরই প্রোফারি হ্যামেলকে হত্যা করে, ফলে লুসিয়া সন্দেহের বাইরে থেকে যায় এবং ফিরলো হ্যামেল মারা যাবার পর। আর বুড়ো ছাগল পামার পর্যন্ত ন্যান্সিকে চিনতে পারলো না! সে প্রেসের সঙ্গে কথা বলে।

—ন্যান্সির খবর কী?

—গত রাতে জোন্স ন্যান্সিকে হ্যামেলের বাড়িতে নিয়ে আসে। ন্যান্সিকে ঘুমের ওষুধ খাইয়ে অজ্ঞান করে রাখা হয়েছে।

—তাহলে ওরা এখন চারজন ঐ বাড়িতে রয়েছে?

—তুমি নিশ্চিত যে, জোন্স ন্যান্সিকে নিয়ে এসেছে?

—হ্যাঁ।

সঙ্গে সঙ্গে ভাবি, লুসিয়া ন্যান্সিকে মেরে ফেলার ধান্দায় আছে। সুতরাং

ও' ক্যাসাহাটিতে ফোন করে দেওয়া দরকার যে, জোন্স এসেছে তাতে ওর কাজ অনেকটা সহজ হবে। আর এও বলতে হবে, লুসিয়া ন্যান্সির রূপ ধরে রয়েছে।

তারপর বলি, লুসিয়া আর ন্যান্সি সত্যি যমজ বোন?

—শুধু যমজ বললে ভুল হবে! দেখলে মনে হবে, ওরা যেন একই ছাঁচে গড়া। আমিও লুসিয়াকে দেখে ধরতে পারিনি।

তারপর গ্লোরিয়া একটু থেমে আবার বলে, ডিয়াজকে আমি জোন্সের সঙ্গে কথা বলতে শুনেছি। আমি ওদের পথে বাধার সৃষ্টি হতে পারি। কারণ আমি হ্যামেলের প্রথমা স্ত্রী। আমি সেই সুবাদে ওদের প্রাপ্য টাকার একটা অংশ চাইতে পারি।

—তারপর।

—ডিয়াজ জোন্স বললো, আমার মাথায় আঘাত করে সমুদ্রে ফেলে দিতে, বলে গ্লোরিয়া হাসে। সে আমাকে মেরে ফেলার বদলে আমিই তাকে চিরতরের জন্য স্তব্ধ করে দিলাম।

—ঠিক বুঝলাম না।

—আমি জানি, ডিয়াজ দুটো কালো ছেলেকে খুন করেছে। তারপর আমি অয়কে দেখতে পেয়ে তার হাতে ডিয়াজের পিস্তলটা তুলে দিলাম। কারণ সে তাতে হিংসাপরায়ণ হবে। আর সে একটা পিস্তল খুঁজছিল। আর সেই ছেলেটা সত্যি একটা কাজের কাজ করে বসলো।

—তাহলে তুমিই······আমি বলি।

—হ্যাঁ। যাক্। শোন, আমি ফ্রিসকো চলে যাচ্ছি। আর আমি জানি, ডিয়াজ তার স্মাগলিং এর টাকা পয়সা কোথায় রাখে।

—জানতে পারলে?

—কত পেলে?

—সেটা তোমার জানার কোন দরকার নেই।

—তাহলে তো তোমার অর্থের সমাধান হয়েই গেল।

—তাহলে তুমি আমার কাছে এসেছো কেন?

—কারণ ওরা এবার ন্যান্সিকে খুন করার চেষ্টায় আছে।

—কারণ ন্যান্সিকে দিয়ে চেক সেই করিয়ে নেবার পর কেউ কখনো আসল লোককে জীবিত রাখে। তাতে ঝামেলা বাড়বে বইতো কমবে না!

—চেক সেই হয়ে গেলেই ন্যান্সির মৃতদেহ সমুদ্রে পড়ে থাকতে দেখা যাবে। যেমন আমার হবার কথা ছিল।

আমি গ্লোরিয়ার কথা বেশ মনোযোগ দিয়ে শুনি আর ভাবি, সে ডিয়াজের গোপন স্থান থেকে কত টাকা পেয়েছে?

তারপর বলি, আমরা দু'জন এক সঙ্গে কাজ করলে কেমন হয় ? আর আমরা একথা বলার কারণ ছিল। বার্থা চলে গেছে, আর সেদিন রাতের গ্লোরিয়ার উষ্ণ সান্নিধ্যের কথা কিছুতেই ভুলতে পারছি না।

—ও কথা ছাড়ো, এখন ভাবো ন্যান্সির কথা। চেক সেই হবার পরই সে নিহত হবে, আর তুমি কী তার মৃত্যু চাও ?

—না, তা চাই না, কিন্তু বেবী, ডিয়াজের ওখানে থেকে কত টাকা হাতালে ?

—তুমি অর্থ ছাড়া কিছুই ভাবতে পারো না দেখছি !

—না, তা নয় !

—তবে অন্য ভাবনাও আছে ?

—তুমি এবং তোমার সঙ্গে আমি শুতে চাই।

—এতদিন আমি নিজেকে খুব চালাক ভাবতাম। এখন দেখছি তোমার 'ওস্কার' পুরস্কার দেওয়া উচিত।

কথা শেষ করে গ্লোরিয়া দরজার দিকে এগিয়ে যায় এবং একটু পরে তার গাড়ির শব্দ শুনলাম।

গ্লোরিয়া চলে যেতে ভাবি, এখনো পুরস্কারটা আমার পাওয়া হলো না। এইভাবে আরো কিছুক্ষণ বসে রইলাম। তারপর ন্যান্সির কথা ভাবতে থাকি।

হ্যাঁ, ন্যান্সির জন্য আমার কিছু করা দরকার। তবে আমি পুলিশের কাছে যাবো না। আমার কোল্ডওয়েলের কথা মনে পড়ে। সে এই কেসটা হ্যান্ডেল করছে এবং আমাকে নিরাপদে রাখতে পারে। আর. এফ. বি. আই. সর্বদা ইনফরমারদের আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করে।

তারপর আমি কোল্ডওয়েলের বাড়ির ফোন নম্বর খুঁজে পেয়ে তাকে ডায়াল করি। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর কোল্ডওয়েল লাইনে এলো।

—কোল্ডওয়েল, আমি বার্ট এন্ডারসন কথা বলছি। তুমি এখনই আমার কাছে একবার এসো। ভীষণ জরুরী ব্যাপার।

—মাফ করো। এখন আমার শুতে যাওয়া দরকার। আর কী জরুরী ব্যাপার।

—ফোনে তা বলা যাবে না। আশা করি তুমি আসবে।

আমি রিসিভার নামিয়ে রেখে ঘড়ি দেখতে থাকি। সময় এখন রাত বারোটা পঁয়তাল্লিশ।

তারপর মিনিট কুড়ির মধ্যে কোল্ডওয়েল আমার দরজায় এসে বেল বাজায়। কারণ ওই হবে। আমি দরজা খুলে দিই।

—ব্যাপার কী ? আমি দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গে কোল্ডওয়েল আমার দিকে

প্রশ্নটা এড়িয়ে যাবে।

হুট করে কোল্ডওয়েলের প্রশ্নের জবাব না দিয়ে ভেবে চিন্তে বলি, তোমার আমি একটা ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ কথা বলবো।

—প্রোফারির প্রসঙ্গে।

—সে কোথায় আছে তাও এখন জানি।

—জানো ? কোল্ডওয়েল উত্তেজিত। বলো ?

—আমি বলতে পারি এক শর্তে।

—আমি কোন বিপদে পড়লে তা থেকে আমায় উদ্ধার করতে হবে।

—তুমি তো সর্বদাই নিরাপদে আছো। আগে বলো, সে কোথায় আছে ? কোল্ডওয়েলের যেন নিশ্বাস পড়ছে না।

তারপর কোল্ডওয়েলের দিকে একটা চেয়ার এগিয়ে দিয়ে নিজেও একটা চেয়ার টেনে ওর মুখোমুখি বসি। এরপর আমি তাকে পুরো ঘটনাটা বললাম এবং এও জানালাম, আমি এসব থেকে বাইরে থাকতে চাই। তবে ও আমার কথা বোধহয় পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারছে না। তবুও সে বললো, আমার নিরাপত্তার ব্যবস্থা করবে। এতে আমি তার উপর বিশ্বাস রাখতে পারছি।

এরপর আমি ঘটনা শেষ করতে কোল্ডওয়েল আমার দিকে তাকিয়ে বললো, তোমার কথা সব সত্যি তো ?

—হ্যাঁ। প্রোফারি এবং তার স্ত্রী লুসিয়া এখন হ্যামেলের বাড়িতে রয়েছে। ন্যান্সিও ওদের সঙ্গে আছে। আর চেক সই হয়ে গেলেই ওরা ন্যান্সিকে খতম করে এখান থেকে সরে পড়বে।

আমি আবার বলি, তার উপর ওদের পালানোর তোফা ব্যবস্থা আছে।

—হ্যামেলের ইয়াট ওরা ব্যবহার করবে, আর কিউবা এখান থেকে খুব একটা দূরেও নয় এবং সেখান থেকে ওরা ডলার ইতালিতে পাচার করবে।

তারপর কোল্ডওয়েল ভেবে বলে, আমি সব ব্যবস্থা করছি। চিন্তার কিছু নেই, এবং এও বলছি, তুমি নিরাপদে আছো এবং থাকবেও। আর এ ব্যাপারে আমি টেলারের সঙ্গে কথা বলছি। আর ঘটনা ঘটানোর আগে কিছু লোক নিয়ে হ্যামেলের বাড়ি ঘিরে রাখতে হবে।

—তোমার হাতে অনেক সময় আছে, কিন্তু যা করবে খুব তাড়াতাড়ি। বিষয় সম্পত্তি ঠিক হবার পরেই ওরা পালাবে।

—আমরা কাল থেকে নেমে পড়ছি।

তুমি ওদের উপর তীক্ষ্ন নজর রাখো। ওরা সাংঘাতিক। তোমাকে গুলি পর্যন্ত চালাতে পারে।

তারপর আমার শুভেচ্ছা জানিয়ে কোল্ডওয়েল চলে যেতে আমি গ্যারেজ থেকে গাড়ীটা বার করে প্যারাডাইস ল্যারগোতে যেলাম। ন্যান্সির চিন্তাই

আমার একাজ করালো।

সঙ্গে সঙ্গে আমার মাথায় একটা চিন্তা এলো। ভাবি, যখন ন্যান্‌সিকে বাঁচাতে পারবো এবং সে একরাশ সবুজ নোটের মালিক হবে, তখন তাকে জানাবো, কীভাবে আমি তার জীবন রক্ষা করেছি। আর সেই সঙ্গে আমার পুরস্কারের কথাটা বলতেও ভুলবো না।

এতে আমার ধারণা, তখন ন্যান্‌সি আমায় 'না' বলতে পারবে না। আবার সবুজ নোটের চিন্তায় বিভোর হয়ে গেলাম। ডলার! মাই সুইট ডলার! সোনার হরিণ।

নবম পরিচ্ছেদ

আমি গাছে চড়ে হ্যামেলের বাড়ির চারদিকে নজর রাখছি। পর্দার আড়ালে যে ঘরটা আছে সে ঘরে আলো জ্বলছে। এবং সেই আলোতে প্রোফারি এবং জোন্সের ছায়া দেখলাম। ওরা এখন আমার কাছে বিশেষভাবে পরিচিত। আর ওরা ছাড়া বাড়িটা যেন অন্ধকারের মাঝে ডুবে রয়েছে। তারপর শোবার ঘরের আলো জ্বলে উঠতে আমি কটেজে ফিরে এলাম।

যখন আমি গাছে ছিলাম তখন একটা কথা ভাবছিলাম। ন্যান্সিকে উদ্ধার করে কত পাবো। মন্দ হবে না! কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আর একটা চিন্তা আমায় নিরাশ করলো, কারণ ইতিমধ্যে একবার আমার লোভী থাবা ন্যান্সির উদ্দেশ্যে বাড়িয়ে পঞ্চাশ হাজার ডলার নিয়েছি। সুতরাং দ্বিতীয়বার কিছু করতে গেলে সে হয়তো ইতস্তত করবে।

তারপর ভাবি, কথাটা ন্যান্সির কাছে অন্যভাবে উত্থাপন করতে হবে। তাহলে হয়তো আমার পকেটে আরো ডলার আসবে!

এরপর কটেজে ফিরে চেয়ারে বসে গরুর স্যান্ডউইচে কামড় বসালাম। এগুলো জার্ভিস রেখে গেছে। খেতে খেতে ডলার পাবার জন্য বেশ কিছুক্ষণ মাথা খাটিয়ে গেলাম।

প্রায় রাত দুটো পনেরো। তখন যেন প্রশ্নের সঠিক জবাবটা খুঁজে পেলাম। তারপর নিজেই নিজেকে অভিনন্দন জানালাম এবং শুতে গেলাম।

সূর্যের রশ্মি চোখে পড়তে ঘুম ভাঙলো। তখন সাড়ে সাতটা। তারপর অনিচ্ছা সত্ত্বেও বিছানা ছেড়ে উঠে দাড়ি কামিয়ে চান করে নিলাম। এরপর পোশাক পরে নিলাম। ব্রেকফাস্ট তৈরি।

সজাগ এবং সতর্ক প্রহরীর মত মুখ করে জার্ভিসকে জিজ্ঞেস করলাম, বুড়ো কেমন আছে?

—শান্তভাবে ঘুমিয়ে পড়েছে। আমি সারাক্ষণ তার কাছে কাছে ছিলাম।

—হ্যাঁ, তাই করো, বলে আমি খাবার ধ্বংস করতে থাকি।

জার্ভিস আমার পাশে বসে তার বন্ধু শিম্বের কথা বলছে। তা আমি মাথা নাড়ছি। কিন্তু তাতে আমার খাওয়ায় কোনো বিঘ্ন ঘটছে না।

—আমি বুঝতে পারছি না, যাদের অর্থ আছে তারা কিপটে লোকদের এভাবে তাড়ায় কেন?

—এই হয়, বলে আমি কাঁধটা ঝাঁকিয়ে জার্ভিসকে সান্ত্বনা দিই।

তারপর জার্ভিস গ্রে নিয়ে চলে যেতে আমি আবার সেই গাছটাই গিয়ে উঠি এবং নির্দিষ্ট বাড়ির চারদিকে দৃষ্টি বোলাতে থাকি।

জোন্স সদর দরজায় দাঁড়িয়ে আছে। তার হাতে জ্বলন্ত সিগারেট। পরনে কাউবয় প্যান্ট এবং বেল্টে একটা পিস্তল ঝুলছে। আর ভাবি, কোল্ডওয়েল তার লোক নিয়ে বাড়ি ঘিরে ফেললে একটা আতঙ্কের সৃষ্টি হবে।

এর কিছুক্ষণ পরে জোন্স দরজাটা বন্ধ করে ভেতরে চলে যায়। তারপর আর কিছুই করার নেই। আর ভাবি, ন্যান্সির কী অবস্থা? ওই বুড়োর মত কী একরাশ হতাশার মাঝে ডুবে রয়েছে?

এরপর সাড়ে এগারোটার সময় কটেজে ফিরে এলাম। এখন কার্লের আমায় রিং করার কথা। তারপর সে এসে পড়ায় আমি আর কাল বিলম্ব না করে পামারের অফিসের উদ্দেশ্যে রওনা দিই।

এক সময় আমি পামারের অফিসে হাজির হই। তার সেক্রেটারী মেয়েটি দেখতে বেশ সুন্দরী। লাল চুল, এবং সে আমার দিকে এমনভাবে তাকালো যেন আমি ওর স্বপ্ন।

—মিঃ পামারের সঙ্গে দেখা করতে এসেছি, দুষ্টুমির হাসি হেসে বললাম। আর আমার নাম বার্ট এন্ডারসন।

—তার সঙ্গে কী আপনার অ্যাপয়েন্টমেন্ট করা আছে?

—না। তবে তার সঙ্গে আমার অ্যাপয়েন্টমেন্ট করা লাগে না।

তারপর মেয়েটি কিছুটা ইতস্তত করে ডেস্ক ছেড়ে ভেতরের অফিসে যায় এবং একটু পরে এসে জানায়, মিঃ পামার আপনার সঙ্গে দেখা করবেন।

তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি পামারের অফিসে ঢুকি। পামারের হাতে জ্বলন্ত সিগার। সে আমার দিকে তাকিয়ে বললো, কী ব্যাপার?

—আপনার ক্লায়েন্ট ন্যান্সি হ্যামেল, তাই না?

—নিশ্চয়ই। তার কী কিছু হয়েছে? তারপর পামার অধীরভাবে ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলে। আমার একটা জরুরী লাঞ্চের ব্যাপার আছে।

—এটা কিন্তু তার চেয়েও জরুরী ব্যাপার! আপনি কী জানেন, মিসেস ন্যান্সি হ্যামেলের একজন যমজ বোন আছে?

—না, না, তা হতে পারে না।

—আছে এবং তার সেই যমজ বোনের নাম লুসিয়া প্রোফারি। সে একজন ইতালির সন্ত্রাসবাদী এবং পুলিশ তাকে দুটো খুনের অপরাধে খুঁজছে। এবং তার স্বামী অ্যান্ডো প্রোফারিও সন্ত্রাসবাদী। আর ইতালির রেড ব্রিগেডের অন্যতম নেতা এবং তাকেও তিনটে খুনের দায়ে পুলিশ খুঁজে বেড়াচ্ছে। আর আমার কাছে প্রমাণ রয়েছে সেই রাস হ্যামেলকে হত্যা করেছে।

পামার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে বার্ধার মত বলে, আপনি কী

ম্যাতাল ? আর আপনি কোন সাহসে এসব কথা বলছেন !

—এফ. বি. আইতে সব তথ্য আছে এবং তারা আজ রাত থেকে অ্যাকশন নেবে।

—এ আবার কী সব শুনছি। বলে পামার চেয়ার ছেড়ে উঠে পিকেকর রুমাল দিয়ে বার বার মুখ মুছতে থাকে।

—এই হলো সমস্ত ঘটনা। এটা প্রেসে গেলে দারুণ একটা খবর হয়ে বেরুবে ! তবে আমি চাই না হ্যামেলের বইয়ের ব্যাপারে কোন ক্ষতি হোক। আর এ ব্যাপারে আপনি তো দেখাশুনো করছেন ?

আর মিসেস্ ন্যান্সি হ্যামেল চেকগুলো সই হলেই মার্ডার হবে।

এ কথা শুনে পামার বসে পড়ে এবং চিন্তা করতে থাকে। তারপর বলে, আজ সকালে সেই ভদ্রমহিলা আমায় ফোন করেছে। বলেছে, সে অর্কোস্টিমায় যেতে পারছে না।

—তাহলেই বুঝতে পারছেন, সে কেন এ কথা বলছে ! যাতে সে লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকতে পারে।

—উঃ, কোথাকার জল গিয়ে কোথায় দাঁড়ালো !

—আমি এ ব্যাপারে আপনাকে একটা কথা বলতে পারি।

—বলুন, কি বলবেন।

—আপনি আমায় মিসেস্ হ্যামেলের প্রতিনিধি হিসেবে নিযুক্ত করুন।

—মিসেস্ হ্যামেলের ?

—হ্যাঁ।

—ঠিক ব্যাপারটা বুঝতে পারছি না।

—প্রতিনিধির কাজ করলে প্রোফারি আর নাক গলাতে পারবে না। এখন তারা এ কাজটা করছে। আর এতে মিসেস্ হ্যামেলকে প্রেসের হাত থেকে বাঁচানো যাবে এবং তাকে উদ্ধারের আগে কিছুতেই তাকে প্রেসের হাতে তুলে দেওয়া যায় না।

তারপর বলি, আপনি মিসেস্ হ্যামেলের প্রতিনিধি। যখন ওবাড়িতে গুলি ছোড়া হবে তখন কী আপনি উপস্থিত থাকবেন ?

এফ. বি. আই. প্রোফারি এবং তার স্ত্রীকে হত্যা করার মতলবে আছে। ওটা একটা রণক্ষেত্রে পরিণত হবে, তাই আপনি ওখানে থাকতে চান না আমায় ওখানে রাখতে চান ? আমি আপনার এবং মিসেস্ হ্যামেলের হয়ে কাজ করে যেতে চাই।

—হ্যাঁ, তা করতে পারেন। তবে ওখানে আপনি কী করতে চান ?

—ওটা আমার কাজ। আমার উপরেই ছেড়ে দিন। তবে এটা আপনাকে বলতে পারি, মিসেস্ হ্যামেল নিরাপদে থাকবেন এবং প্রোফারির কাছ থেকেও

তাঁকে দূরে সরিয়ে রাখবো।

তা আপনি কীভাবে করবেন এবং ন্যারংগো থেকেই বা কীভাবে বেরুবেন?

হ্যালিকপ্টারের সাহায্যে, জানতাম এ কথাটা উঠবে। তাই সঙ্গে সঙ্গে জবাবটা দিলাম। আর আমার এক বন্ধুর হ্যালিকপ্টার আছে। ওখানের অবস্থা শান্ত হলে মিঃ হ্যামেলের লনে হ্যালিকপ্টার নামবে, এবং সেখান থেকে মিসেস্ হ্যামেলকে তুলে নেবো। আর আপনি 'স্প্যানিস বে হোটেলে' একটা সিট বুক করে রাখুন। যাতে তিনি বিশ্রাম নিতে পারেন। এসব হোটেলে কোন বাজে লোক ঢুকতে পারে না।

সহসা পামারের চোখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। সত্যি, অপূর্ব আইডিয়া! আর ওখানে সব সময়ের জন্য ডাক্তার রয়েছে। মিসেস্ হ্যামেলের তাকে দরকার হতে পারে। আর মিঃ এন্ডারসন, আপনি হ্যালিকপ্টারের ব্যবস্থা করুন। আমি এখন যাচ্ছি।

কিন্তু তার আগে যে দুটো ব্যবস্থা করতে হবে।

বলুন।

আপনাকে আমায় লিখে দিতে হবে যে, আমি মিসেস্ ন্যান্সি হ্যামেলের প্রতিনিধি এবং তার হয়ে কাজ করবো। তাহলে এফ. বি. আই. আমায় আর কোনরকম ঝামেলায় ফেলতে পারবে না।

তারপর পামার আমার দিকে তাকিয়ে বলে, আর দ্বিতীয়টা?

আর হেলিকপ্টার এবং পাইলটের জন্য দু'হাজার ডলার চাইছি।

বড্ড বেশী বাচ্ছে।

এটা হলো গিয়ে একটা সাংঘাতিক ব্যাপার। আমাদের মধ্যে যে কেউ মরে যেতে পারে। আর টাকাটা তো আসবে হ্যামেলের স্টেট থেকে। তার জন্য আপনার এত ভাবনা কিসের!

তা অবশ্য ঠিক।

ইতিমধ্যে সেক্রেটারী মেয়েটি চিঠিটা টাইপ করে আনতে পামার তাকে বলে, মিস্ হিল, মিঃ এন্ডারসনকে দু'হাজার ডলার ক্যাস দাও। তারপর পামার আমায় অভিনন্দন জানিয়ে বলে, কখন থেকে অপারেশন শুরু হবে?

কাল রাত থেকে।

আমি হোটেলে থাকবো, বলে পামার চলে যায়।

ঠিক আছে।

তারপর হিল ভিতরে চলে যেতে আমি অপেক্ষা করতে থাকি এবং একটু পরে টাকাটা এনে দিতে ব্যাগে পুরি। আর ওর দিকে তাকিয়ে বলি, তোমার চোখ দুটো ভারী সুন্দর।

এ কথা আমায় প্রায়ই শুনতে হয়, বলেই হিল চেয়ারে বসে। এখন আমি

যায় মিঃ এন্ডারসন। বলে সে টাইপ করতে শুরু করে দেয়।

তারপর আমি ম্যাসার চালিয়ে বেরিয়ে পড়লাম।

এখন সময় রাত তিনটে। আমি এখন ন্যানসির প্রতিনিধি। আমি অনায়াসে হ্যামেলের বাড়িতে ঢুকতে পারি। আর ও বাড়ির কোথায় কি আছে, তা আমার মোটামুটি জানা।

যাক্, এখন মেয়রের অফিসে যে বৈঠক বসেছে সেখানে আমি উপস্থিত। মেয়র হ্যাডলী, পুলিশ প্রধান টেবেল, সারজেন্ট হেস, কোল্ডওয়েল, স্টোনহ্যাম, এবং এফ. বি. আই-র ডাকসন উপস্থিত।

কোল্ডওয়েল চেয়ার ছেড়ে উঠে ইনফরমারের উদ্দেশ্যে যা জানতে পেরেছে, তা সবাইকে জানালো এবং আমার এখানে উপস্থিত সম্বন্ধে সে বললো, কীভাবে মিসেস্ হ্যামেলকে প্রোফারির হাত থেকে উদ্ধার করা যায় তার পরিকল্পনায় আছে।

আমি ইতিমধ্যে হ্যামেলের বাড়ির একটা নক্সা ছেকেছি। তাতে দেখিয়েছি, ঐ বাড়ির গাছের কাছ থেকে বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণ করা হয় এবং তা জানা সম্ভব হয়েছে মিঃ হারচেন হিমারের দেহরক্ষী হবার সুবাদে। আর গাছ থেকে দৃষ্টি রাখার ফলে আমি জানি কোথায় মিসেস্ ন্যানসি হ্যামেল রয়েছেন।

তারপর আরো কিছু কথাবার্তার পর ঠিক হলো ল্যারগোর ইলেকট্রিসিটি বন্ধ করে দেওয়া হবে। পুলিশরা ওখানে পাহারার রয়েছে। আর সময় মত এফ. বি. আই-র এজেন্টরা এবং দশ জন আর্মড পুলিশ বাড়িতে ঢুকে পড়বে।

এরপর আমি তাদের জানাই, নিক হার্ডির হ্যালিকপ্টারে করে আমি মিসেস্ হ্যামেলকে উদ্ধার করে স্প্যানিস বে হোটেলে নিয়ে যাবো। ওখানে মিঃ পামার তার সেবা শুশ্রূষার জন্য ডাক্তার নিয়ে অপেক্ষা করে থাকবেন।

আমার কথায় কেউ কোন প্রতিবাদ করলো না। তারপর মিটিং ভেঙে যায়। আর মিটিং যখন শেষ হলো তখন সাড়ে ন'টা বাজে।

আমি এখান থেকে বেরিয়ে নিক হার্ডির অফিসে গেলাম এবং তার কাজের জন্য তাকে পাঁচশো ডলার অগ্রিম দিলাম। এরপর আমার হাতে এখনো পনেরোশো ডলার রইলো। আর ভাবি, আক্রমণে নামার আগে হাতে এখনো অনেক সময় আছে।

আমি অ্যাপার্টমেন্টে ফিরে এসে ভাবি, বার্থাকে ডাকবো কী না! তারপর বার্থাকে ডায়াল করি।

এরপর বার্থা লাইনে আসতে বলি, মিসেস্ ফিক্ কথা বলছেন?

ও তুমি?

আর কে হবে! আমি খুব একা। বিয়েটা হয়ে গেছে?

সামনের সপ্তাহে। আর বার্ট, বলি শোন। আগেই বলেছি, আমরা অনেকটা এগিয়ে গেছি! যা বলছি তা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো?

যখন বিয়েটা করবে তখন দেখা যাবে। শোন বেবী, আমার পকেটে ডলারে ভর্তি। স্প্যানিশ বে হোটেলে আমার সঙ্গে ডিনারে যাবে নাকি?

ডলার কোথা থেকে পেলে? বার্থা জানতে চাইল।

বাজে কথা রেখে তুমি আমার সঙ্গে যাবে কী না বলো!

সম্ভবত নয়।

আমার বিয়ের কথা হয়ে গেছে।

তুমি যেতে না চাইলে অনেক মেয়ে পাওয়া যাবে।

ঠিক আছে, এই শেষ বার।

তাহলে আমরা ওখানে ঠিক কাঁটায় কাঁটায় সাড়ে ন'টায় খেতে যাবো।

সাড়ে ন'টায় খাওয়ার কথা হলে এখন যাবো কেন!

তোমার যা অভিরুচি, বলে আমি ফোনটা নামিয়ে রাখি।

তারপর আমি রাত দেড়টায় বার্থাকে ওর অ্যাপার্টমেণ্টে ফিরিয়ে দিই। রাতটা দারুণ কেটেছে। খাওয়ার সময় ছাড়া আমরা দারুণ ফুর্তি করেছি। আর খেয়েছিও সব ভালো ভালো খাবার। এবং আমরা একসঙ্গে নেচেছি।

বার্ট, এটাকে আমি চাই না যে, এটা শেষ হয়ে যাক, বার্থা যাবার আগে আমায় জড়িয়ে ধরে বলেছে তোমাকে ছাড়া আমার চলবে না।

ওকেই বিয়ে করে ফেলো, আমি বার্থাকে আদর করে বলেছি। তাহলে তোমার জীবনে নিরপত্তা বাড়বে। সেই সঙ্গে তোমার জীবনটাও সুখে কাটবে।

তুমি একটা অপদার্থ। আমার হাতের উপর থেকে হাত সরিয়ে নিতে নিতে বলেছে।

বার্থাকে একা রেখে আমি ম্যাসারে করে প্যারাডাইস ল্যারগোর দিকে এগিয়ে যাই। গেটের কাছে এসে দেখি, দু'জন পুলিশের সঙ্গে ও'ফ্লাগহার্টি রয়েছে। সে আমার দিকে এগিয়ে এসে কিছুটা উত্তেজনার সঙ্গে বলে, মনে হয় আজ রাতে কিছু ঘটবে।

তা তুমি বলতে পারো।

ঐ দু'জন পুলিশ আমার দিকে উঁকি ঝুঁকি মারতে থাকে। ও'ফ্লাগহার্টি তাতে ভ্রূক্ষেপ না করে পুলটা তুলে দেয়।

মিটিং-এ ঠিক হয়েছিল, কার্লকে সচেতন করে দেওয়া হবে। সে দরজা খুলে দিতে আমি ভেতরে প্রবেশ করি এবং তাকে খুব উত্তেজিত দেখি।

তারপর আমরা দ্রুত একসঙ্গে কেটে গেলাম। দেখলাম, জার্ভিস পানীয় আর স্যান্ডউইচ নিয়ে অপেক্ষা করছে। এরপর ওদের বললাম, কী ঘটতে চলেছে।

বলি, এখানে দারুণ গণ্ডগোল হবে। আমার মনে হয়, বুড়োকে ঘুমের ওষুধ খাইয়ে ঘুমিয়ে রাখা ভালো।

জার্ভিস তা শুনে বললো, সে ব্যবস্থা সে করতে পারবে।

আমি ঘড়ির দিকে তাকাই। এর মাঝে দু'ঘণ্টা পার হয়ে গেছে। স্যান্ডউইচ আর পানীয় শেষ করে গাছের দিকে এগিয়ে গেলাম।

এখন পর্যন্ত ভালোই কাটছে, কিন্তু আমি যখন হ্যালিকপ্টারে করে ন্যান্সিকে আনতে যাবো তখন সে দাঁত কড়মড় করে উঠবে নাতো? ভাবি, করলে তখন আমার অবস্থা কী হবে?

আরো ভাবি, ন্যান্সি আমায় চিনতে পেরে যদি কোল্ডওয়েলকে জানিয়ে দেয়? তবে একথা ঠিক, এত সব ভিড়ের মাঝে সে আমায় হুট করে চিনতে পারবে না। আর দেখেছেও তো মাত্র একদিন। তাও কয়েক মিনিটের জন্য।

তারপর আমি গাছে চড়ে দেখতে পাই, কিছু কালো ছায়া দেখতে পাচ্ছি, যারা হলো গিয়ে এফ. বি. আই এবং পুলিশেরা। আর বাড়িটা যেন একরাশ অন্ধকারে ঢেকে রয়েছে।

ভাবি, ওরা যদি একটা গার্ড রাখে তাহলে জোন্স অথবা প্রোফারির অবশ্য সন্দেহ হওয়া উচিত। আর ওরা নিশ্চয় বিদ্যুৎচালিত গেট এবং গ্যারেজ সম্বন্ধে হুঁশিয়ার হয়ে আছে।

আমি অন্ধকারের মাঝে কোল্ডওয়েলের লম্বা চেহারাটা চিনতে পারি এবং গাছ থেকে নেমে এসে তাকে বলি, সব অন্ধকারে যেন হারিয়ে গেছে। ওদের কোন সাড়া শব্দ নেই।

কোল্ডওয়েল আমার দিকে তাকালো। তারপর তার কাছে দাঁড়ানো লোকদের নির্দেশ দিল।

কিছু লোক দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে। ইতিমধ্যে হ্যালিকপ্টারের মৃদু আওয়াজ শুনতে পেলাম।

আমার নিককে বলা আছে সে উপরে থাকবে এবং আমি টর্চের আলো ফেললে তবেই সে হ্যালিকপ্টার নিচে নামাবে।

সহসা কোল্ডওয়েল বলে ওঠে, কারেন্ট অফ!

এতক্ষণ আকাশও অন্ধকার ছিল। এই মাত্র চাঁদ কালো মেঘের আড়াল থেকে বেরিয়ে এলো। একমাত্র গেটের যা কিছু আলো।

হঠাৎ দেখি, একটা গাড়ি রাস্তা দিয়ে এলো। তাতে চারজন পুলিশ রয়েছে।

তারা হ্যায়েজের বাড়ির দিকে এগিয়ে যায়। ওরা প্রায় একশো গজ অতিক্রম করে ফাঁকা লনটায় এসে দাঁড়ায়। এরপর তারা কাঁটা ঝোপঝাড়ের মধ্যে গিয়ে আত্মগোপন করে। ফলে লন আবার যেন আগের মত ফাঁকা হয়ে উঠলো।

কিন্তু গাড়ির হেডলাইট দেখে আমি অবাক। এটা কোন সাধারণ হেড-লাইট নয়। এটা গাড়িতে বিশেষ কাজের জন্য লাগানো হয়েছে।

কোল্ডওয়েল একটা চোঙা নিয়ে বলেছে, প্রোফারি মাথায় উপর হাত রেখে বেরিয়ে এসো! এখন তার গলা সাংঘাতিক শোনাচ্ছে, যা আকাশ বাতাস মুখরিত করে তুলেছে।

কিন্তু কিছুই ঘটলো না। শুধু কোল্ডওয়েলের আওয়াজ বাড়িতে আঘাত করে যেন আবার ফিরে এলো।

কোল্ডওয়েল আবার বলে চলে এবং তার লোকেরা এবার কাঁটা গাছের আড়ালে শুয়ে পড়েছে। কিন্তু এবার ও কিছু ঘটলো না।

কোল্ডওয়েল থাকে। এবার হ্যালিকপ্টারের শব্দ স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে এবং তা থেকে আলোর রশ্মি। আমি ভাবি, এটা সিনেমা হলে নিক কতটা আনন্দ পেত।

তারপরই বিস্ময়, হঠাৎ জানলা দিয়ে একটা গ্যাস বোমা বেরিয়ে এলো এবং সেটা লনে পড়ে চারদিকে গ্যাস ছড়িয়ে পড়তে লাগলো।

এরপর জোন্সকে প্রথমে দেখা গেল। সে এখন দরজার কাছে দাঁড়িয়ে। তার হাতে উদ্যত বন্দুক, সহসা সে একটা ছায়ার দিকে যেতে থাকে।

হঠাৎ বন্দুক গর্জে উঠতে জোন্স আগের জায়গায় ফিরে যেতে চাইলো, কিন্তু পারলো না। সে মাটিতে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে। একটা গুলি এসে তাকে চিরতরের জন্য নিস্তব্ধ করে দিয়েছে।

ভাবি, একটা গেছে, আরো দুটো রয়েছে, আমি তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে এসব লক্ষ্য করতে থাকি।

তারপর আবার কোল্ডওয়েলের গলা শোনা যায়, প্রোফারি হাত মাথার উপরে রেখে বেরিয়ে এসো।

গ্যাস শেলের ধোঁয়া অনেকটা কমে এসেছে। আমি ন্যানসির কথা ভাবি। তারপর ভাবি, আর হয়তো গ্যাস বোমা ছুঁড়বে না।

হঠাৎ বাড়ির দিক থেকে একটা গুলির শব্দ। সঙ্গে সঙ্গে একজন পুলিশের আর্তনাদ শোনা গেল। আর একজন পুলিশ লাফ দিয়ে উঠলো।

এবার পুলিশ এবং এজেন্টরা ঠিক করলো গুলি ছোড়ার জায়গা লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়বে। আর ঠিক তখনই প্রোফারিকে দেখা গেল। তার দু'হাতে দুটো বন্দুক। সে একটু ঝুঁকে রয়েছে, তার সাদা সার্টে রক্তের দাগ।

হঠাৎ একটা গুলি এসে প্রোফারিকে বিদ্ধ করলো। সঙ্গে সঙ্গে সে টলে

পড়ে যায়।

তাতে যেন আমার ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়লো। এবার ভাবি, দুটো গেল
রইলো একটা।

—লুসিয়া বেরিয়ে এসো! হঠাৎ কোল্ডওয়েল গর্জে ওঠে, বলে তোমার
হাত মাথার উপরে রাখো।

এর কিছুক্ষণ পরে একটা তীক্ষ্ণ চিৎকার শুনতে পেলাম। তারপরই
লুসিয়াকে ঝলসানো অবস্থায় বেরিয়ে আসতে দেখলাম, সে যেন বন্দুকের ভয়ে
ভীত।

আমি লুসিয়াকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। তার পরণে কালো স্কার্ট এবং জামার
রং সাদা। তারপর দরজার কাছে এসে বলে, আমায় মেরো না! আর তার
হাত দুটো যেন ক্রোধ এবং হিংসায় দুলছে। তার হাতে যেন কী ধরা রয়েছে।
তারপর সে দশ পাও এগোয়নি তখনই শেষ হয়ে যায়।

হঠাৎ দুটো আলো জ্বলে উঠলো, যা দেখে একটু থমকে যাই। তারপর
লুসিয়ার মৃতদেহ দেখে একটা কথাই মনে হয়, সে যেন স্বেচ্ছায় মৃত্যু বরণ
করলো। যেমন জাপানীরা করে থাকে। তার হাতে দুটো বোমা ছিল।

আমি এসব দেখে যেন অসুস্থ বোধ করছি। লুসিয়ার রক্ত, মাংস চারদিকে
ছড়িয়ে পড়ে একটা বীভৎস দৃশ্য ফুটে উঠেছে।

সব শেষ। সুতরাং আমি রাস্তার কাছে দৌড়ে গিয়ে টর্চের আলো জেলে
নিককে দেখিয়ে নিচে নামাতে বলি। সে মাথার উপর ঘুরপাক খাচ্ছে। তারপর
আমি গাড়ির দিকে এগিয়ে যাই।

ওদিকে এজেন্টরা আর পুলিশেরা চার দিক থেকে লনটা ঘিরে রয়েছে। কেউ
কেউ আহত পুলিশদের সেবা শুশ্রূষা করছে, কেউ কেউ আবার ফ্রোফাির এবং
লুসিয়ার দেহ অবশিষ্ট খুঁজতে ব্যস্ত। আর কোল্ডওয়েল লুসিয়ার দিকে জয়ের সঙ্গে
তাকিয়ে আছে।

আমি থামি না। এখান থেকে দৌড়ে বাড়ির দিকে যাই। তারপর বড়
বারান্দাটা অতিক্রম করে বন্ধ দরজার কাছে এসে দাঁড়াই।

গ্যাস বোমার ধোঁয়া এখানে খুবই কম। সামান্য চোখ জ্বালা করছে। আর
বিদ্যুৎচালিত গেটের যদিও কারেন্ট অফ করা আছে, তবু বেশ সাবধানের সঙ্গে
পার হলাম।

আমি খোলা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছি। তারপর আমার দৃষ্টি যায়
আলোয় ঝলমলে একটা শোবার ঘরের দিকে। সেখানে একজন ভদ্রমহিলা বসে
আছে। ঘরটায় দুটো বিছানা রয়েছে এবং বিছানার মুখ আমার দিকে
ফেরানো।

সে বিছানায় বসে আছে। তার মুখ হাত দিয়ে ঢাকা। সে হচ্ছে ন্যানসি

হ্যামেল। সে ভয়ে কাঁপছে এবং একটা গোঙানীর শব্দ তার মুখ থেকে বেরিয়ে আসছে।

আমায় যা করতে হবে তা ভেবে নিয়ে আস্তে আস্তে ন্যান্সির দিকে এগিয়ে যাই। সেই সঙ্গে আর একটা চিন্তাও আমায় বেশ ভাবিয়ে তোলে। তা হলো ও যদি আমায় চিনতে পারে?

তবু মনের মাঝে দুর্জয় সাহস নিয়ে শান্তভাবে ডাকি, মিসেস্ হ্যামেল!

আমার ডাক শুনে ন্যান্সি একটু কেঁপে উঠে এবং মুখ থেকে হাত সরিয়ে আমার দিকে তাকায়। তার চোখ মুখ সব শুকনো লাগছে।

—মিসেস্ হ্যামেল, সব ঠিক আছে, আমি বলি। চিন্তার কিছু নেই, আপনি সম্পূর্ণ নিরাপদ।

ন্যান্সি আমার দিকে তাকিয়ে বলে, আমার বোন? বলেই সে হাত দিয়ে আবার মুখ ঢাকে। সে বলেছে, ও নিজেই আত্মহত্যা করবে। ওর খবর কী জানেন?

এ কথা শুনে আমি আদৌ দুঃখ পেলাম না, বরং আর একটা কথা ভেবে মনটা আমার আনন্দে নেচে উঠলো। কারণ, ন্যান্সি আমায় চিনতে পারেনি।

—সে আর বেঁচে নেই, তারপর বলি, আমি এখন এখান থেকে আপনাকে নিয়ে যাবো। মিঃ পামার আপনার জন্য 'স্প্যানিস বে হোটেলে, অপেক্ষা করছেন। ওখানে গিয়ে আপনি বিশ্রাম করবেন। ওখানে যাবার জন্য একটা হ্যালিকপ্টার অপেক্ষা করছে।

—লুসিয়া মারা গেছে? সবাই মৃত?

—হ্যাঁ। এবার আমাদের যাওয়া দরকার মিসেস্ হ্যামেল। আর আপনার কী এখান থেকে কিছু নিয়ে যাওয়া প্রয়োজন?

ন্যান্সি আমার কথার কোন উত্তর না দিয়ে মুখ লুকিয়ে বাচ্চার মত কাঁদতে থাকে।

আমি ন্যান্সির দিকে তাকিয়ে অপেক্ষা করতে থাকি। সে একটা কালচে সবুজ রঙের ট্রাউজার স্যুট পরেছে। আর ভাবি, সে যদি এখান থেকে যায় তাহলে নিশ্চয়ই তার পোশাক বদলাবার দরকার হবে। তাই তার অন্য পোশাক, আমি তার দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিই। বলি, মিসেস্ হ্যামেল, কিছু গোছাবার প্রয়োজন হলে দয়া করে আমায় বলতে পারেন।

শুধু আঙুল আলমারির দিকে নির্দেশ করে বললো, ব্যাগ।

ন্যান্সির কথামত আমি আলমারির দিকে এগিয়ে যাই এবং সেটা খুলি। কিছুটা খোঁজা-খুঁজির পর ব্যাগটা পেয়ে গেলাম।

লুসিয়া বলেছিল, এই ব্যাগটা সাবধানে রাখার জন্য, ন্যান্সি জানায়।

সে জানতো, তার মৃত্যু অবধারিত।

—এবার যাওয়া যাক, আমি ব্যাগটা হাতে নিতে কোল্ডওয়েল এলো।

আমি কোল্ডওয়েলকে দেখে বলি, লু, সব ঠিক আছে। তুমি ব্যাগটা ধরো। আমি মিসেস্ হ্যামেলকে ধরে নিয়ে যাই।

আমি ন্যান্সিকে ধরে আস্তে আস্তে নিয়ে চলি। সেও আমার হাতটা চেপে ধরে আছে। এইভাবে আমরা দরজার দিকে এগিয়ে যাই।

গাড়ির উজ্জ্বল আলো নিভিয়ে দেওয়া হয়েছে। তা সত্ত্বেও লুসিয়ার ছিন্ন ভিন্ন দেহ ন্যান্সির চোখে পড়ে যায় এবং সে আঁৎকে ওঠে।

ন্যান্সি একটা দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়লো। তারপর তার যেন জ্ঞান হারাবার মত অবস্থা হলো, এবং সে পড়েও যাচ্ছিল। আর আমি তাকে ধরে না থাকলে তাই হতো।

এরপর আমি ন্যান্সিকে নিবিড়ভাবে জড়িয়ে ধরে আস্তে আস্তে হ্যালিকপ্টারের দিকে টেনে নিয়ে যেতে থাকি এবং কোল্ডওয়েলের সাহায্যে তাকে হ্যালিকপ্টারে তুলি।

নিকও আমাদের সাহায্য করে। তার চোখ দুটো যেন আগুনের ফুলকির মত জ্বলছে, সে ন্যান্সিকে পিছনের সীটে বসায়।

ইতিমধ্যে কোল্ডওয়েলকে ন্যান্সির ব্যাগটা হ্যালিকপ্টারে তুলে দিতে বলি, এবার যাওয়া যেতে পারে, বলে আমি নিকের পাশে বসি।

—এবার ছাড়ছি, নিক বলে। আর তোমার আহ্বানে এসেছিলাম বলে এমন একটা লোমহর্ষক ঘটনা স্বচক্ষে দেখতে পেলাম। আর এ ঘটনা দেখতে না পেলে আফসোসের অন্ত থাকতো না। পরে এর জন্য দারুণ মন খারাপ করতো।

এসব কথা যেন আমার কানে ঢুকছে না। আমি ন্যান্সির দিকে তাকাই, তার মুখ ফ্যাকাশে এবং চোখ বন্ধ।

এ পর্যন্ত বেশ ভালোই কাটলো, আমি ভাবি, আর ন্যান্সি আমায় চিনতে না পারায় আমি নিশ্চিন্ত। তবে আবার ঠিক পুরোপুরি স্বস্তি বোধ করতেও পারছি না। আমার তো পোড়া কপাল, নইলে ডলারগুলো প্রায় হাতের মুঠোয় এসেও পাচ্ছি না। এবারও কী হবে কে জানে!

আবার ভাবি, ন্যান্সি সাময়িক শক এবং উত্তেজনায় হয়তো আমায় চিনতে পারছে না। পরে ঠিক চিনতে পারবে, ফলে একটা চাপা অস্বস্তি আমায় ঘিরে রয়েছে এবং দারুণভাবে আমায় পীড়ন করে চলেছে। আর এর হাত থেকে আগে রেহাই পাওয়া দরকার।

হঠাৎ মনে পড়ে, সে কার্ড তো আমার হাতেই রয়েছে। একটু ঝুঁকি নিয়ে ফেললেই দোষ না! আর লোকেরাই বলে, যে ঝুঁকি নিতে সেইই বাজিমাৎ করে,

সেই সঙ্গে সে অস্বস্তিটা আমায় কুরে কুরে খাচ্ছে, তার হাত থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে।

ওদিকে মিনিট দশেক আগেই নিক 'স্প্যানিস বে হোটেলের' হ্যালিকপ্টার রাখার জায়গা হ্যালিকপ্টারটা নামায় এবং হ্যালিকপ্টারের লাইট জ্বলে উঠতে ওখানে আমি পামারকে দেখতে পাই। ওর সঙ্গে দু'জন ডাক্তার একজন নার্স।

হ্যালিকপ্টার থামতে ন্যান্সি চোখ খুলে তাকায় এবং উঠে বসে। বলে কী ঘটেছে ? আর আমি কোথায় ?

আমি ন্যান্সির দিকে ঘুরে তাকাই। কেবিনের উজ্জ্বল আলোয় আমরা পরস্পর পরস্পরকে দেখতে পাচ্ছি। ফলে আমার বুকের মাঝে যেন সাত সমুদ্র উথাল-পাতাল করছে।

আমি হেসে বলি, মিসেস্ হ্যামেল, আপনি সম্পূর্ণ নিরাপদ। আমরা এখন 'স্প্যানিস বে হোটেলে' উঠেছি, এবং মিঃ পামার আপনার দেখাশুনার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন।

ন্যান্সি একথার কোন উত্তর না দিয়ে আমার দিকে বিস্ময়ভাবে তাকিয়ে বলে, আপনি কে ?

—আমিই আপনাকে উদ্ধার করেছি, আমি কনে বউয়ের মত লাজুক হেসে বলি। সেই সঙ্গে আমি দিশেহারা, এবং এখন এটা মেনে নেওয়া যাচ্ছে যে, আমি যখন কান্ট্রি ক্লাবে চাপ দিয়ে কাজটা হাসিল করার চেষ্টায় ছিলাম, সে দৃশ্য ওর আর মনে নেই।

ফলে এখন দারুণ স্বস্তি বোধ করছি এবং ভালো মানুষের মত হেসে আবার বলি, আপনার চিন্তার কোন কারণ নেই। আপনি এখন সম্পূর্ণ নিরাপদ।

নিক ইতিমধ্যে হ্যালিকপ্টারের দরজা খুলে দিয়েছে। তা থেকে আমি বেরিয়ে এলাম, এবং ন্যান্সি ক্লান্ত ও অকম্প পায়ে উঠে দাঁড়াতে আমি তাকে অতি সাবধানে বের করে আনলাম। সঙ্গে সঙ্গে পামার ডাক্তার আর নার্স নিয়ে আমাদের কাছে ছুটে আসে।

এখন দু'জন ডাক্তারের তত্ত্বাবধানে ন্যান্সি রয়েছে। আমি পামারকে ধন্যবাদ জানাই এমন একটা সুন্দর ব্যবস্থা করে রাখার জন্য।

তারপর ভাবি, আজ রাতে আমার আর কিছুই করার নেই। এরপর দেখি, ন্যান্সি পামারের সঙ্গে লিফটের কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। তারপর ওরা লিফটে করে হোটেলের বড় বাড়িটায় যাবে।

হঠাৎ ন্যান্সি আমার দিকে রাগতভাবে তাকিয়ে বলে, আমার ব্যাগটা কোথায় ?

ন্যান্সির কর্কশ এবং উত্তেজনাময় গলার আওয়াজ থেকে বুঝতে পারি, সে

এখন সম্পূর্ণ স্বচ্ছ। আর ভাবি, সে আমায় কী বোকাটাই না বানিয়েছে। তার গলার স্বর আমার দেহের মধ্যে একটা শিহরণ জাগায়। ভাবি, যে কিছুক্ষণ আগে তার বোন এবং তার আগে তার স্বামীকে হারিয়েছি, আর তার কী না এই গলার স্বর! এ গলার আওয়াজ কোন সন্ত্রাসবাদীর।

বেশ কিছুক্ষণ আমি ন্যান্সির দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকি। তারপর আমি আমার মাথাকে পরিষ্কারভাবে কাজে লাগাতে থাকি। ভাবি, কেন ন্যান্সি আমায় চিনতে পারলো না? আর লুসিয়া প্রোফাইল আমায় কোনদিন দেখেনি। তাই তার পক্ষে চেনা আমায় আদৌ সম্ভব নয়।

সঙ্গে সঙ্গে আমার ন্যান্সির কথা মনে পড়ে। সে হ্যামেলের বাড়ি থেকে বেরোবার সময় অসহায়ভাবে চিৎকার করে বলেছিল, আমায় মেরো না!

এবার আমি পুরোপুরি নিশ্চিত, এ ন্যান্সি নয়। লুসিয়া। লুসিয়া ন্যান্সির জীবনের বিনিময়ে নিজের প্রাণ বাঁচিয়েছে। সেই ন্যান্সির হাতে দুটো বোমা ধরিয়ে দিয়ে তাকে জোর করে পুলিশের দিকে ঠেলে দিয়েছে এবং সেই বোমা ফেলে তার নৃশংসভাবে মৃত্যু ঘটে।

এ যে ন্যান্সি নয় লুসিয়া তার আরো প্রমাণ রয়েছে। প্রথমত, সে আমায় চিনতে পারেনি। দ্বিতীয়ত, সে ব্যাগটার উপর দারুণভাবে গুরুত্ব দিয়ে বসেছে।

তবু আমি নিজের মনের ভাব গোপন করে বলি, মিসেস্ হ্যামেল, আমি এখুনি নিয়ে আসছি।

দু'জন ডাক্তার এখন লুসিয়াকে ঘিরে রয়েছে এবং তারা এখন লিফ্‌টের কাছে অপেক্ষা করছে।

তারপর আমার নির্দেশে নিক হ্যালিকপ্টার থেকে ব্যাগটা নামিয়ে দিতে তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলে, এসব ব্যাপার যেন আবার খবরের কাগজে জানিও না।

—না, বলবো না, বলে নিক হাসে। এসব ঘটনা আমি আমার নাতি নাতনীদের না বলে কিছুতেই থাকতে পারবো না।

—নাতি নাতনীদের? তা বলো।

তারপর লুসিয়াকে ব্যাগটা দেবার আগে এটা আমি খুলতে চেষ্টা করি। এটা চাবি দিয়ে আটকানো। পিস্তলের বাঁট দিয়ে চাপ দিতে খুলে গেল।

সন্দেহ করার মত বলতে গেলে প্রথমটা কিছুই নেই। উপরে জামা কাপড়। কিন্তু তা সরাতেই '৩৮ এর একটা রিভলবার, দুটো বোমা এবং একটা চেক বই বেরিয়ে পড়লো।

সঙ্গে সঙ্গে আমি চেক বইয়ের পাতা ওল্টাই। সব ক'টা পাতায় সই করা রয়েছে। ভাবি, এতে বেশ কিছু মিলিয়ান ডলার হবে।

তারপর চেক বইটা আমার জ্যাকেটের পকেটে চালান করে দিয়ে রিভলবার

এবং বোমা দুটো লুকিয়ে ফেলি।

এরপর তালাটা ঠিকভাবে লাগাতে চেষ্টা করি এবং লিফটের দিকে এগিয়ে যাই। আর এই লিফটে করে এক তলায় নেমে আসি।

নেমে দেখি, পামার উদগ্রীবভাবে আমার জন্য অপেক্ষা করছে, সে আমায় দেখে বললো, মিঃ এন্ডারসন, মিসেস্ হ্যামেল ওঁর ব্যাগ চাইছেন?

—আমি তা জানি।

—কিন্তু আমি এসব কিছুই বুঝতে পারছি না, পামার বেশ চিন্তিতভাবে বলে, সে ডাক্তারের সাহায্য চাইলো না। শুধু বললো, আমি এখন একা থাকতে চাই। শেষ পর্যন্ত আমি সেই ব্যবস্থা করে এলাম। তবে যাই বলুন, সে কিন্তু আমায় অবাক করে দিয়েছে।

আমি সব বুঝতে পেরেও ন্যাকা সাজি। বলি, সাময়িক শকই হয়তো তার মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছে। যার বোন, স্বামী মারা গেছে, তার তো। আর আমি তার ব্যাগ নিয়ে এসেছি, এবং কিছুটা বিশ্রাম নিলে ঠিক হয়ে উঠবে।

—হ্যাঁ, আমারও বিশ্রাম দরকার, পামার বলে। আর প্রায় সকাল হয়ে আসছে। আমি আমার কথা রেখেছি এবার চলি।

—হ্যাঁ, তাই করুন, আমি পামারের দিকে বিশ্বাসের হাসি হেসে কথাটা বলি। আর মিসেস্ হ্যামেলের ব্যাগ দিয়ে আমিও সরে পড়বো। সারাদিন শরীরের উপর দিয়ে অনেক ধকল গেছে।

তারপর পামার লিফটের দিকে এগিয়ে যেতে আমি পিস্তলটা বার করে নির্দিষ্ট ঘরের দিকে এগিয়ে যাই, আপনার ব্যাগ মিসেস্ হ্যামেল।

দরজাটা খোলা। ঘরে মাত্র একজন মহিলা রয়েছে এবং সে আমার দিকে এমনভাবে তাকিয়ে আছে যে, সে লুসিয়া স্টোফারি না হয়ে কিছুতেই যায় না। তার মুখ ফ্যাকাশে। বিধবেশী চাহনি। তবুও তার চোখ দুটো জ্বল জ্বল করছে।

—এখানে রাখুন, লুসিয়া বললো।

তারপর আমি ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে ব্যাগটা রাখলাম। তাতে লুসিয়া আমায় ধন্যবাদ জানিয়ে বলে, এবার আপনি চলে যান।

আমি এ কথার কোন উত্তর না দিয়ে পিস্তলটা তার দিকে তাক করে বলি, বেবী, সহজ হও। আর আমার কাছে চালাকি করতে যেও না।

লুসিয়া আমার দিকে চোখ কুঁচকে তাকিয়ে যেন সাপের মত হিস্ হিস্ করে উঠলো, তুমি কে?

আমার নাম বার্ট এন্ডারসন।

আমি লক্ষ্য করলাম, আমার কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে লুসিয়া যেন মুষড়ে

পড়লো। তার সেই চোখের দৃষ্টিও আর ধারালো নেই। যেন সাপের মাথায় মন্ত্রপূত ধুলো পড়েছে। ভাবি, হয়তো ডিরাজ আমার কথা ওকে বলেছে, আর ন্যান্সিও বলতে পারে।

—হার্ট এন্ডারসন। লুসিয়ার পাতলা ঠোঁট দিয়ে আমার নামটা বেরিয়ে এলো।

ব্ল্যাকমেলার।

তুমি কীভাবে এখানে জড়িয়ে পড়লে ?

তারপর লুসিয়া গিয়ে একটা সোফায় বসলো। বসে সামনের দিকে পা ছড়িয়ে দেয়। কিন্তু দৃষ্টি আমার দিকে, তার সেই চাহনির মধ্যে কুণ্ডলী পাকানো কেউটের দৃষ্টি ফুটে উঠেছে।

এরপর আমি একটা সোফায় বসি। তবে লুসিয়ার থেকে তার দূরত্ব বেশ খানিকটা এবং পিস্তল সেই আগের মতনই তার দিকে তাক করে রেখেছি।

বলি, তা নিজের বোনকে হত্যা করার পর কেমন বোধ করছো ?

সেই অপদার্থটাকে ?

তা নয়তো কী ! আর তাকে হত্যা করব নাই বা কেন। প্রোফ রি বলেছিল, তোমাকে তার জায়গা নিতে হবে। তাছাড়া, আমাদের আন্দোলনে আমার ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

তারপর লুসিয়ার ব্যাগের দিকে দৃষ্টি যেতে বললো, দেখছি, তালাটা তুমি ভেঙে ফেলেছো।

তোমার অনুমান মিথ্যে নয়।

তুমি চেক বইটা নিয়ে নিয়েছো ?

এটাও ঠিক, আমি হাসি।

যাক্, আর সময় নষ্ট করতে চাই না।

বলো, তুমি কত চাও ?

—এক মিলিয়ান, আমি লুসিয়ার চোখে চোখ রেখে চেকটা বার করি। আর তারপরও তোমার অনেক থাকবে, এইভাবে এগানো যাক্।

—আমি চারটে চেক নেবার পর তুমি ক্যাস না হওয়া পর্যন্ত এখানে থাকবে।

—তারপর তোমাকে আমি চেক বইটা ফেরত দিয়ে দেবো এবং তোমাকে এক সপ্তাহ অপেক্ষা করতে হবে। এরপর আমি আর তোমার ধারে কাছেও যাবো না। আমি একটা নাবিক যোগাড় করে দেবো। তা প্ল্যানটা কেমন লাগছে ?

—হ্যাঁ, ঠিক আছে, তারপর লুসিয়া বলে। চেক ক্যাস হবার সঙ্গে সঙ্গে তুমি উধাও হয়ে যাবে।

—সে বিশ্বাস তুমি আমার উপর রাখতে পারো।

—তুমি চারটে চেক নিয়ে বাকিটা আমার দাও, আর তোমার চেক ক্যাস না হওয়া পর্যন্ত আমি অপেক্ষা করবো। এরপর আমি চেক ক্যাস করবো, ঠিক আছে তো ?

আমি এর মধ্যে এক মিলিয়ান পাবার স্বপ্নে বিভোর হয়ে পড়েছি। তবুও বললাম, খুব ভালো বলেছো।

আগেই বলেছি। লুসিয়ার কাছ থেকে আমি কিছুটা দূরে বসেছি। আমি পিস্তলটা কোলের উপর রেখে চারটে চেক গুণতে ব্যস্ত। ফলে ওর দিকে আমার চোখ নেই। আর সেটাই একটা মস্তবড় ভুল করে বসলাম।

লুসিয়া উঠে দাঁড়াবার সঙ্গে সঙ্গে আমি চেক বইটা ফেলে দিয়ে পিস্তলটা হাতে নিতে যাই, কিন্তু ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গেছে।

লুসিয়া হাতে পিস্তল। আমি পিস্তল হাতে নেবার আগেই সে গুলি চালালো। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, সে নিশ্চয় সোফার তলায় পিস্তলটা লুকিয়ে রেখেছিল।

আমি অনুভব করলাম একটা গুলি এসে আমার বুকে বিদ্ধ হলো এবং পিস্তলের এক ঝলক আলো দেখলাম। এরপর শব্দ ব্যাস, এই দেখেছি। আর শুনেছি।

আমি এখন হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে আছি। আমি চাই না কেউ এসে আমার সঙ্গে দেখা করুক। আমি এখন নিজেই নিজের উপর ভিত বিরক্ত।

আমার দেখাশুনা করতে মাঝ বয়সী একজন নার্স। সে বেশ আকর্ষণীয় এবং উত্তেজক। তাকে দেখতে অনেকটা স্টার মাছের মতন।

মাঝে মধ্যে সার্জেন আমায় দেখতে আসছে। আমি তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলি, এ জন্মে আপনার জন্য রক্ষা পেলাম।

সার্জেন আমার দিকে তাকিয়ে মিটি মিটি হাসে এবং সে আমার কথার কোন জবাব দেয় না। আর তার হাসিটা আমার কাছে হায়নার মত মনে হলো।

আমার এখন আর কিছুই করার নেই। অলসভাবে বিছানায় শুয়ে আছি আর ভাবছি। আবার আমাকে এই রকম সাংঘাতিক কাজ করার জন্য এজেন্সীতে ফিরে যেতে হবে। এই ধরণের আরো কত কথা মনে পড়ে।

হঠাৎ নার্স ঘরে প্রবেশ করতে আমি তাকে জিজ্ঞেস করি, আমার কী হয়েছিল ?

—তা আমি ঠিক জানি না, মৃদু হেসে বলে।

এ কথা শুনে আমি ততটা অবাক হই না। আমি নার্সের দিকে তাকিয়ে ভাবি, ওর এই ধরণের কথা বলাই উচিত। কিছু কিছু লোকের মত ও বোধহয় অনেক ব্যাপারেই নির্লিপ্ত। ও শুধু যেন এখানে কাজ করতে এসেছে। সারা জগতের সঙ্গে ওর কোন সম্পর্ক নেই জানিয়েছে তাদের চিরতরের জন্য বিদায়।

হঠাৎ পায়ের শব্দ আসতে আমি নার্সের দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে দরজার দিকে তাকাই। দেখতে পাই, লু কোল্ডওয়েল আসছে।

কোল্ডওয়েল বেডের কাছে একটা চেয়ার নিয়ে বসতে বসতে বললো, বড় বাঁচা বেঁচে গেছো। তা হয়েছিল কী?

—আমি তাকে ব্যাগটা দিয়ে ফিরতে যাবো, আর ঠিক তখনই সে পিস্তল বার করে আমায় গুলি করে।

—সে এ কাজটা কেমন করে করলো?

—তুমি গিয়ে তাকে জিজ্ঞেস করো।

—ভালো বলেছো। আর ঐ গুলির শব্দ শুনে হোটেলের একটা বেয়ারা দেখতে গেছল। সে তাকেও গুলি চালিয়েছে। তারপর সে লিফ্‌টে করে নিচে নেমে আসে। তখন তার বাঁ হাতে ব্যাগ এবং ডান হাতে পিস্তল।

—ভাবতে পারো এমন একটা দৃশ্যের কথা?

—এরপর কী হলো তাই বলো?

—তখন পেট্রল পুলিশ তাকে দেখতে পেয়ে থমকে দাঁড়ায় এবং তাকে চিনতে পারে। আর সে পেট্রল পুলিশের উদ্দেশ্যে গুলি চালাতে থাকে এবং ওদের সঙ্গে গুলি বিনিময় হতে গিয়ে সে মারা যায়।

—সে মরিয়া হয়ে উঠেছিল, আমি বলি।

—হ্যাঁ, আর সে লুসিয়া প্রোফারি। ন্যান্সি হ্যামেল ঐ বাড়িতেই মারা যায়।

আমি ভাবি, সব শেষ। মিলিয়ান ডলার আমার কাছে স্বপ্নই রয়ে গেল। সোনার হরিণের পেছনে শুধু আমি ছুটেই বেড়ালাম। আর হরিণ একবার আমায় দেখা দিয়েই যেন গভীর বনের মাঝে হারিয়ে গেল।

তারপর কোল্ডওয়েল চলে যেতে নার্স আমায় এসে বললো, দয়া করে এত কথা বলবেন না। আপনার এখন বিশ্রাম নেওয়া প্রয়োজন।

তার পরের সপ্তাহে কেউ আমার সঙ্গে দেখা করতে এলো না। আমি ভীষণ নিঃসঙ্গ বোধ করছি। আশা করেছিলাম, এত বড় একটা খবর শুনে বার্থা দেখা করতে আসবে। অন্তত কিছু ফুল পাঠিয়ে দেওয়া কী ওর উচিত ছিল না! কিছুই এলো না!

হয়তো বার্থার বিয়ে হয়ে গেছে। সে হয়তো স্বামীর সঙ্গে হনিমুনে করতে বেরিয়েছে। আর ইয়াটে করে সমুদ্রের বুকে গা ভাসিয়ে দিয়েছে। এই ফুর্তির সময় কে আর আমার কথা মনে রাখে।

চেয়ারে ক্লান্ত অবসন্ন অবস্থায় বসে আছি। ইতিমধ্যে চিক এলো। তার হাতে একটা স্কচের বোতল।

আমার বেডের সামনে চেয়ারে বসে চিক হেসে বললো, বার্ট, কেমন আছো?

আমি হাসিমুখে চিকের মদের বোতলটা গ্রহণ করে বললাম, আস্তে আস্তে ভালোর দিকে যাচ্ছি। আর তুমি এসে ভালোই করেছো, বড্ড বোর ফিল করছিলাম।

—এ কথা শুনে চিক হাসে।

—বার্থার কোন খবর আছে? কথাটা আশাম্বিতভাবে বললাম।

—বার্থার বিয়ে হয়ে গেছে।

—ও! আমি এর বেশী আর কিছু বলতে পারলাম না।

—সে তার স্বামীর সঙ্গে ইউরোপে হনিমুন করতে গেছে, আর লোকটা যেন টাকার পাহাড়ে চড়ে বসে আছে।

ওর কথায় আমি যেন আরো নিরাশার মাঝে তলিয়ে গেলাম, আর ঠিক তখনই লক্ষ্য করলাম, চিক সহসা ঘরের মাঝে উঠে পায়চারি করছে। হাত দুটো পকেটে। মুখে স্পষ্ট একটা চিন্তার ছাপ ফুটে উঠেছে।

আমি চিকের দিকে তাকাই। স্পষ্ট বিপদের ইঙ্গিত যেন। জিজ্ঞেস করি, চিক তোমার কী হয়েছে? মনে হয় কিছু ভাবছো?

—রবার্টসন ল' বইয়ের কথা তোমার মনে আছে? চিক কোনক্রমে যেন কথাটা বললো।

—হ্যাঁ, আর ভগবানই জানে কেন ওটা কিনেছিলাম। ও বইটা আমি কোনদিনই পড়িনি। ড্রয়ারেই পড়ে রয়েছে।

—কর্নেল তার বইটা বাড়িতে ফেলে এসেছিল এবং অফিসে এসে এই বইটা কারুর আছে কী না জিজ্ঞেস করছিল।

—তারপর? আমি ভীষণভাবে উত্তেজিত। আমার নিশ্বাস যেন পড়ছে না।

—তখন আমার তোমার বইটার কথা মনে পড়লো।

—তুমি দিলে?

—হ্যাঁ, তোমার ক্ষচের ড্রয়ার থেকে বইটা বার করে কর্নেলকে দিলাম।

—এরপর? আমার যেন গলা শুকিয়ে আসছে। তারপর আমি যেন ঘেমে নেয়ে উঠেছি। ভীষণ ঠান্ডা বোধ করছি। ভাবি, ঐ রবার্টসন ল' বইয়ের মধ্যে একটা রিপোর্ট ছিল। তাতে লেখা ছিল ব্ল্যাকমেলের কথা—প্রোফারি পাইরেটস দ্বীপে আত্মগোপন করে আছে। আর অ্যালাবোডা বার থেকে ফিরাডের কাছ থেকে পঞ্চাশ হাজার ডলার নিয়েছি ন্যানসির ব্যাপারে চুপ করে থাকবো বলে।

রিপোর্টটা একটা খামের মধ্যে ভরা ছিল। কর্নেলের নিশ্চয়ই তা চোখে পড়েছে এবং তা সে পড়ে থাকবে। আর সে ভালো করেই জানে, এই ব্যাপারে আমি প্রথম থেকে জড়িত।

তারপর চিক দুঃখ প্রকাশ করে বলে, বার্ট ! আমি দুঃখিত এবং লজ্জিত। এমন একটা ব্যাপার হবে তা আমি আগে বুঝতে পারিনি।

একটু থেমে চিক আবার বলে, কেরী বলেছে, বার্ট এমন একটা কাজ কী করে করলো ? অথচ সে কত ভালো মানুষ !

ভালো ? খামে ভেজা শরীরটা আরো জবজবে হয়ে উঠেছে। যাক্‌, এটা এক দিক দিয়ে ভালোই হলো।

চিক বললো, ব্ল্যাকমেল কাজটা নিন্দনীয়। তবে কর্নেল এটা পুলিশের কাছে জানাচ্ছে না। তাতে এটা এজেন্সীর পক্ষে ক্ষতিকর।

এ কথা শুনে আমি উৎসাহিত বোধ করি। বলি কর্নেল এটা ভালোই করেছে।

হ্যাঁ। সত্যি তাই। তবে···।

সে তোমার লাইসেন্স বাতিল করে দিয়েছে।

ও ! আমার মুখ দিয়ে একটা দীর্ঘনিশ্বাস বরিয়ে আসে।

চিক চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়, চলি।

তারপর চিক যেতে আমি জানালার দিকে তাকাই। দৃষ্টি যায় ব্যস্ত প্যারাডাইস সিটির দিকে। কিন্তু আমি ? আমার লাইসেন্স বাতিল হয়ে গেছে। আমি এখন পৃথিবীর কাছেও কী বাতিল ? আর আমার চাকরিই বা কীভাবে জুটবে ? জুটলেও তা কী নেওয়া সম্ভব হবে ? এর চেয়ে মানুষের আর কী খারাপ হতে পারে ?

ইতিমধ্যে সার্জেন হাজির এবং হায়নার হাসি হেসে বললো, আপনি কয়েক দিনের মধ্যেই বাড়ি যেতে পারবেন। এক মাসের মধ্যে আপনি সম্পূর্ণ সেরে উঠবেন।

তা আমি কিছুতেই হতে পারবো না, মনে মনে বলি। কারণ আমার মনের অসুখ আমি কী দিয়ে সারাবো ? আমি যে এখন বেকার।

সার্জেন চলে যেতে আমি যেন শূন্যতার মাঝে মিশে গেলাম। ভাবি, আমার কাছে মাত্র দু' হাজার ডলার রয়েছে। তাছাড়া, আমার হাসপাতালের বিল মেটাতে হবে। তারপর একটা চাকরির জোটাতে দারুণভাবে চেষ্টা করতে হবে।

দু'রাত দু'দিন আমি কিছুতেই চোখের পাতা এক করতে পারলাম না। একরকম জেগেই কাটালাম। তা সত্ত্বেও টাকার যোগাড়ের কোন সুরাহা হলো না। আর ভাবি, আগের ঠাট বজায় রেখে চলতে হলে আমার কত টাকার প্রয়োজন।

চিক অ্যাপার্টমেন্ট থেকে আসার সময় আমার জামাকাপড় ভরে একটা সুটকেশ দিয়ে গেছে এবং গাড়িটাও হাসপাতালের বাইরে পার্ক করে রেখে দিয়েছে। আর যাবার সময়। আমায় একটা পঞ্চাশ ডলারের বিল দিয়ে বলেছে,

এটাই বেশ ভালোর জন্য।

আমি গাড়ি করে অ্যাপার্টমেন্টে ফিরে এলাম। খিদেয় যেন আমার পেটের নাড়ি ভুঁড়ি ছিঁড়ে যাবার যোগাড় হয়েছে। আমার পেট সাপের চেয়েও নেমে গেছে।

অ্যাপার্টমেন্টের দিকে এগিয়ে যাই। সদর দরজা ঠেলে ভেতরে প্রবেশ করি। তারপর বিস্ময়।

বড় ঘরটায় যেন ফুলের বাগান বসেছে। চারদিকে রাশি রাশি ফুল। তারপর একটা ব্যাপারের দিকে আমার নজর গেল। তাতে লেখা হয়েছে—ঘরে ফিরে আসার জন্য স্বাগতম।

আমি তাড়াতাড়ি দরজা ঠেলে শোবার ঘরে প্রবেশ করি। এখানে আরো বিস্ময় আমার জন্য অপেক্ষা করছে।

এখানে বার্থা রয়েছে। পরনে কিছু নেই। সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে আমার বিছানায় শুয়ে আছে। দেয়ালের দিকে তার মুখ ফেরানো।

বার্থা সহসা আমার দিকে তাকিয়ে বললো, তোমার নাকি গুলি লেগেছিল?

আমি বার্থাকে দেখে দারুণ খুশী হোলাম, হ্যাঁ। তারপর দরজাটা বন্ধ করে দিই।

—কোথায়?

—সেটা তুমি ভুলে যাও, বলে আমি আমার জামা কাপড় খুলতে থাকি।

এর মিনিট কুড়ি পরে আমরা বিছানায় পাশাপাশি শুয়ে আছি। বার্থা তার সরু আঙুল দিয়ে চুলে বিলি কাটছে। এবং ওর মুখ দিয়ে একটা খুশীর শব্দ বের হচ্ছে।

ভাবি, বার্থা চলে গেলে আমি আবার একা। এখন পেটের চিন্তা আমার দিশেহারা করে তুলেছে। সেইসঙ্গে ভবিষ্যতে কীভাবে দিন কাটাবো তাও ভাবছি।

—বার্ট! মাই ডার্লিং! বার্থা বলে তোমাকে ছাড়া থিয়োর সঙ্গে গিয়ে আমি থাকতে পারবো না।

—থিয়ো? আমি একটু অবাক হয়ে বার্থার নগ্ন নিতম্বে হাত বোলাতে থাকি।

—থিয়ো আমার স্বামী।

থিয়ো ভ্যানরিপপেল এবং প্রচুর মিলিয়ানের মালিক।

আমি বিছানায় উঠে বসি, অর্থাৎ তুমি তাহলে বিয়ে করেছো ফোর্ডের মত একজন লোককে?

বার্থা আমায় কাছে টেনে বলে, একটা না হলেও কিছুটা, আর তাকে আমি বিয়ে করেছি ঠিকই, কিন্তু তোমার সঙ্গে কারুর তুলনা হয় না। তুমি দারুণ! দারুণ।

বার্থা আমাকে জড়িয়ে ধরে, আবার বলে আমি তোমাকে চাই। তোমাকে ছাড়া আমি বাঁচবো না। আমারও কামনা বাসনা বলে একটা জিনিস আছে!

তা তো ঠিকই, আমি বার্থাকে আদর করতে থাকি।

আমি তোমার কষ্ট বুঝতে পারছি, কিন্তু আমি তোমার সঙ্গে…।

তার আগে তুমি বলো পাম স্প্রিংতে থাকাটা কেমন পছন্দ করবে!

আমি?

হ্যাঁ তুমি। সেখানে একটা কটেজে তুমি থাকবে আমার কাছে।

কিন্তু থিয়ো কী সেটা পছন্দ করবে?

করবে। ঠিকই বলছি। থিয়ো ভালো করেই জানে, আমার একটা বয় ফ্রেন্ড দরকার। সত্যি, এ ব্যাপারে তার মনোভাব খুব উদার।

বার্থা আমার মুখে মুখ ঘষতে ঘষতে বলে, এটা তোমার কেমন লাগছে?

সহসা এ কথার কোন জবাব দিতে পারলাম না। ভাবি, কালো মেঘ কেটে গেল। আকাশে আবার সূর্য আলোকিত হয়ে উঠলো। আর আমি 'ব্ল্যাকমেলার' অপবাদ থেকে রেহাই পেলাম।

আরো ভাবি, এবার থেকে থিয়ো, বার্থা এবং আমি একসঙ্গে সুন্দর জীবন কাটাবো এবং বিলাস বৈভবের মধ্যে থাকবো, যা আমার কাছে চিরদিনই একটা স্বপ্ন ছিল। আর ঠিক সময় ঠিক তাস ফেলতে পারলে অন্তত আমার খাওয়া দাওয়ার জন্য আর ভাবতে হবে না।

—তুমি আমার কথার জবাব দিচ্ছো না কেন? বার্থা আমার দিকে তাকায়।

—বার্থা! বার্থা! মাই ডার্লিং! আমি বার্থার মুখখানা নিজের মুখের সামনে তুলে ধরে ওকে আদরে আদরে ভরিয়ে তুলতে থাকি।

—বার্ট! বার্থা যেন একটুকু হয়ে আমার বুকের মাঝে একেবারে মিশে গেল।

সমাপ্ত